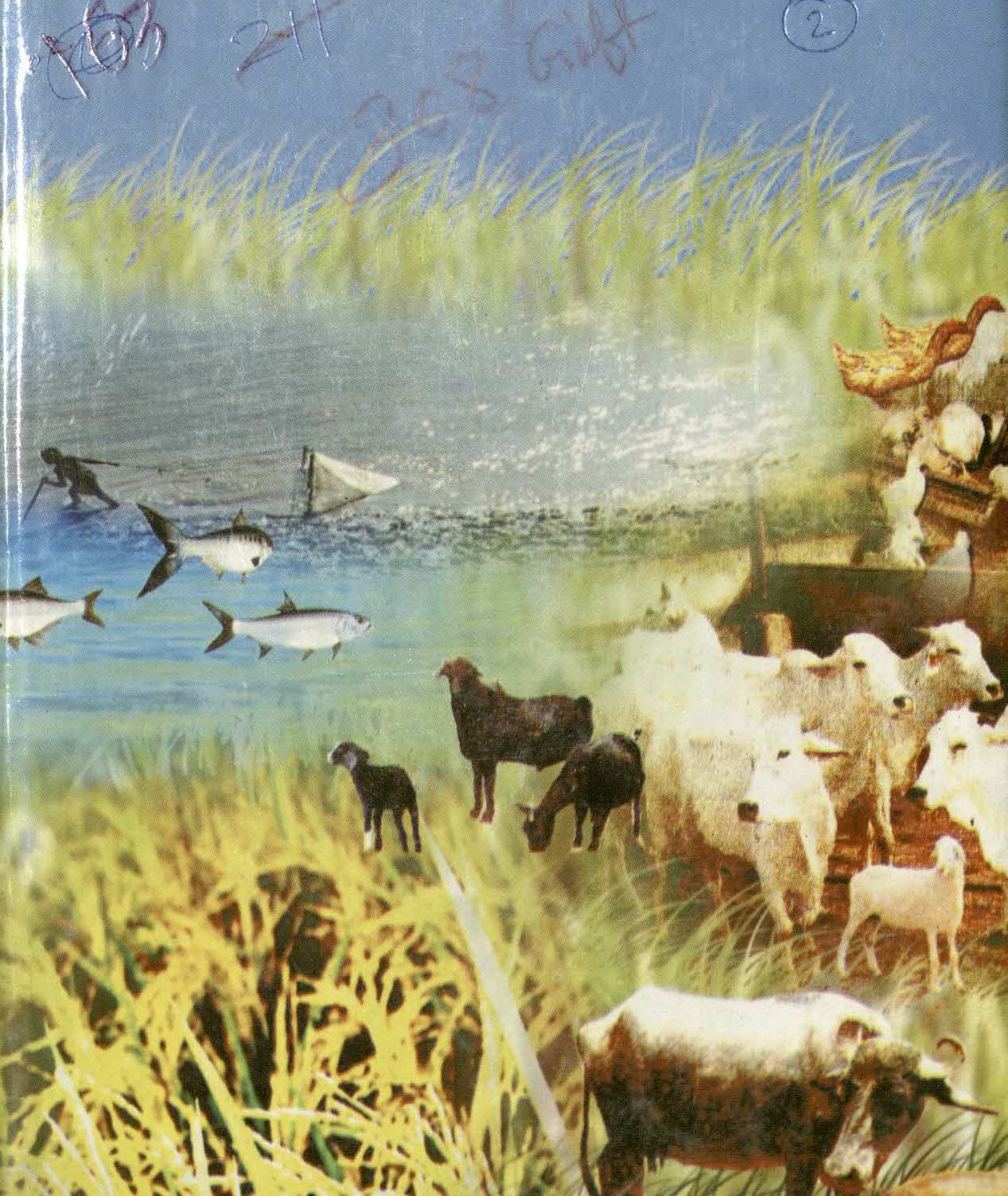
কৃষি, মৎস্য চাষ ও পশু পালনের মাধ্যমে স্বউপার্জন ও স্বনির্ভরতা



রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯০

কৃষি-সম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ণ কমিটি

Income Generation & Self Employment Through Agriculture, Pisciculture & Animal Husbandry

Edited by :

Rtn. Dr. RAMESH CHANDRA BASU, *Zoologist*

Dr. ANANDA KUMAR MANDAL, *Agriculturist*

Published by :

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3290

Agri Resource Training & Development Committee

সম্পাদনা ও সংযোজনা :
রোঃ ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু
ডঃ আনন্দ কুমার মণ্ডল

প্রথম সংস্করণ
রোটারী ডিষ্ট্রিক্ট ৩২৯০ কনফারেন্স ২০০৩

প্রকাশক :
রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ৩২৯০
কৃষি সম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ণ কমিটি

প্রচ্ছদ :
অশনি ভট্টাচার্য্য

মুদ্রক :
টাইপ ইমপ্রেশন
৬২, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০২৫
দূরভাষ : ২৪৫৫ ৫৭৯৫

দাম : ৭০.০০ টাকা
(সত্তর টাকা)

163

প্রাককথণ

দিন যতো এগুচ্ছে নানান কর্মকাণ্ডে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। আসছে পরিবেশগত এবং আথ সামাজিক নানান সমস্যা। নানাবিধ কারণে পূর্বভারতের রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। বেকার সমস্যাও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সমাধান চাই। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এর আশু সমাধান নেই। স্বনির্ভরতা, কর্মসূচীর মাধ্যমে তা কিছুটা কমানো যেতে পারে। অনেক স্বনির্ভরতা কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি এবং আধা সরকারি নানান সংগঠনের মাধ্যমে। এগুলির বেশীর ভাগই শিল্পভিত্তিক।

আমরা সকলেই জানি ভারতের ৭০% মানুষ কৃষি নির্ভর। ফলে বেশীর ভাগ মানুষের জন্য কিছু করতে গেলে কৃষি ভিত্তিক স্বনির্ভরতা প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প রূপায়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ পুস্তকের অভাব আছে। এই অভাব দূর করতে চাই কৃষি, মৎস্যচাষ ও পশুপালনে উপার্জনমুখী লেখা সমৃদ্ধ পুস্তক ও নির্দেশিকার মাধ্যমে।

কৃষি, মৎস্যচাষ ও পশুপালনের নানান কর্মসূচী থেকে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় নির্ধারন করে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের লেখা সংকলন করা হয়েছে এই বইটিতে। এই বইটি প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এবং ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যাপারেও পাঠককে নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে বলে আমরা আশা রাখি। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে চান তাদেরও কাজে আসবে। বইটিতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ঠিকানা ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা থেকে নানান সমস্যার সমাধান মিলবে সন্দেহ নেই।

যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ লেখক তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে লেখা পাঠিয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ৩২৯০-র কাছে যাঁদের উদ্যোগ না থাকলে এই প্রকাশনা সম্ভব হতো না।

এই বইটি পাঠকদের কৃষি ও প্রাণীপালনের নানান সমস্যা সমাধানে কিছুটা কাজে লাগলে ও এই সহায়িকা পুস্তকের মাধ্যমে উদ্যোগী যুবক-যুবতীরা স্বউপার্জন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে এলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। আশাকরি সহৃদয় পাঠকেরা আমাদের ক্ষমা করবেন।

ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু
ডঃ আনন্দ কুমার মণ্ডল

১৬৩/

রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯০
কৃষিসম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ণ কমিটি

উপার্জন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা

বিরাট সম্ভাবনা সম্পন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা এই ভারতবর্ষ। শতকোটি উর্দ্ধ মানুষের দেশ। মানুষ দিন দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে পরিগণিত। তাহলে আমাদের দেশের অবস্থা দাঁড়ায় কোথায়! দুর্ভাগ্য, ৭০ শতাংশ উর্দ্ধ মানুষ অবহেলিত এবং দারিদ্র সীমার নিচে। মানুষ মাত্রই আমাদের ভাই, বোন, বন্ধু, মাতৃসমা। এঁদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে এবং অভাবনীয় বেকারত্ব দূরিকরণের নিমিত্তে এই 'Agri-Resource Training & Development Committee"-র জন্ম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় চাষবাসের শিক্ষা-গরীব চাষীর নেই। ফলে চাষে লোকসান হেতু চাষ বিমুখ হতে চলেছে বহু চাষী পরিবার। প্রশাসন কৃষি উন্নতি সাধনে গুরুত্ব দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তা নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে দিন দিন বেকার যুবক যুবতীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কৃষি জমি, উদ্ভিদ, পশু-পক্ষী, মৎস্য চাষ যে দেশের সম্পদ এবং এর যথাযথ উন্নতি সাধন যে তাদের জীবনের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে এ বিশ্বাস তারা হারিয়েছে। তাদের এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই কমিটি।

বহু জ্ঞানী গুণী বৈজ্ঞানিক তাঁরা সর্বপ্রকারে সহযোগীতা করছেন আমাদের এই প্রচেষ্টায়। কৃষক সমাজ, যুবক, যুবতী এমন কি বয়স্ক বয়স্কা সবাই আকৃষ্ঠ হয়েছেন আমাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে। আমাদের কাছে ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবক-যুবতী আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তারা সর্বপ্রকারে স্বনির্ভর হবে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে। — এ শুধু আজ আমাদের স্বপ্ন নয়, প্রকৃত অর্থে বাস্তবে রূপায়িত।

অল্প শিক্ষিত চাষী পরিবারের জন্য যে কৃষি বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষবাসের নির্দ্দেশিকা প্রকাশ করা হ'ল তা বহুচিন্তা প্রসূত এবং নিশ্চয়ই এই পুস্তক চাষী ভাইদের এবং বেকার যুবক-যুবতীদের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করতে সমর্থ হবে। বিশেষজ্ঞ লেখক ও বিজ্ঞানীরা এই বই থেকে কোন সম্মান দক্ষিণা নেননি। তাঁদের এই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার জন্য প্রকাশক হিসাবে আমরা প্রকৃত মূল্যেই উৎসাহী পাঠকদের বইটি দিতে পারব। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

কৃষি বা চাষবাসের অর্থ শুধু ধান বা সবজি চাষ নয়, এর সঙ্গে রয়েছে মৎস্যচাষ, পশুপালন এবং চাষবাস লব্ধ সম্পদ এর প্রকৃত সমীকরণ। এ সব কিছু নিয়ে আমাদের যাত্রা। কৃষক ভাই-বোনদের প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগে এ দেশে কৃষি বিপ্লবে জোয়ার আনা সম্ভব। আমাদের আশা ও বিশ্বাস যারা আজ বেকার তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানে, গুণে, অর্থে, সামর্থে, বিজ্ঞানে এ দেশ জগত সভায় অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

রোঃ ডঃ রমেশ চন্দ্র বসু
ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান
সারাঙ্গাবাদ, বজবজ
দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭০০ ১৩৭

রোঃ কালিকিঙ্কর নাগচৌধুরী
সহকারী গভর্নর
১৯৮এ, ব্লক - জে, নিউ আলিপুর,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৩

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRICT 3290

Agri-Resource Training & Development Committee

Considering acute unemployment problem of the youth the District Agri-Resource Training and Development Committee has drawn out a year long programme for imparting training in Agriculture, Horticulture, Pisciculture and Animal Husbandry for R.C.C. members, unemployed youth, farmers and fishermen to equip them with income generating skill and knowledge for being self employed. The Committee has formulated series of field oriented residential Training Courses with the support from concerned Government Departments and Institutions. Apart from continuous workshops and group discussion programme with R.C.C. members and rural youth in different areas the Committee could organise several residential field oriented training courses on Agriculture, Pisciculture and Animal Husbandry at different Districts.

As per request from different Rotary Clubs and their R.C.C. units as well as rural youth, some more training courses are being planned in the uncovered revenue earning Districts in West Bengal.

The Committee is Publishing a comprehensive guide book for the youth in such Agri-Resource based areas for earning their bread through proper planning and implementation of income generating fruitful projects.

Fortunately West Bengal State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank is being involved in organsing training courses for the unemployed rural youth, R.C.C. Members, unskilled farmers & fishermen for extensive training in Agriculture, Pisciculture & Animal Husbandry with the assurance of financial support from the concerned Bank to encourage them for being self employed though small Agro based income generating projects.

We are confident that this guide book on "Income generation & Self Employment through Agriculture, Pisciculture & Animal Husbandry" will immensely help them to formulate their projects for being self employed.

PP Rtn. Dr. Ramesh Chadra Basu
District Chairman

PP Rtn. Kalikinkar Nag Chaudhuri
Assistant Governor

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

পৃষ্ঠা

सत्यमेव जयते

শুভেচ্ছা বার্তা

রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯০, কৃষি সম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ণ কমিটির উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ''কৃষি, মৎস্যচাষ ও পশুপালনের মাধ্যমে স্বউপার্জন ও স্বনির্ভরতা'' — পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। আশাকরি বইটি কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হ্যান্ডবুক হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সকলেরই কাজে লাগবে। কৃষি উন্নয়ণের স্বার্থে রোটারী সংস্থার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বইটিতে কৃষিবিজ্ঞানের নানান বিষয়ে চাষীভাইদের স্বনির্ভরতার পথনির্দেশিকা যেমন আছে সেই সঙ্গে রয়েছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বেশ কিছু তথ্য। যাঁরা কৃষিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চান আর নিজের হাতে কাজ করতে যাঁরা উদ্যোগী এই দুই শ্রেণীর কাছেই বইটি খুবই আদরণীয় হবে।

বইটির সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ লেখকদের সক্রিয় ভূমিকার জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংস্থার কৃষি সম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটির বই প্রকাশের উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানাচ্ছি।

নিত্যানন্দ ত্রিবেদী

(ডঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদী)
কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কৃষি বিভাগ

সুস্থায়ী কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন ও স্বনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি

অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

অধিকর্তা, ডি. আর. সি.এ্যান্ড এস. সি.

কৃষি এখন সঙ্কটাপন্ন। উৎপাদনশীলতা ক্রমশঃ কমছে। বীজ আদি উপাদানের দাম ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছে কিন্তু কৃষিপণ্যের দাম নাগরদোলার মত ওঠানামা করছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কৃষিতে নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির কথা হয়তো একটু বেমানান লাগতেই পারে। এ কাজ কিন্তু সম্ভব তবে তার জন্য কৃষি প্রযুক্তি, খামার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক স্তরে বেশকিছু পরিবর্তন আনা খুবই জরুরী।

বর্ত্তমান চাষ ব্যবস্থায় ফসল ও প্রাণী বৈচিত্র ক্রমশঃ কমিয়ে দু-একটি লাভজনক ফসল ও প্রজাতি বিশাল এলাকা জুড়ে চাযের উপর জোর দেওয়া হয়। অসময়ে ফসল ফলিয়ে লাভ বাড়াবার চেষ্টা করা হয় এবং যত দিন যায়, বাহীর থেকে কিনে আনা কৃষি উপাদানের উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে। চাষীরা নিজেদের বীজ রাখবেনা, প্রতিবছরই নতুন নতুন সঙ্কর বীজ কিনে আনার, প্রতি বছরই বেশী পরিমাণে ও বেশী ধরণের রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম বিষ ব্যবহার করবে, মাটির আরও গভীর থেকে জল তুলে আনবে, এগুলিই হচ্ছে প্রচলিত বাজার কেন্দ্রিক কৃষিব্যবস্থায় সাফল্যের মুলমন্ত্র।

আমরা গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি যে এভাবে উৎপাদন সাময়িকভাবে বাড়ানো গেলেও আর ধরে রাখা কঠিন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের খাদ্যে, জল, মাটিতে বিষ বেড়েই চলেছে এবং বহু উপকারী অনুজীব, কীটপতঙ্গ, পাখী, মাছ আদি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা এও জানি, যে এই বাণিজ্যিক চাষ করে বড় চাষীরাও লাভ করলেও ছোট ও মাঝারী চাষীদের ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে এবং সেই বোঝার চাপে দেশের নানা অঞ্চলে চাষীদের আত্মহত্যার সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে। কিন্তু 'আধুনিক', 'উন্নত', 'বিজ্ঞানভিত্তিক' আদি বিশেষণ ব্যবহার করে বর্ত্তমান কৃষি প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার সত্যিকারের লাভক্ষতি বিশ্লেষণ করার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সুস্থায়ী বিকল্প খুঁজে বার করার কাজকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

কৃত্রিম সার ও বিষের ব্যবহার কমানোর কথা অবশ্য এখন সবাই বলতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ আমাদের কৃষি নীতিতে কৃষিপণ্য, ফল, মাছ আদির রপ্তানীর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশের বাজারে কোন খাবারে কত বিষ আছে নিয়মিত মাপা হয় এবং সেই তথ্য ক্রেতারাও সহজেই পেতে পারে, কোনও সরকারী ফাইলে 'গোপনীয়' বলে লুকিয়ে

রাখা হয় না। চাষকে সুস্থায়ী অর্থাৎ পরিবেশমুখী ও সমাজমুখী করতে হলে কিন্তু শুধু রাসায়নিক বিষ ও সারের ব্যবহার কমানো বা বন্ধ করাই যথেষ্ট নয়, জৈব চাষ মানে শুধু গোবর দিয়ে চাষ নয়। প্রকৃত জৈব চাষের মাধ্যমেই নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় এবং ছোট ও প্রান্তিক চাষীর কাছেও চাষকে লাভজনক করে তোলা সম্ভব।

প্রকৃত জৈব চাষ ব্যবস্থায় যাকে 'পরিবেশমুখী', 'সুস্থায়ী', বাস্তুতান্ত্রিক' চাষ ব্যবস্থা আদি নামেও ডাকা হয়; প্রধানতঃ ফসল বৈচিত্র বাড়ানো; মাঠের ফসল, গাছ-গাছালি, পশুপাখী, মাছ, কীটপতঙ্গ আদির সমন্বয় ঘটানো; দূর থেকে কিনে আনা উপাদানের পরিমান কমানো, ভূগর্ভের জলের ব্যবহার কমানো, মাটিকে সজীব ও বিষমুক্ত করে তোলা, সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করা, বহুপযোগী গাছ-গাছালি আদির ব্যবহার ও বহুতল চাষ ব্যবস্থা তৈরী আদির ওপর জোর দেওয়া হয়।

যেমন, একটি ছোট বাগানকে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে বেড়াকেও উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়, মাচার উপরে ও নীচে নানা সবজী উৎপাদন করা যায়, সব ডালপালা ও আগাছাকে কেঁচোর সাহায্যে সারে রূপান্তরিত করা যায়, লতানে সবজী ব্যবহার করে কার্য্যকরী ক্ষেত্রফল বাড়িয়ে নেওয়া যায়, ছোট ডোবাতেও মাছ, হাঁস, অ্যাজোলার মিশ্র চাষ করা যায়, ফলের গাছের ছায়াতে মশলাপাতি ও ওষধি উৎপাদন করা যায়। এভাবে পরিবর্ত্তন ঘটালে মোট উৎপাদন বাড়ে, স্বাস্থ্যকর খাদ্য তৈরী হয়, উদ্বৃত্ত ডিম, ফল, সবজী, মশলাপাতি বিক্রি করে আয়ের সুযোগও বাড়ে ধানক্ষেতেও বৈচিত্র ও সমন্বয় বাড়ানো যায়। ক্ষেতে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ জমিতে অগভীর ডোবা বা খাল বানিয়ে সেই মাটিতে উঁচু চওড়া আল তৈরী করা যায়। ধানজমিতে ধানের পাশাপাশি অ্যাজোলা চাষ করে ও পোকামাকড় খায় এরকম মাছ রেখে; পুকুরে কিছু হাঁস ও মাছ/ব্যাঙ/চিংড়ি আদির চাষ করে; পাড়ে ফলের গাছ ও সবজী লাগিয়ে, মাচায় লতানে সবজীর চাষ করে, রবি মরশুমে ডাল ও তৈলবীজের চাষ করে ধানজমিকেও বহুপযোগী করে তোলা সম্ভব।

সংক্ষেপে বলা যায় ঘরোয়া বাগান, নীচু ধানজমি, উঁচু জমির সবজী ক্ষেত, ফলের বাগিচা, জলাজমিও পুকুর পাড় সব জায়গাতেই মিশ্র ও সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করলে চাষীরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে। দলগত ভাবে কাজ করলে পুরো গ্রামের জমিকে সারাবছর উৎপাদনের কাজে লাগানো সম্ভব এবং বহু নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এরকম কিছু সম্ভাব্য কাজের তালিকা নীচে প্রস্তুত করা হল।

- প্রতিটি বাড়ির বেড়ায় করমচা, তুঁত, বকফুল, মাদার, সজনে আদির গাছ লাগালে খাদ্য, পশুখাদ্য ও জ্বালানীর যোগান বাড়াবে, ফল ডাঁটা আদি বিক্রী করা যাবে এবং গাছের গায়ে খামালু, মাখনসীম, কামরাঙা, সীম আদি তুলে উৎপাদন বাড়ানো যাবে।

- সবার বাড়িতে কিছু মাছ, হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, শুয়োর আদিকে ভালভাবে লালনপালন করলে তাদের জন্য পশুখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের ছোট ছোট ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে। পশুপাখীর মলমূত্র, পালক, রক্ত আদি থেকে জৈবসার উৎপাদন করার ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠতে পারে।
- জৈব চাষের আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার বাড়লে ও বহুপ্রচলিত হলে জীবাণু সার, ছাতু বা 'মাশরুম', ভেষজ কীটনাশক আদি তৈরীর জন্য এলাকাভিত্তিক উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে।
- ফসল বৈচিত্র্য বাড়লে, কিছু হারিয়ে যাওয়া ব্যবসা ফেরৎ আসতে পারে। ডালগঙ্গা, গাছের ও শস্যের বীজ থেকে তেল বার করা, সস্তার সবজী ও ফলকে শুকিয়ে রাখা আদির কাজে মাঝারী স্তরের প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদকতাও বাড়বে, নতুন কাজের সুযোগও তৈরী হবে। স্থানীয় শস্য ব্যবহার করে সস্তায় উন্নতমানের শিশুখাদ্যও তৈরী করার সম্ভাবনা আছে।
- কাঠকয়লা, বায়োগ্যাস, ফসলের ছিবড়ে দিয়ে তৈরী নানা ইন্ধনের ব্যবসারও বেড়ে ওঠার সুয়োগ আছে।
- রাস্তার ধার, খালবিলের পাড়, খেলার মাঠ এই ধরণের সার্বজনিক জমিতে শুধু দু-এক ধরণের স্বল্পমেয়াদী গাছ না লাগিয়ে নানারকম গাছ-গাছালির মিশ্র চাষ করলে খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী যোগান তো বাড়বেই সাথে সাথে মধুর ব্যবসা, ভেষজ রংয়ের ব্যবসা, গাছের বীজ ও চারা বিক্রীর ব্যবসা, ভেষজ ওষুধের ব্যবসা আদিও গড়ে উঠতে পারে।
- যৌথ সঞ্চয়ভিত্তিক দলগত ব্যবসা করলে সুগন্ধি ও উদ্বায়ী তেল, কাঠের আসবাব ও খেলনা, পাট-মেস্তার তৈরী কাপড় ও কাগজ, উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরীর ব্যবসাও গড়ে তোলা যেতে পারে।

এ ধরণের নানা কাজের সম্ভাবনা তৈরী হতে পারে যদি আমরা কৃষিতে বৈচিত্র বাড়ানো ও সমন্বয় ঘটানো, কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার কমানো, পতিত জমি জায়গা ও জলাভূমির যৌথ ব্যবস্থাপনার কাজকে এলাকাভিত্তিক প্রচেষ্টা হিসাবে গড়ে তুলি ও স্বল্পকালীন লাভ, এক ফসলী চাষ ও ব্যক্তিগত লাভের ওপর একটু কম গুরুত্ব দিই।

Income Generation & Self Employment Through
Sustainable Agri-Resource Management
Ardhendu Sekhar Chattopadhyay
Director, DRC & SC

চাই "চির সবুজ বিপ্লব" — কিন্তু কিভাবে?

শ্রী অসিত বরণ মণ্ডল

কৃষি উন্নয়ণ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারতবর্ষের বর্তমান জনসংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশী। সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষের এই বিপুল জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরণের মাটি ও জলবায়ু এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের আশীর্বাদের জন্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই মানুষ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই যে কোন কারণে যদি কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় তাহলে ভারতবর্ষের কৃষিজীবি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যাহত হতে বাধ্য।

১৯৪২ সালে বাংলায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পর সারা দেশে "অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযান" *(Grow More Food Campaign)* শুরু হয়। তার পর জাতীয় ও রাজ্য স্তরে স্বাধীনোত্তর কালের শুরু থেকে ধাপে ধাপে নানান কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। যেমন,

(১) সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প *(Community Development Programme)* — ১৯৫২ সালে

(২) সার বিতরণ প্রকল্প *(Fertiliser Distribution Scheme)* — ১৯৪৭-৬২

(৩) বীজ শংসিতকরণ প্রকল্প *(Seed Certification Scheme)* — ১৯৪৭-৬২

(৪) শস্য রক্ষা প্রকল্প *(Plant Protection Scheme)* — ১৯৪৭-৬২

(৫) নিবিড় কৃষি জেলা প্রকল্প *(Intensive Agricultural District Programme)* — ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়।

(৬) নিবিড় কৃষি এলাকা প্রকল্প *(Intensive Agricultural Area Programme)* — ১৯৬৪

(৭) অধিক ফলনশীল জাত প্রকল্প *(High Yielding variety Programme)* — ১৯৬৬

(৮) মিনিকিট বীজ প্রকল্প *(Minikit Seed Programme)* — ১৯৬৬ ও পরবর্তী সময়।

উপরিল্লিখিত মূল প্রকল্পগুলির সম্মিলিত ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের কৃষিতে আসে "সবুজ বিপ্লব"। উচ্চফলনশীল জাতের ধান ও গম এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করে উন্নয়নশীল

দেশগুলিতে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। ১৯৬৮ সালে *UAAID* এর ডিরেক্টর *W. S. Gaud* এই পরিবর্তনকে সবুজ বিপ্লব বা *Green Revolution* বলে বর্ণনা করেন। এর ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ খাদ্য আমদানিকারী দেশ থেকে বর্তমানে খাদ্যে স্বনির্ভর এবং খাদ্য রপ্তানিকারী দেশের ভূমিকা নিতে পেরেছে। বর্তমানে আমরা চাই এই সবুজ বিপ্লব চির সবুজ বিপ্লবে পরিণত হোক। উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও বাড়তে থাকুক। কিন্তু ....।

অধিক উৎপাদনের কথা ভেবে কৃষক বন্ধুরা প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক সার (বেহিসেবী) ব্যবহার করায় ও জৈব এবং জীবাণু সার না ব্যবহার করার ফলে মাটি *(Soil)* ক্রমশ উর্ব্বরতা হারাচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলা যায় আমরা মাকে (মাটিকে) অসুস্থ করে তুলেছি। কিন্তু সে দিকে আমাদের (কৃষকবন্ধুদের) নজর নাই। সর্ব্বোপরি কথায় কথায় ফসলে বিষ প্রয়োগ এবং পরিবেশ-বান্ধব বিষ ব্যবহার না করার ফলে আজ বাস্তুতন্ত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে। তাই এখন আর শোনা যায় না ভোর রাতে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া ডাক। দেখা যায় না ঘন ঘন শামুক/কাঁকড়ার দল (বর্ষাকালে), শোনা যায় না কান ঝালাপালা করা ব্যাঙের ডাক, অবলুপ্তপ্রায় আরো কত কি। এ-তো গেল সার ও বিষের কথা। এ ছাড়াও নানান কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতার বাজারে ভারতবর্ষের তথা রাজ্যের কৃষি ও কৃষক বিশাল *challenge* এর সম্মুখীন। এখন সবার চিন্তা ভাবনা ও সহযোগীতার জন্য কৃষক বন্ধুর কিছু কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরা যাক।

ক) প্রগতিশীল কৃষকের সমস্যা -

১) কৃষি শ্রমিক - এখন কৃষি শ্রমিক দক্ষ/অদক্ষ আগের মতো অত সহজলভ্য নয়। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল/শহরাঞ্চলের আশেপাশে এই সমস্যা বেশী।

২) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য - সুস্থ ও পরিকল্পিত বিপনন ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে না। এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে নজর দিতে হবে। বর্তমানে কৃষকদের কাছে এটা সব থেকে বড় সমস্যা।

৩) প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ - বিশ্বায়নের যুগে আজ প্রতিটি কৃষি পণ্য বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগীতার সম্মুখীন। এই প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে গেলে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাহায্যে ফসলের গুণ ও মান বজায় রাখতে হবে, নতুবা হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

৪) গুদাম ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অপ্রতুলতা।

খ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সমস্যা - (উপরের সমস্যাগুলি সমেত)

১) সমবায় ভিত্তিতে চাষ-বাস/বিপণন সম্পর্কে উপযুক্ত ধ্যান ধারণা কিংবা উদ্যোগের অভাব।

২) সহজলভ্য মূলধনের অভাব।

৩) ব্যায়সাপেক্ষ হওয়ায় উন্নত কৃষি যন্ত্রাপাতির ব্যবহার করতে না পারা।

এখন ভাববার বিষয় কিভাবে উপরিল্লিখিত মূল সমস্যাগুলি থেকে কৃষক বন্ধুকে বের করে আনা যায়। এ বিষয়ে সামান্য কিছু পথের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও প্রগতিশীল সব কৃষক বন্ধুকে চায-বাসে আরও পেশাদারী ও প্রযুক্তি নির্ভর মনোভাব নিতে হবে। কৃষিজীবি, অথচ কৃষিকাজে পেশাদারী মনোভাব নেবো না এ হতে পারে না।

২) খরচ জমানোর জন্য কৃষিতে পারিবারিক শ্রম/ফসল রক্ষার জন্য *IPM* পদ্ধতি/সার প্রয়োগের জন্য জৈব ও জীবাণু সারের ব্যবহার ইত্যাদি করতে হবে।

৩) সমাজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কৃষক। কৃষককে অবহেলা না করে তাকে আরো বেশী সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে।

৪) সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ ও বিপণন ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে হবে।

৫) সরকারের প্রয়াসের পাশাপাশি বিভিন্ন *NGO* এবং প্রচার মাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে এবং কৃষকবন্ধুদেরও এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

Necessity of Green Revolution and how?

Sri Asit Baran Mondal
Agricultural Development Officer, Agricultrue Dept.,
Govt. of W.B.

বৃষ্টি নির্ভর চাষ ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি

ডঃ সুধাময় বিশ্বাস

প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিগত কয়েক দশকে পঃ বঙ্গে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে রয়েছে সেচ ব্যবস্থার প্রসার। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বৃদ্ধি। বিভিন্ন ফসলের উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবন, উন্নতমানের বীজের ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পোকাদমন ও বিভিন্ন ধরণের রোগের প্রকোপ থেকে ফসল রক্ষা। সেচসেবিত কৃষিজমির এলাকা বাড়ানোর জন্য সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন ধরণের সেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে যেমন - নদীসেচ প্রকল্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রকল্প, ইঞ্জিন চালিত পাম্প ব্যবহার করে নদী, নালা, খাল, বিল ও পুকুরের জল উত্তোলন করে সেচসেবিত কৃষিজমির এলাকা বাড়ানো হয়েছে। মূলতঃ ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ এই দুই উৎস থেকে জল কৃষি উৎপাদনে সেচের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব সেচসেবিত কৃষিজমিতে বছরে একাধিক ফসলের চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। সেচসেবিত জমিতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা অকল্পনীয় ভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এতসব সাফল্য সত্ত্বেও এ রাজ্যের কৃষি জমির অনেক এলাকা এখনও সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি যদিও এইসব এলাকার জন্য প্রযুক্তিগত সূত্র সমাধান জানা আছে যেখানে এখনও সরাসরি বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন করা হচ্ছে। বেশিরভাগ বৃষ্টি নির্ভর কৃষি জমিতে এখনও বছরে মাত্র একটি ফসলের চাষ হয় এবং অন্য মরসুমে জমি পতিত রাখা ছাড়া উপায় থাকে না কারণ সেচের জলের যোগান নেই।

এ রাজ্যের বৃষ্টি নির্ভর কৃষি জমিকে অবস্থান অনুযায়ী প্রধানতঃ দু'ভাগে চিহ্নিত করা যায়। যেমন - উঁচু জমি ও নীচু জমি।

বৃষ্টি নির্ভর উঁচু কৃষি জমি — চিরাচরিত ও বিকল্প কৃষিব্যবস্থা

বর্ষাকালে এই ধরণের জমিতে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় সেই জলের একটি অংশ মাত্র ফসল চাষের কাজে লাগে। বাকি বাড়তি বর্ষাকালীন বৃষ্টির জল জমি থেকে বয়ে অন্যত্র সরে যায়। বর্ষার ফসল কাটার পর এই সব জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকার ফলে বছরের বাকি সময় সাধারণত পতিত থাকে। এছাড়া আরও সমস্যা হল মরসুমি বৃষ্টি সময়মত ও নিয়মিত না হলে ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ রাজ্যের পশ্চিমা ফসলের জেলাগুলিতে যেমন — পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার উঁচু এবং অসমতল জমিতে চিরাচরিত চাষ পদ্ধতি উৎপাদনের হার সাধারণত কম এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের বছরে ফসল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ সারাবছরে বৃষ্টিপাতের যা পরিমাণ তা বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সুপরিকল্পিত সুষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে ফসল উৎপাদনের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে, ফসলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা আসবে ও এই জমিতে সারা বছরে ফসলের চাষ সম্ভব হবে।

এইসব এলাকার বৃষ্টিনির্ভর চাষে কৃষি উন্নতিসাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় ও রাজ্য সরকারের কৃষিবিভাগের মাধ্যমে কৃষির জল সংরক্ষণ করে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক নিবিড় ও বহুমুখী চাষের জন্য সেচ ব্যবস্থা রূপায়নের পরিকাঠামো জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে আছে। এইসব প্রকল্পের অধীনে বৃষ্টির বয়ে যাওয়া জল আটকে রাখা হয় জলাধার তৈরী করে অথবা মজে যাওয়া জলাধার সংস্কার করে এবং বড় পরিধির কূপ খনন করে। এছাড়াও বৃষ্টির জল জমিতে ধরে রাখার বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি আছে যেমন উঁচু জমিতে আইল তৈরী করে বৃষ্টির জল বন্দী করে রেখে চাষের ব্যবস্থা ও সীমিত জলে চাষের উপযোগী ফসল ও সেই সব ফসলের উন্নতজাতের বীজ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এ ধরণের উন্নয়নমূলক সংস্কার হলে বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক এবং দারিদ্র সীমার নিচে কৃষকেরা কৃষিতে সাফল্যের জোয়ার আনতে অংশীদার হওয়ার বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারবে। এই সম্ভাবনাকে সার্থক করে দিতে হলে প্রয়োজন — (১) কৃষকের জানা দরকার কি ধরণের প্রযুক্তি কাজে লাগানো যেতে পারে। (২) সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি ব্যবস্থা আছে। (৩) পঞ্চায়েতের সঠিক ভূমিকা গ্রহণ ও সরকারী ব্যয়বরাদ্দ যাতে দ্রুত ও দক্ষতা সহকারে নিজ নিজ এলাকার কৃষি উন্নয়নের কাজে লাগে তা তরান্বিত করা। (৪) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই ধরণের প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে। সুপরিকল্পিতভাবে এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কৃষিপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বৃষ্টি নির্ভর উঁচু জমিতে বিকল্প চাষ ব্যবস্থা রূপায়ণ করে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদন যথেষ্ট মাত্রায় বাড়ানো সম্ভব।

বৃষ্টিনির্ভর নীচু ও আবদ্ধজলযুক্ত কৃষিজমি - চিরাচরিত ও বিকল্প চাষ পদ্ধতি

উপকূলবর্তী জেলা ও গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলের নীচু কৃষিজমিতে বর্ষাকালে জল আবদ্ধ আছে। বর্ষাকালে এ ধরণের কৃষিজমিতে ধান ছাড়া অন্য কোন ফসলের চাষ করা সম্ভব হয়। অনিয়ন্ত্রিত গভীরতায় আবদ্ধ জলাজমিতে চিরাচরিত চাষ পদ্ধতিতে ধানের ভাল

ফসল পাওয়া যায় না এবং আমনধান কাটার পর বর্ষাকালে জমে থাকা বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা না থাকলে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন ফসলের চাষ সুষ্ঠভাবে অথবা আদৌও করা সম্ভব হয় না। ফলে কৃষি কাজে নিযুক্ত গ্রামবাসীদের কাজের চাহিদা কমে যায়। বর্ষায় নিচুজমিতে আবদ্ধজলে ধানচাষে বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় পড়তে হয় যেমন, বেশি বৃষ্টি হলে জমিতে জল জমে চারা অবস্থায় ধান গাছের ক্ষতি হয়। অনেক ক্ষেত্রে ধানচারা মরে যায়, ধানের পাশকাঠি তৈরী হতে অসুবিধা হয় এবং গুছিতে শীষের সংখ্যা কম হয়, নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদ ধানগাছের ক্ষতি করে, রোগ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হয়।

বিকল্প কৃষি ব্যবস্থায় এধরণের নীচু ধান জমিতে বর্ষাকালে মিশ্র চাষের লাভজনক প্রযুক্তি আছে। এছাড়া বছরের বিভিন্ন মরসুমে নানা রকম ফসল চাষের সুযোগ তৈরী করা সম্ভব স্বল্প খরচে। কৃষকেরা নিজের জমিতে বৃষ্টির জল ধরে রেখে বিভিন্ন ফসল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ দিয়ে বছরে ৩ - ৪ রকম ফসল চাষের ব্যবস্থা করে নেওয়া সম্ভব। বর্তমানে আবদ্ধজলযুক্ত ধানজমিতে 'ধান ও মাছ' মিশ্রচাষ করলে যে সুবিধা হয় তা হলঃ—

১) ধানচাষের সাথে মাছ-চাষ করলে ধানের ফসল বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে উন্নতজাতের ধানবীজ ব্যবহার করলে ধানের ফসল আরও বৃদ্ধি পায়।

২) ধানচাষের জমিতে মাছের মিশ্রচাষ করার ফলে শত্রু পোকার আক্রমণ প্রতিহত হয় ও জমিতে আগাছ' দমন সম্ভব হয়।

নীচু কৃষি জমিতে বৃষ্টির জল পরবর্তী মরসুমে চাষের জন্য জমা রাখার যে ব্যবস্থা তাকে বলা হয় "বৃষ্টির জল আইলবন্দীকরণ"। ছোট জমি যেমন ১-১$^{১}/_{২}$ বিঘা জমিতে এইধরণের প্রকল্প নেওয়া যায়। বৃষ্টির জল জমিতে ধরে রাখার জন্য জমির পাঁচভাগের এক অংশে অগভীর জলাধার খনন করে খননের মাটি দিয়ে জমির চারপাশের আইল এমনভাবে উঁচু করে নিতে হবে যাতে অতি বৃষ্টির সময় ও বৃষ্টির জল জমির বাইরে যেতে না পারে। এইভাবে জমি সংস্কার করে নিলে জমির উঁচু এবং চওড়া আইলে প্রায় সারা বছর নানা রকম সবজী চাষ হতে পারে। জলাধারের পাড়ে লতানো সবজীর বীজ বপন করে মাচাতে, সীম, লাউ বরবটি জাতীয় ফসলের চাষ হতে পারে। আমনধান কাটার পর জমির এক অংশে বৃষ্টির জল জমে থাকা জলাধার সেচের কাজে লাগিয়ে নানা রকম শীতকালীন ও জলদি ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের চাষ করা যায়। জলাধারের পাড়ে ২ - ৪ টে ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে।

ভূমি সংস্কারের পর সঠিক কৃষিপ্রযুক্তি যাতে প্রয়োগ করা হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের দরকার। এ রাজ্যের কিছু এলাকায় এধরণের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এবং কৃষকের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে —

১) একক জমিতে ফসলের উৎপাদন একাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

২) কৃষকের জমিতে কাজের জন্য বাড়তি শ্রমদিবস তৈরী হয়েছে।

৩) নতুন কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের বাড়ীতে পৌঁছে গিয়েছে।

৪) কীট শত্রু দমনের জন্য বিষ ঔষধের ব্যবহার কমেছে।

৫) জৈবসার ও জৈব রসায়ন ব্যবহারের প্রতি চাষীর আগ্রহ বেড়েছে।

এইসব তথ্য প্রবন্ধ লেখকের প্রযুক্তি তত্ত্বাবধানে রূপায়িত প্রকল্পের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এখানে বলা হল।

কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমের খবর যে এ রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এ ধরণের প্রকল্প রূপায়নে উদ্যোগ নিতে চলেছেন। সুন্দরবনের কৃষক পরিবারের বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী এবং এই প্রকল্প রূপায়ন করতে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে।



মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে যথাযথ সার প্রয়োগে ফসলের অধিক উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি

ড: সুভাষ চন্দ্র মণ্ডল
প্রাক্তন আধিকারিক, এফ.সি.আই.

মাটি থেকে প্রতি বছর উদ্ভিদ খাদ্য নিঃশেষিত হয় নিবিড় শস্য পর্যায় ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের জন্য। রাসায়নিক সারের মাধ্যমে যে পরিমান উদ্ভিদ খাদ্য মাটিতে দেওয়া হয় তা নিঃশেষণ অপেক্ষা অনেক কম। রাসায়নিক সার বছরের পর বছর ব্যবহারের ফলে মাটির কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। এইভাবে মাটির জৈব ক্রিয়ার অবক্ষয় ঘটে, ফলে যতই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হোক না কেন সারের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয় না। মাটির এই প্রতিবন্ধকতা কাটাতে না পারলে কৃষক ভায়েরা কখনই ফসলের ফলন বৃদ্ধি করতে পারবেন না। মাটির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে রাসায়নিক সারের সঙ্গে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে কারণ মাটি হচ্ছে একটি জীবন্ত বস্তু। জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটির পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। মাটিতে বায়ু চলাচল সুগম করে, মাটিতে জৈব অ্যাসিড তৈরী করে যা উদ্ভিদখাদ্য দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে এবং মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই মাটির স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য। এবং তা একমাত্র সম্ভব মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে চাষ করে।

কেন জমির মাটি পরীক্ষা করবেন?

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য মোট ১৬টি খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে কার্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন - এই তিনটি বাতাস এবং জল থেকে গ্রহণ করে, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, দস্তা, তামা, বোরন, মলিবডেনাম ও ক্লোরিণ - এই তেরটি সংগ্রহ করে মাটি থেকে। সুতরাং মাটিই হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সরবরাহকারী মাধ্যম। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পুষ্টি, ফলন দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ভর করে যে মাটিতে জন্মাচ্ছে তার গুণাগুনের উপর। জমির মাটিতে ঐ খাদ্য উপাদানগুলি সহজলভ্য অবস্থায় যথাযথ পরিমাণে থাকলে উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করে উত্তরোত্তর পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করে এবং তার ফলন দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়ে। তাই যেকোন সার প্রয়োগ করার আগে জানা দরকার প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান জমির মাটিতে কোন অবস্থায় কতটা পরিমান আছে। প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান কম হলে গাছের পুষ্টি, বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং ফলন দেওয়ার ক্ষমতাও কম হবে। আবার খাদ্য উপাদান বেশী হলে তা কোন কাজে লাগবে না। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় অধিক মাত্রায় সার প্রয়োগ অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সার প্রয়োগের সাফল্য পাওয়ার

জন্য যে কোন ফসল চাষের আগেই বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান জমির মাটিতে কতটা পরিমানে আছে তাই জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

জমির উর্বরা শক্তির মান জানার সহজ উপায় জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া। পরীক্ষাগারে জমির মাটির নমুনা পরীক্ষা করে জানতে পারা যায় মাটি থেকে কতটা পরিমাণ খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়। এছাড়া মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বর মান ও মাটিতে দ্রবণীয় লবণের পরিমানও জানা যায়।

জমির মাটি পরীক্ষার জন্য মাটির নমুনা ঠিক ভাবে সংগ্রহ করার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। যে জমির মাটি নেওয়া হবে তার অবস্থান যদি একই রকম হয়, মাটি যদি একইপ্রকারের হয়, আগের মরসুমে যদি একই ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে তাহলে সেই জমির ১০ থেকে ১৫ জায়গার মাটি এক সাথে মিশিয়ে একটি নমুনা নিলেই চলবে। আর তা না হলে মাটির প্রকার ভেদে, অবস্থানের তারতম্য অনুসারে পূর্ববর্তী মরসুমের চাষ ও সার প্রয়োগের ভিন্নতা অনুসারে গোটা জমিটিকে কতকগুলি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে প্রত্যেক প্লট থেকে আলাদা আলাদা নমুনা নিতে হবে। জমির যেখান থেকে নমুনা নেওয়া হবে প্রথমে সেই জায়গাগুলি চিহ্নিত করতে হবে। ধান, গম, শাক সবজীর জন্য ১৫ সে.মি. গভীরতা থেকে এবং পাট, আলু, আখ ইত্যাদির জন্য ২০ সে.মি. গভীরতা থেকে মাটি নিতে হবে। নমুনা সংগ্রহের জন্য কোদাল, খুরপী বা সয়েলঅগার ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। নমুনা সংগ্রহের আগে যে সমস্ত চিহ্নিত জায়গা থেকে নমুনা নেওয়া হবে সেখান থেকে ঘাস, আগাছা ইত্যাদি তুলে ফেলে দিতে হবে। কোদাল বা খুরপীর সাহায্যে নমুনা সংগ্রহ করলে প্রথমে ইংরাজী V অক্ষরের আকারে একটি গর্ত খুড়ে ঐ গর্তের একপাশ থেকে ১৫ সে.মি. বা ২০ সে.মি. পুরু মাটির চাপ তুলে নিতে হবে। এইভাবে সংগৃহীত মাটির নমুনাগুলি একটি পরিস্কার বালতিতে রাখতে হবে। সব জায়গার মাটি নেওয়া হয়ে গেলে বালতির মাটি একটি পরিস্কার প্লাসটিক কাপড়ের উপর ঢেলে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। মাটির সঙ্গে গাছপালার শিকড় বা অন্যান্য আবর্জনা থাকলে সেগুলি বেছে ফেলে দিতে হবে। এরপর মাটির চাপগুলোকে গুড়ো করে সমান চারটি ভাগে ভাগ করে বিপরীত দুটি ভাগ ফেলে দিতে হবে। বাকী দুটি ভাগকে আবার একসাথে মিশিয়ে পুনরায় সমান চার ভাগে ভাগ করে বিপরীত ভাগ দুটি ফেলে দিতে হবে। এই ভাবে যখন আধ কেজির মত মাটি পড়ে থাকবে তখন সেটিকে নমুনা হিসাবে রেখে দিতে হবে। মাটির নমুনা ভিজে থাকলে সেটি ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নিয়ে পলিথিন বা পরিস্কার কাপড়ের থলিতে ভরে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে।

মাটির নমুনার সঙ্গে পাঠাবার তথ্যাবলী

১) ক্রমিক নং, ২) সংগ্রহের তারিখ, ৩) কৃষকের নাম, ৪) গ্রাম, ৫) পোঃ অফিস, ৬) জেলা, ৭) মৌজা, ৮) জে.এল.নং, ৯) দাগ নং, ১০) মাটি নেওয়ার গভীরতা, ১১) জমির

অবস্থান, ১২) মাটির প্রকার, ১৩) সেচের সুবিধা, ১৪) জল নিকাশের সুবিধা, ১৫) কি কি ফসলের চাষ করবেন, ১৬) আগের ফসলের নাম, সার প্রয়োগের পরিমান ও উৎপাদন বিষয়ে মন্তব্য, ১৭) কোন কোন ফসলের জন্য সার প্রয়োগের সুপারিশ করতে হবে, ১৮) মাটির নমুনা সংগ্রাহকের সাক্ষর।

মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মাটির মান নির্ণয়

ক) মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব

পি. এইচ. মেপে মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমান নির্ণয় করা হয়। ০-১৪ হচ্ছে পি. এইচ পরিমাপের সূচক ক্রম। ৭ হচ্ছে মধ্যবিন্দু। পি এইচ ৭ এর চেয়ে যত কমবে মাটির অম্লত্ব তত বাড়বে। আবার পি এইচ ৭ এর উপরে যত বাড়বে মাটির ক্ষারত্ব তত বাড়বে। নিরপেক্ষ মাটি অর্থাৎ অম্লও নয় আবার ক্ষারও নয় এই রকম মাটির পি এইচ হয় ৬.৫-৭.৫। পি. এইচ ৫ এর কাছাকাছি হলে চুন বা চুন জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ করে মাটির অম্লত্ব সংশোধন করতে হবে। আবার ৮.৫ এর কাছাকাছি হলে জিপসাম দিয়ে মাটির ক্ষারত্ব সংশোধন করতে হবে।

খ) মাটিতে দ্রবণীয় লবণ

বীজের অঙ্কুরোদগম এবং গাছের খাদ্য গ্রহণ নির্ভর করে মাটিতে দ্রবণীয় লবণের পরিমাণের উপর। ১:২ অনুপাতে মাটি ও জলের মিশ্রণে বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা যদি প্রতি মিলি মিটারে ১ মিলিমোর বেশী না হয় তাহলে বুঝতে হবে মাটিতে দ্রবণীয় লবণের পরিমান স্বাভাবিক। বিদ্যুৎ বহনের ক্ষমতা ১ মিলিমোর বেশী এবং ২ মিলিমোর কম হলে বীজের অঙ্কুর গজানোর অসুবিধা হয়। ২-৩ মিলিমোর হলে গাছের ক্ষতি হয়।

গ) প্রধান তিনটি উদ্ভিদখাদ্যের উপস্থিতির পরিমানের ভিত্তিতে মাটির উর্বরতার মান এবং সুপারিশ

মাটি পরীক্ষার মান	নাইট্রোজেন (N) (জৈব কার্বন)		ফসফরাস (P_2O_5) কে.জি/হেক্টর		পটাশ (K_2O) কে.জি/হেক্টর	
	মান (%)	সুপারিশ	মান কেজি/ হেক্টর	সুপারিশ	মান কেজি/ হেক্টর	সুপারিশ
অতিনিম্ন	০-০.২৫	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ৫০% বেশী	০-১১.৫	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ৫০% বেশী	২০০ কেজির নিচে	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ২৫% বেশী

মাটি পরীক্ষার মান	নাইট্রোজেন *(N)* (জৈব কার্বন)		ফসফরাস (P_2O_5) কে.জি/হেক্টর		পটাশ (K_2O) কে.জি/হেক্টর	
	মান (%)	সুপারিশ	মান কেজি/ হেক্টর	সুপারিশ	মান কেজি/ হেক্টর	সুপারিশ
নিম্ন	০.২৬-০.৫০	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ২৫% বেশী	১১.৬-২২.৪	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ২৫% বেশী	২০০ কেজির নিচে	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ২৫(%) বেশী
মধ্যম	০.৫১-০.৭৫	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ মত	২২.৫-৫৬.০	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ মত	২০০-৫০০ কেজি	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ মত
উচ্চ	০.৭৫-১.০০	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ১০% কম	৫৬.১-৭৬.০	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ২৫% কম	৫০০ কেজির উপর	পটাশ দেওয়ার দরকার নেই
অতিউচ্চ	১.০০ এর উপর	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ২৫% কম	৭৬.০ এর উপর	রাজ্যসরকারের সাধারণ সুপারিশ থেকে ৫০% কম	৫০০ কেজির উপর	পটাশ দেওয়ার দরকার নেই

সৌজন্যে ঃ মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় কেমিক্যালস এণ্ড ফর্টিলাইজারস লিঃ, চেম্বুর, মুম্বাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ফসলে সার প্রয়োগের মাত্রা (হেক্টর প্রতি)

ফসল	নাঃ : ফঃ : পঃ
বোরো ধান	১০০ : ৫০ : ৫০
আমন ধান	৬০ : ৩০ : ৩০
আউস ধান	২৫ : ২৫ : ২৫
গম	১০০ : ৫০ : ৫০
ভুট্টা	৫০-৬০ : ৩০ : ৩০
সরিষা	১০০ : ২৫ : ২৫
তিল	৫০ : ২৫ : ২৫
তুলা	৩৫ : ২৫ : ১০
আলু	১৫০ : ১৫০ : ১০০
মসুর	২০ : ৫০ : ২০
মুগ	২০ : ৪০ : ২০
কলাই	২০ : ৪০ : ২০
চীনাবাদাম	১৫ : ৩০ : ৩০
পাট	৬০-৮০ : ৩০ : ৩০

আঁখ	১৪০ : ৮০ : ৮০
অড়হর	২০ : ৫০ : ২০
ফুলকপি	১০০ : ৭৫ : ৫০
বাঁধাকপি	১২০ : ৬০ : ৬০
ওলকপি	৮০ : ৪০ : ৪০
টমেটো	১০০ : ৫০ : ৫০
লঙ্কা	৪০ : ৪০ : ৪০
বেগুন	১২০ : ৫০ : ৫০
পালং	৫০ : ৫০ : ৫০
মূলা	৬০ : ৩০ : ৫০
বীট, গাজর, শালগম	৬০ : ৩০ : ৫০
মটরশুঁটি	৪০ : ৬০ : ৫০
ফরাসবীন	৪০ : ৬০ : ৫০
পিঁয়াজ	১০০ : ৫০ : ৫০
কুমড়ো জাতীয় সবজি	৬০ : ৩০ : ৩০
তরমুজ	১০০ : ৫০ : ৫০
পটল	৮০ : ৫০ : ৫০
ঢ্যাঁড়স	৫০ : ২৫ : ২৫
বেগুন	১০০ : ৫০ : ৫০
লঙ্কা (গ্রীষ্মকালীন)	৭০ : ৩৫ : ৩৫
পুই	৫০ : ২৫ : ২৫
ডাঁটা	৫০ : ২৫ : ২৫
বরবটি	৩০ : ৫০ : ৬০
কচু, ওল	১০০ : ৫০ : ৬০
মিষ্টি আলু	৭০ : ৪০ : ৫০

N.B. : ১) হেক্টর প্রতি (সাড়ে সাত বিঘা জমিতে) ১২-১৫ টন জৈব সার প্রয়োগ করা দরকার। পুরো ফসফেট, পটাশ ও অর্ধেক নাইট্রোজেন মূল সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন সমান দু'ভাগে ভাগ করে চারা লাগানোর ২১ ও ৪২ দিনে চাপান দিতে হবে।

২) মনে রাখতে হবে ১ কেজি নাইট্রোজেন = ২.২৫ কেজি ইউরিয়া
১ কেজি ফসফেট = ৬.২৫ কেজি *SSP*
১ কেজি পটাশ = ১.৬৬ কেজি *MOP*

Soil quality analysis and balanced use of fertilizer
for better agricultural yield

Dr. Subhas Chandra Mandal
Former Officer, Fertilizer Corporation of India

সবজি বীজতলা তৈরির পরিচর্যাগত প্রকৌশল ও টবে চাষ পদ্ধতি

শ্রী শরৎচন্দ্র মাইতি
প্রাক্তন যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা, পঃ বঃ সরকার

বাগানে লাগানোর জন্য যে বিশেষ জায়গায় ঝুরঝুরে মাটি তৈরি করে অতি যত্নে চারা তৈরি করা হয় তাকে বলে বীজতলা।

বিভিন্ন ধরণের সবজি যেমন - ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, লঙ্কা, বেগুণ, টম্যাটো, বড় পেঁয়াজ ইত্যাদি সবজি সবসময় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাউ, কুমড়ো, তরমুজ, সীম, ইত্যাদিও চারা তৈরি করে বাগানে লাগানো হয়।

বীজতলায় সবজি চারা সহ অন্যান্য যেকোন ফুল ও ফল চারা করতে হলে অবশ্যই কতকগুলি প্রকৌশল অবলম্বন করতে হবে তাহলেই অবস্থা অনুযায়ী বীজতলা উন্নত মানের তৈরী করা সম্ভব —

১) **সঠিকভাবে মাটি তৈরি** — বীজতলা বাগানের মধ্যে বা কাছাকাছি কোন জায়গায় সোজাসুজি মাটিতে করা যায় কিংবা মাটির টব বা গামলাতে বা কাঠের বাক্সেও করা যায়। জমিতে বীজতলার জন্য সূর্যালোক প্রাপ্ত উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। এই জমির মাটি পলি-দোঁয়াশ বা বেলে দোঁয়াশ হওয়া দরকার। পার্শ্ববর্তী জমি থেকে বীজতলা কিছুটা (২৫ সেমি বা ১০ ইঞ্চি) উঁচু হবে। মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জৈব ও অজৈব সার মিশিয়ে ভালভাবে তৈরী করতে হবে।

২) **বীজতলা তৈরি** — চারার সংখ্যা অনুসারে প্রতিটি বীজতলার দৈর্ঘ্য কয়েক ফুট থেকে সর্বাধিক ১০ ফুট বা ৩ মিটার তবে প্রস্থে ৯০ সেমি বা ৩ ফুটের বেশি হবে না। প্রতিটি বীজতলার চারপাশে ২০-৩০ সেমি চওড়া ও ১০-১৫ সেমি গভীর জল নিকাশী নালা রাখতে হবে। এতে পরিচর্যায় সুবিধা হবে।

৩) **সার প্রয়োগ** — কোপান মাটির সাথে পাতাপচা সার বা কম্পোস্ট সার (১০ ভাগ মাটির সাথে ১ ভাগ হিসাবে) এবং ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া বীজতলার জন্য ২০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৫০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪) **বীজতলা শোধন** — বীজতলা তৈরি হয়ে গেলে ০.৪% কপার অক্সিক্লোরাইড (১ লিটার জলে ৪ গ্রাম) যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোলান, ব্লু কপারের সাথে ক্লোরোপাইরিফস ৩৫ ইসি (প্রতি লিটার জলে ৩ মিলি) যেমন করোবান, ডার্সবান

মিশিয়ে এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে ৫-৭ সেমি গভীরতা পর্যন্ত মাটি ভিজে যায়।

৫) **বীজশোধন** — প্রতি ৩০০ গ্রাম বীজের সাথে ১ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে কিংবা ১ কেজি বীজের সাথে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে বীজশোধন করে নিতে হবে। ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলেপড়া রোগ দমন করতে স্ট্রেপটোসাইক্লিন ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে বীজ ১৫ মিনিট ভিজিয়ে বপন করতে হবে।

৬) **বীজবপন** — সময়মতো বীজতলা ও বীজ শোধন হয়ে গেলে যে জায়গায় জমিতে বা চালি পটে বীজ বপন করা হোক বা কেন মূল্যবান প্রতিটি বীজ এক এক করে ২ সেমি দূরত্বে বীজ অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় বুনতে হবে। বোনার পর ছাই ছড়িয়ে দিলে পাখির হাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। পরিমিত সেচ ও পরিচর্যায় স্বাস্থ্যবান চারা তৈরি করা সম্ভব। চারা তোলার আগে বীজতলা একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক স্প্রে করে নিলে পরবর্তী ফসলে রোগ ও পোকার উপদ্রব কম খরচেই কমান যায় বা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

৭) **টবে সবজি চাষ পদ্ধতি** —

ক) টবের ধানতলা ঃ— ভাল মানের চারা পেতে টবেই চারা তৈরী করা যায়। এতে বান বন্যার ভয় থাকে না। টব বা কাঠের পাত্রে বীজতলা করা হয়।

খ) মাটি ঃ— ২ ভাগ বেলে দোঁয়াশ মাটির সাথে ১ পাতা সার মিশিয়ে ফর্মালিন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ভাল ফলন পেতে চা চামচের চার চামচ এস. এস. পি. ও ১০০ গ্রাম সরিষার খোল (৫ - ৬ দিন আগে ভেজানো) মেশানো যায়।

গ) সবজি টাব সারমাটির আদর্শ অনুপাত ঃ—

মূলসার - এঁটেল মাটি ৬৫ কেজি, কম্পোস্ট/গোবরসার ১৫ কেজি, খোল (সরিষা/নিম/বাদাম) ০.৭ কেজি, সপার ফসফেট ২৫০গ্রাম, পটাশ ১৫০ গ্রাম, ম্যাগসালফেট ৫০ গ্রাম ইত্যাদির মিশ্রন ১ মাস মিশিয়ে রেখে টবে ব্যবহার করা যাবে।

চাপান সার - গোবর ১ কেজি, খোল (সরিষা/বাদাম) ২০০ গ্রাম, ফ্যানসার ৫০গ্রাম, সুপার ফসফেট ১০০ গ্রা, পটাশ ২০ গ্রাম, ম্যাগসালফেট ২০ গ্রাম ও জল ২০ লিটার মিশিয়ে তরল সার তৈরী করে জলসেচ দেবার পরে ব্যাবহার করতে হবে। খোল ও গোবরকে একই সঙ্গে মিশিয়ে সার প্রয়োগের ২৪ ঘন্টা আগে ব্যবহার করতে হবে।

স্বল্পপরিসর ঘরোয়া সবজি বাগানের পরিকল্পনা

ডঃ আনন্দ কুমার মন্ডল
কৃষি বিশেষজ্ঞ

বাড়ীর আশে পাশে, উঠোনের ধারে বা রান্নাঘরের পেছনে পড়ে থাকা এক চিলতে জমিতে পরিবারের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী সবজি এবং ফল চাষ করা যায়। রান্নাঘরের বা স্নানের পরিত্যক্ত জলকে কাজে লাগিয়ে গৃহসংলগ্ন জমিতে যে কীচেন গার্ডেন তাকেই ঘরোয়া পুষ্টিবাগান বলে।

- **পুষ্টিবাগান কেন করবো?**

১) খাদ্য সমস্যা মেটাতে
২) পুষ্টির অভাব পূরণ করতে
৩) সুষম খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র আনতে
৪) পরিবারে সব সদস্যকে বিষমুক্ত জৈব পদ্ধতিতে তৈরি খাবার যোগান দিতে
৫) দেশী জাতের সুরক্ষায়
৬) একক জমিতে অধিক ফলন পেতে
৭) প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রয়োজনে
৮) উৎপাদনের ঘাটতি মেটাতে
৯) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে

- **একটি আদর্শ খাদ্যতালিকা (আই.সি.এম.আর, ১৯৬৯)**

মাথাপিছু প্রতিদিন	নিরামিষভোজী	আমিষ
১. তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য	৪৭৫ গ্রাম	৪৭৫ গ্রাম
২. ডাল	৮০ গ্রাম	৬৫ গ্রাম
৩. শাক	১২৫ গ্রাম	১২৫ গ্রাম
৪. মূল সবজি	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
৫. অন্যান্য সবজি	৭৫ গ্রাম	৭৫ গ্রাম
৬. মাছ/মাংস/ডিম	—	৬০ গ্রাম
৭. চিনি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
৮. দুধ	২০০ মিলি	১০০ মিলি
৯. ফল	৪৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম
১০. স্নেহজাতীয়	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম

- মাথাপিছু প্রতিদিনকার খাদ্যতালিকার বর্তমান পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জকঃ

খাদ্য	উন্নত দেশ	আমাদের দেশ
তণ্ডুল	৩২৮ গ্রাম	৩৭৫ গ্রাম
শাকসবজি	৩১৬ গ্রাম	৩০ গ্রাম
ফল	৩৭৫ গ্রাম	৮০ গ্রাম

- পুষ্টি যোগাতে সবজি ঃ

১. প্রোটিন - কড়াইশুঁটি, বরবটি, সয়াবীন

২. ভিটামিন - 'এ' - গাজর, শালগম, শাকসবজি
'বি' - বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ
'সি' - সজিনা, টম্যাটো, কাঁচালঙ্কা
'ডি' - শাকসবজি
'ই' - লেটুস, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি

৩. ক্যালসিয়াম -পালং, বাঁধাকপি, ফুলকপি

৪. আয়রণ - কাঁচকলা, লেটুস

৫. ফসফরাস - গাজর, ওল, ফুলকপি

- রোগ প্রতিরোধে সবজি ঃ

লাল বরবটি - রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখে ও কোলেস্টেরল কমায়
বেগুন, গাজর - হৃদরোগে উপকারি
বেগুন ও ছিবড়ে যুক্ত সবজি - পরিবার পরিকল্পনায়, ডায়াবিটিসে
কাঁচা পেঁয়াজ - উপকারি কোলেস্টেরল বাড়ায়
ছিবড়ে যুক্ত সবজি - ক্যানসার, পাথুরি ও হৃদরোগ প্রতিকারে
মূলা, গাজর, পালং, কপি ইত্যাদি - অ্যান্টিকারসিনোজেনিক
রঙীন সবজি - ধূমপানের ক্ষতি দূর করে
তাই রোগ প্রতিরোধে পরিবারের সব সদস্যদের জন্য উপযুক্ত সবজি যোগাতে পরিকল্পনামাফিক চায করতে হবে।

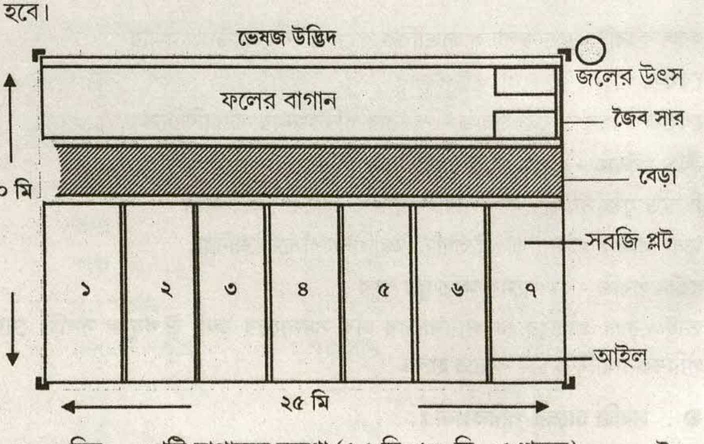
- সবজি চাষের পরিকল্পনা ঃ
  - রোদযুক্ত উঁচু জমি নির্বাচন
  - সেচের সুবিধা চাই
  - যন্ত্রপাতি

- উত্তর দিকে ফলের বাগান
- সংরক্ষণ সুবিধাযুক্ত সবজি
- ছায়াযুক্ত জায়গায় কম্পোষ্ট পিট
- বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ
- বীজশোধন
- সুষম সার প্রয়োগ
- সুষম খাদ্যের জন্য সবজি ও ফল চাষ
- সুসংহত উপায়ে শস্যরক্ষা
- সময়মতো ফসল তোলা

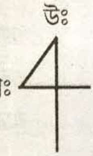
● **পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য সবজি বাগানের নকসা ঃ**

সবজি বা ফল বাগানের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে ১-২ কাঠা জমি থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারকে সারা বছর ধরে ফল ও সবজির যোগান দেওয়া যায়।

জলের নালার ধার বরাবর সুশনি শাক, থানকুনি, কুলেখাঁড়া, বেড়ার ধারে ভেষজ উদ্ভিদ দুই প্লটের মাঝের আল বরাবর চীনারাই, শালগম, বীট, ওলকপি, ধনেপাতা, পিড়িং শাক, মেথিশাক, জৈবসার বা কম্পোস্ট পিটের উপরে মাচায় এবং বেড়ার গায়ে সীম, বরবটি, ধুঁধুল, চিচিঙ্গে, লাউ (উত্তর পশ্চিম দিকে) খরমুজ, কাঁকরোল, ইত্যাদি চাষ করার পরিকল্পনা নিতে হবে।



চিত্র—→ পুষ্টি বাগানের নকশা (২৫ মি x১০ মি = ৫ শতক)



সূচক : প্রধান রাস্তা (৬০ সেমি)
জলের নালা (৬০সেমি)
কম্পোস্ট পিটের উপরে লতানো সবজি

● বিভিন্ন প্লটে সময় ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক শস্য পর্যায় ঃ

প্লট নম্বর	ভাদ্র-কার্ত্তিক	অঘ্রান-মাঘ	ফাল্গুণ-বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবন
১.	বাঁধাকপি	টমেটো	উচ্ছে	নোটে, লঙ্কা
২.	মূলো, পালং	বাঁধাকপি	ডাঁটা, শাক	কলমী
৩.	লঙ্কা	লঙ্কা	ঢ্যাঁড়শ	ডাঁটা
৪.	ফ্রেঞ্চবীন বা ফরাসবীন	কলমী	ঢ্যাঁড়শ	বেগুন
৫.	ব্রোকোলি, ক্যাপসিকাম	মূলো	বেগুন, নোটে	করলা
৬.	ঢ্যাঁড়শ	পালং	শশা, নোটে	ঝিঙে
৭.	টমাটো	মটরশুঁটি	ঝিঙে	পুঁই

এছাড়া পছন্দমত শস্যপর্যায় নির্ধারণ করা যায়। আইলের মধ্যে মূলজ সবজি এবং উত্তর দিকে ফলের বাগান এবং মশলা জাতীয় ফসলও করা যেতে পারে। ঘরোয়া সবজি বাগান থেকে পরিবারের কিছু সাশ্রয় হবেই। সবাই মিলে কাজ করার মধ্যে দিয়ে ঘটবে চিত্তের বিনোদন। এই বাগান পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠে সাংস্কৃতিক মনন। শরীর এবং মনও থাকে সুস্থ ও তরতাজা।

জমির অবস্থান ও আয়তন অনুসারে সবজি বাগান পরিকল্পনায় সমগ্র জমিটি প্রথমে ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতিটি প্লটের পাশে রাস্তা সেচ ও নিকাশী নালা রাখতে হবে। প্রতিটি বাগানে রাখতে হবে একটা মূখ্য প্রবেশ পথ ও মূখ্য নালা। কয়েকটি কম্পোস্ট পিট। গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বেড়া। বেড়ার গায়ে লতানে সবজি বরবটি, সীম, বিনস্ লাগানো যাবে। কম্পোস্টের মাচায় লাউ, কুমড়ো, চিচেঙ্গে, ধুঁধুল, ইত্যাদি চাষ করতে হবে।

খেয়াল রাখতে হবে বৈজ্ঞানিক শস্যপর্যায়ে যেন একই পরিবারের সবজি সারা বছর না হয়। প্লটের আইল সহ কোন জায়গা যেন খালি না থাকে।

● সবজির রোগ পোকা সহনশীল জাতঃ

সবজির নাম	জাতের নাম	পোকা/রোগ সহনশীলতা
বেগুন	পুযাপার্পল ক্লাসটার	তুলসী, ঢলে পড়া, ধসা রোগ,
	পুযা সম্রাট, পন্থ ঋতুরাজ	ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া
	নভকিরন, কালো ঢেপা	ফল ও ডগা ছিদ্রকারি পোকা
	ব্যানারস লং পার্পল,	
বাঁধাকপি	পুযা ড্রামহেড, সিলেকশন-৮	ব্ল্যাক লেগ, কালো পচন
ফুলকপি	স্নোবল, কে-১	কালো পচন
	পুযা শুভ	কালো পচন, রিসিনেস
বরবটি	পুযা কোমল	ব্যাক্টেরিয়া জনিত ধসা
খরমুজ	আরকা রাজহনস্	তুলো রোগ

ঢ্যাঁড়শ	সিলেকশন-২, পার্বনি ক্রান্তি	সাহেব রোগ
পেঁয়াজ	এল-২-৪-১	ধসা, থ্রিপস্
মটর	পি.এম-২	তুলো রোগ
টমাটো	পন্থবাহার পুষা ১২০	ঢলে পড়া, কৃমি
তরমুজ	আরকা মানিক	ডাউনি মিলডিউ, তুলো রোগ অ্যানথ্রাকনোজ
লঙ্কা	পুষা জোয়ালা	ভাইরাস, কৃমি, জাবপোকা

- **উৎপাদন বাড়ানোর টিপস্ ঃ**

কুমড়ো জাতীয় সবজির ফলন বাড়াতে —

১. উঁচু জমিতে মাদা (৬০x৬০x৪৫) সেমি তৈরি করে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

২. পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরী করতে হবে।

৩. হর্মোন স্প্রে করতে হবে ২-৪ পাতা হলে -

ইথরিল - ২৫ পি.পি.এম বা ২৫ মিলিগ্রাম/লিটার

টি.আই.বি.এ - ২৫-৫০ পি.পি.এম (২৫-৫০ মিলিগ্রাম/লিটার)

এম.এইচ - ২৫-১০০ পি.পি.এম (২৫-১০০ মিলিগ্রাম/লিটার)

৪. পটল, কাঁকরোল, কুঁদরির স্ত্রীফুল ও ফলন বাড়াতে দরকার - ১০% পুরুষগাছ ও হাতের সাহায্যে পরাগ মিলন।

- **পাঁচ শতক সবজি বাগানের প্রয়োজনীয় তথ্য**

সবজির নাম	বোনার সময়	বীজ (গ্রাম)	দূরত্ব (ফুট)	সার (কেজি) নাঃ	ফঃ	পঃ	সময় (দিন)	ফলন (কুইঃ)
ফুলকপি	আষাড়-অঘ্রান	৭-১০	১.৫X১.৫	২.৫	১.২	১.২	৭০-৯০	২.৫-৫.০
বাঁধাকপি	শ্রাবন-পৌষ	১০	২X২	২.৫	১.২	১.২	৬০-৯০	৪.০-৬.০
ওলকপি	ভাদ্র-কার্ত্তিক	২০	১X০.৫	১.৫	০.৭	০.৭	৭৫-৯০	২-৩
ব্রোকোলি	আশ্বিন-কার্ত্তিক	১০-১৫	১.৫X১.৫	২	১	১	৭৫-৯০	২-৩
মূলো	আষাড়-অঘ্রান	২৫০	১X০.৪	১.৫	০.৭	০.৭	৩০-৬০	৫-৬
গাজর	ভাদ্র-পৌষ	২.৫	১X০.৩	১.৫	০.৭	০.৭	৭৫-৯০	১.৫-২
বীট	ভাদ্র-পৌষ	২.৫	১X০.৪	১.৫	০.৭	০.৭	৯০	৩-৪
শালগম	ভাদ্র-কার্ত্তিক	১০০	১X০.৫	১.৫	০.৭	০.৭	৭৫-৯০	২-২.৫
পালং	আষাড়-পৌষ	৭৫০	০.৫X০.৫	১.৫	০.৭	০.৭	৩০-৪০	২-২.৫

সবজির নাম	বোনার সময়	বীজ (গ্রাম)	দূরত্ব (ফুট)	সার (কেজি)			সময় (দিন)	ফলন (কুইঃ)
				নাঃ	ফঃ	পঃ		
লেটুস	ভাদ্র-কার্ত্তিক	৩০	১.৫X১	২	১	১	৬০	২-২.৫
পেঁয়াজ	শ্রাবণ-অঘ্রান	১০০	০.২X০.৪	২	১	১	৯০	২-২.৫
রসুন	আশ্বিন-কার্ত্তিক	৭৫০০	০.৫X০.২	২	১	১	৬০-৭০	১.৫-২
মটরশুঁটি	আশ্বিন অঘ্রান	১৫০	১X০.৫	১	১	১	৬০	২-২.৫
বরবটি	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ	২০০	২X৩	১.৫	০.৮	০.৮	৬০	৩-৩.৫
কচু	পৌষ-মাঘ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	৭৫০০	১X১.৫	২	১	১	৯০	২.৫-৩
বেগুন	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১০	২X২.৫	২	১	১	৭৫-৯০	৩-৩.৫
টম্যাটো	শ্রাবন-অঘ্রান	১০	২X২.৫	২	১	১	৭০-৮০	৪-৫
লঙ্কা	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ভাদ্র-আশ্বিন	২৫	১.৫X১.৫	১.৫	০.৮	০.৮	৭৫	২-২.৫
আলু	আশ্বিন-অঘ্রান	৩০০০	১.৫X০.৫	২	২	২	৭৫-৯০	৭-৮
ক্যাপসিকাম	ভাদ্র-আশ্বিন	১৫-২০	২X১.৫	২	১	১	৭৫-৯০	২.৫-৩
ঢ্যাঁড়শ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাঘ-ফাল্গুন	২৫০	২X২	২	১	১	৭৫-৯০	২.৫-৩
লাউ	পৌষ-মাঘ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১২৫	৬X৬	১	০.৫	০.৫	৬০-৭৫	৩-৩.৫
কুমড়ো	পৌষ-মাঘ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১২৫	৬X৬	১	০.৫	০.৫	৬০-৭৫	২.৫-৩
ঝিঙে	মাঘ-ফাল্গুন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১২৫	৪X৪	১	০.৫	০.৫	৪৫-৫০	৩-৩.৫
উচ্ছে	মাঘ-ফাল্গুন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১২৫- ১৫০	৪X২ ৪X৪	১	০.৫	০.৫	৪৫-৫০	২.৫-৩
পটল	কার্ত্তিক-অঘ্রান	৬০-৭০টি কাটিং	৬X৪	১	০.৫	০.৫	৬০-৭০	২.৫-২
শশা	পৌষ-মাঘ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	৭৫	৫X৩	১	০.৫	০.৫	৬০	১.৫-২
ধুঁধুল	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১২৫	৪X৪	১	০.৫	০.৫	৬০-৭০	৩-৪
চিচিঙ্গা	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১২৫	৫X৫	১	০.৫	০.৫	৭৫-৯০	৪-৫
সীম	শ্রাবন-ভাদ্র	১৫০	২X৪	১.৫	০.৮	০.৮	৬০	২-২.৫

● **ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছপালা লাগানোর পরিকল্পনা ঃ**

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এবং বাড়ীর লোকজনের সুস্বাস্থ্যের জন্য ঘরোয়া সবজি বাগানের সাথে এবং বাড়ির আশেপাশে গুল্মজাতীয় গাছগাছড়া লাগানো যেতে পারে — অবশ্য এই

সব গাছপালা ব্যবহার করার আগে কবিরাজের পরামর্শ নিলে ভাল। কিছু গুল্মজাতীয় গাছগাছড়ার উদাহরণ ও গুণাগুণ দেওয়া হল।

ভেষজ উদ্ভিদ	ব্যবহৃত অংশ	কি কি রোগ প্রতিরোধ করে	বংশবিস্তার
১) আমরুল	সমস্ত গাছ	অর্শ, কফ, স্কার্ভি, ব্যাথা	বীজ ও ধাবক
২) আদা	কন্দ	সর্দি, কাশি, পেটের রোগ	কন্দ
৩) কুলেখাড়া	বীজ, পাতা; মূল	বাত, শোথ পিত্ত ও মূত্রযন্ত্রের রোগ	বীজ, ঝাড়
৪) গিমা	পুরো গাছ	কুষ্ঠ, মেদ, রক্তদোষ, জ্বর, চর্মরোগ চুলকানি	বীজ ও মূল
৫) কালমেঘ	পুরোগাছ	রক্তআমাশা, জ্বর, কৃমি	বীজ
৬) গন্ধভাদুলিয়া	পাতা	উদরাময়, বাত, দুর্বলতা, ক্ষুধামন্দ	লতা
৭) থানকুনি	পাতা	চর্মরোগ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, পেটের রোগ, স্মৃতিভ্রম	বীজ, ধাবক, ঝাড়
৮) বাসক	ছাল, পাতা মূল ও ফল	বুকের প্রদাহ, হাঁপানি, সর্দি, কাশি	গাছের ডাল
৯) ব্রাহ্মী বা বিরমী শাক	মূল, কাণ্ড পাতা	বায়ু, রক্তদোষ, পিত্তনাশক, বুদ্ধি, মেধা, আয়ুক্ষয়, বাত	কাটিং
১০) তুলসী	পাতা, বীজ	সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হৃদরোগ	বীজ ও গাছের কাটিং
১১) বেতো শাক	সমস্তগাছ	অর্শ, প্লীহা, পিত্ত, রুচিহীনতা	বীজ
১২) পুনর্নবা	পুরোগাছ, শেকড়	কফ, কাশি, রক্তদোষ	বীজ
১৩) সজনে	ছাল, আঠা, মূল পাতা, ফল	সর্দি, জ্বর, হিক্কা, যকৃৎ ও প্লীহার রোগ	বীজ, ডাল কাটিং
১৪) মেথি	গাছ, বীজ	বাত, চুলপড়া, রক্ত আমাশা, অরুচি	বীজ
১৫) পুদিনা	সমগ্র গাছ ও তেল	পেট ফাঁপা, হজমের গণ্ডগোল, দাঁতের রোগ	শেকড় সহ কাটিং, বক্রধাবক
১৬) হলুদ	কন্দ	রক্তদোষ, দূর্বলতা, ফোলা ও বেদনা বিছার কামড়, চর্মরোগ	কন্দ
১৭) রসুন	কোয়া	চর্মরোগ, যন্ত্রণা, বাত, জ্বর, কৃমি পেটফাঁপা, শ্লেষ্মা ইত্যাদি	বীজ ও কোয়া
১৮) শুশনি	পাতা	ত্রিদোষ, প্রস্বাবে বাধা, অরুচি, জ্বর বুদ্ধিনাশ	বীজ, ঝাড়
১৯) হিঞ্চে	পাতা ও ডাটা	কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত, যকৃতের রোগ	বীজ, কাটিং

অপ্রচলিত অধিক লাভজনক সবজি চাষ

শ্রী কালাচাঁদ মহান্ত
প্রাক্তন মূখ্য কৃষি আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া বর্তমানের এক প্রধান কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে ফসল উৎপাদন খরচ কমানোর সাথে সাথে নতুন ধরণের কিছু সবজি চাষ করা যায়। আজকাল শহরের আশপাশে গতানুগতিক সবজি ছেড়ে অপ্রচলিত সবজির চাষ বাড়ছে। এই চাষ বেশ লাভজনক। কলকাতা সহ সমগ্র শহর ও শহরতলী এলাকায় এই সব সবজির চাহিদা বাড়ছে। এইসব অপ্রচলিত সবজিচাষের সংক্ষিপ্ত টিপস্ তুলে ধরা হল ঃ—

১) প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ সংগ্রহ করা

২) প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম ক্যাপটান বা ১ গ্রাম কার্বেণ্ডাজিম দিয়ে শোধন করে নিয়ে বীজতলাতে বুনলে রোগের আক্রমণ কম হবে।

৩) চারাকে একটি কীটনাশক দ্রবন করে প্রথমেই শোধন করে জমিতে লাগালে রোগ ও পোকার জন্য খরচ কমবে।

৪) যতটা বেশী সম্ভব জৈব সার এবং জীবানুসারের প্রয়োগ বাড়াতে হবে।

৫) প্রথমে পরীক্ষা মূলক চাষ করে করে, বেশী জায়গায় চাষ বাড়ালে লোকসান হওয়ার ভয় কম থাকে।

৬) টবে ও এই সমস্ত অপ্রচলিত সবজি চাষ ভালভাবে করা সম্ভব।

৭) যারা কোলেস্ট্রেরল, হাইপার টেনশন ও হৃদরোগে ভুগছেন তাঁদের জন্য ব্রোকলী ও অন্যান্য অপ্রচলিত সবজি আদর্শ খাদ্য।

কয়েকটি অপ্রচলিত সবজি চাষের পদ্ধতি সারণীতে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল —

সাবণী -১ — অপচলিত সবজি চাষেব সংক্ষেপ

সবজিব নাম	জাত	লাগানোব সময়	দবত্ব ইঞ্চি	বীজেব পবিমান	মেযাদ (দিন)	কম্পোস্ট (টন/বিঘা)	সাব পযোগ না ফ প	ফলন কঃ/বিঘা
১। সবজ ফলকপি (*Sprouting broccoli*)	মাস্টেট, ইটালিযান গাণ স্প্রাডটিং, প্যাকমান, পাইবেট, সলতান, বিগেডিযাব, ভাইকিং, আলটাগাণ, বোনর্জিনো, ইমাবেল্ডসিটি, সিটাসিনা,	শ্রাবণ-আশ্বিন	৩০"x৪৫"	৩০ গাম	৭০-৯০	১.৫ টন	২০ ১০ ১০	১৫-২০ ক.
২। ব্রুসেলাস স্প্রাডট বা চীনা বাধাকপি	চাইনিজ ক্যাবেজ ওডিসি (*Brussels sprouts*)	কার্ত্তিক-পৌষ	৩০"x৪৫"	৫০ গাম	৭০-৯০	ঐ	ঐ	২৫-৩০
৩। চাইনিজ বাধাকপি (*Chinese cabbage*)	পাকচৈ	কার্ত্তিক-পৌষ	৩০"x৪৫"	৫০ গাম	৭০-৯০	ঐ	ঐ	২৫-৩০
৪। লাল বাধাকপি	বেড জযেল, সবেখা	আশ্বিন-কার্ত্তিক		৫০ গাম	৭০-৯০	ঐ	ঐ	২৫-৩০
৫। লেটস (*Lettuce*)	গেট লেকস, বোল্ট, ফেঞ্চ, বেকফাস্ট, ডার্কগাণ	আশ্বিন-অগহাযন	১৮"x১৮"	৫০ গাম	৭০-৯০	২	১৬ ৮ ৮	৫-৬

সাবণী -১ — অপচলিত সবজি চাষেব সংক্ষেপ

সবজিব নাম	জাত	লাগানোব সময়	দবত্ব ইঞ্চি	বাজেব পবিমান	মেযাদ (দিন)	কম্পোস্ট (টন/বিঘা)	সাব পযোগ না ফ প	ফলন কঃ/বিঘা
৬। ক্যাপসিকাম	ক্যালিফর্নিযা, ওযাণ্ডাব, হযাকো, ওযাণ্ডাব, সহট ব্যানানা, মিডওযে ভাবত, পি-২, ডিটিবেল, নাথহাবা, গোল্ডেন সামাব	ভাদ্র-আশিন	২৪"x১৮"	৫০ গাম	৭০-৯০	৫ টন	২০ ২০ ২০	৬০-৭০ ক.
৭। সেলাবি *(Celery)*	বিত্রগন্ত, বি.এস.এস-৬৬ ১৯২	আশিন-কার্ত্তিক	২৪"x৬"	৫০ গাম	১২০-১৫০	২.৫	১৬ ৮ ৮	৩০-৪০
৮। ঘেবকিন বা গোল খিলা *(Gherkin)* *Cucumis anguria*	বি.এস.এস-১৬৮, ১৬৯	আশিন-কার্ত্তিক	২৪"x৬"	৫০ গাম	১২০-১৫০	২.৫	১৬ ৮ ৮	৩০-৪০

Cultivation of some important alternative uncommon vegetable crops for higher income generation

Sri Kalachand Mohanta
Ex-Principal Agricultural Officer, 24 Pgs.(South) Government of West Bengal,

অভিনব সবজি মাশরুম

ডঃ আনন্দ কুমার মণ্ডল,
অনিন্দিতা চক্রবর্তী ও ডঃ ধীরা গঙ্গোপাধ্যায়
রিডার, কলকাতা বিশ্যবিদ্যালয়

মাশরুম বা ছাতু এক ধরনের ক্লোরোফিল বিহীন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। আমাদের এই বিশ্বে প্রায় ৪৫,০০০ ধরনের ছত্রাক আছে — যার মধ্যে প্রায় ২,০০০ ছত্রাক আমরা সবজি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এর মধ্যে আমাদের দেশে চার ধরনের মাশরুম চাষ করা যায়।

১) সাদা বোতাম ছাতু (Button Mushroom) - *Agaricus sp.*
২) ঝিনুক ছাতু বা ধিংরি ছাতু (Oyster Mushroom) - *Pleurotus sp.*
৩) পোয়াল ছাতু (Paddy Straw Mushroom) - *Volvariella sp.*
৪) দুধ ছাতু (Milky Mushroom) - *Calocybe sp.*

মাশরুম চাষ কেন করবেন?

★ সহজপাচ্য উদ্ভিজ্য প্রোটিনের যোগান দিতে।
★ খনিজলবন, ভিটামিন ও ফোলিক অ্যাসিডের যোগান দিতে।
★ মাশরুম চাষ সহজ ও খুব কম খরচে করা যায়।
★ যারা নিরামিশাষী তাদের জন্য এবং রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
★ মাশরুম চাষে রোদের প্রয়োজন নেই। নাইলন জালের থলিতে চাষ হলে জমি ছাড়াই মাশরুম চাষ করা যায়।
★ বনজ মাশরুমের তুলনায় চাষ করা মাশরুম সারা বছর পাওয়া যায় ও বিষক্রিয়ার কোন ভয় নেই।
★ প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন কৃষক ও প্রতিবন্ধী এমনকি মহিলাদের জন্যও এই চাষ প্রকল্প হিসাবে করা যায়।
★ হৃদরোগ, ক্যান্সার ও নানান ধরনের ভাইরাস রোগ প্রতিরোধে মাশরুম কাজে লাগে।

জাত অনুযায়ী ছাতু চাষের উপযুক্ত সময় ভিন্ন ধরনের। পোয়াল ছাতু চৈত্র মাস থেকে শুরু করে আশ্বিন মাস পর্যন্ত যখন তাপমাত্রা মোটামুটি ২৮°C এর কাছাকাছি থাকে সেই সময় করা যায়। অন্যদিকে, ঝিনুক ছাতু সারা বছর ধরে হলেও শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন ২০-৩০°C তাপমাত্রা থাকে তখন করা যায়। বোতাম ছাতুর জন্য শীতকালই ভাল। পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে তাপমাত্রা কম সেখানে ভাল হয়। তাই এই ছাতু চাষে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দরকার।

এই সব নানান কারণে পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি ঝিনুক ছাতু ও পোয়াল বা খড় ছাতু সহজেই করা সম্ভব। অন্য দুটি ছাতু চাষ সহজ সাধ্য নয়।

পোয়াল ছাতুর চাষ পদ্ধতি ঃ

১) **মাচা তৈরি ঃ—** পোয়াল ছাতু চাষে বাঁশ বা কাঠের মাচার দরকার হয়। কম খরচে এই মাচা তৈরী করা যায়। যে কোন ছায়াযুক্ত দোচালা ঘরে বা কোন ঘরের বারান্দায় যেখানে প্রচুর পরিমানে আলো বাতাস চলাচল করে সেই জায়গায় মাচা বাঁধতে হবে। মাচা লম্বায় ৬ ফুট এবং চওড়া ১১/২ ফুট বা ২ ফুট এবং উচ্চতা মাচার সংখ্যা অনুযায়ী হবে। মাটি থেকে ১ ফুট উঁচুতে প্রথম মাচা বাঁধতে হবে। দ্বিতীয় মাচা প্রথম মাচা থেকে ২ ফুট উঁচুতে হবে। অর্থাৎ মাচা থেকে মাচার দূরত্ব বা উচ্চতা ২ ফুট এবং মাটি থেকে প্রথম মাচার উচ্চতা ১ ফুট রাখতে হবে। তিনটি বা চারটি মাচা বিশিষ্ট খাঁচা বা ফ্রেম পোয়াল ছাতু চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

২) **খড় সাজাবার পদ্ধতি ঃ—** ৬০ আঁটি দেশী ধানের খড় সংগ্রহ করে আঁটিগুলির মাথার দিকের কিছুটা অংশ কেটে বাদ দিতে হবে। এবার আঁটির বাঁধন খুলে পোয়াল অংশ ঝেড়ে ফেলতে হবে। এরপর প্রত্যেকটি আঁটির মাথার দিক পুনরায় বাঁধতে হবে। এবার খড়গুলিকে ২০ ইঞ্চি মাপের কেটে ঐ অংশও বাঁধতে হবে। অর্থাৎ এক একটি খড় ২০ ইঞ্চি মাপের হবে এবং তারদুই প্রান্তে শক্ত বাঁধন থাকবে। এইভাবে খড়গুলি প্রস্তুত হলে পর যে কোন চৌবাচ্চা বা বড় পাত্রে ১২-১৪ ঘন্টা পরিস্কার জলে ভেজাতে হবে। তারপর খড়গুলি জল থেকে তুলে যে কোন পরিস্কার ছায়াযুক্ত জায়গায় ২-৩ ঘন্টা রেখে অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে ফেলতে হবে। জল ঝরে যাবার পর একদিকে খড়ের মাথা রেখে পাশাপাশি ৭ আঁটি খড় মাচার বা যে কোন উঁচু পাটাতনের উপর সাজাতে হবে। এবার বিপরীত দিকে মাথা রেখে আগের ৭ আঁটি খড়ের উপর আরো ৭ আঁটি খড় সাজাতে হবে। এভাবে সাজানো ১৪ আঁটি খড়ের একটি স্তর হবে। স্তরটির দুপ্রান্ত নাইলন দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে নইলে স্তরের খড়গুলি ধসে যাবার সম্ভাবনা আছে। ঐ স্তরের প্রান্ত বরাবর ১-১১/২ ইঞ্চি ভিতরে ডালের গুঁড়ো ১/২ ইঞ্চি চওড়া করে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর স্পন বা বীজ টুকরো করে ডালের উপর ছড়াতে হবে। বীজ ছড়ানো হলে তার উপর আরও কিছু ডালের গুঁড়ো দিতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় স্তরের ১৪ আঁটি খড় প্রথম স্তরের উপর আড়াআড়ি সাজিয়ে বীজ ও ডালের গুঁড়ো দিতে হবে। তৃতীয় স্তরের ১৪ আঁটি খড় প্রথম স্তরের সমান্তরাল মত সাজিয়ে বীজ ও ডালের গুঁড়ো দিতে হবে। চতুর্থ স্তরের ১৪ আঁটি খড় দ্বিতীয় স্তরের সমান্তরালে একইভাবে সাজাতে হবে। এই স্তরে বীজ বা ডালের গুঁড়ো দেওয়ার দরকার হয়

না। প্রত্যেকটি স্তর নাইলন দড়ি দিয়ে ভালভাবে বাঁধতে হবে। স্তরগুলি সাাজানোর সময় পুরো স্তুপ জোরে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে।

৩) **জল স্প্রে ও অন্যান্য পরিচর্যা ঃ—** খড়ের স্তর সাজানো হলে হাল্কা করে জলে স্প্রে করে তারপর একটা সাদা পলিথিন চাদর দিয়ে সম্পূর্ণ স্তুপটি ঢাকা দিতে হবে। প্রথম ৫ দিন ঢাকা খোলা বা জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ৫ দিন পর সকালে ও বিকালে২০ মিনিটের জন্য ঢাকা খুলে প্রয়োজনমত জল এবং আলো ও বাতাস যাতে পায় তা ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে ৫ দিন করার পর বেডের গায়ে পোস্ত দানার মত ছোট ছোট ছত্রাকের কুঁড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। তখন পলিথিন চাদরে আর ঢাকা রাখার প্রয়োজন হবে না। তবে সকাল ও বিকালে প্রয়োজনমত জল অবশ্য বেড-এ স্প্রে করতে হবে।

প্রথমবার ছত্রাক তোলা-হয়ে যাবার পর ভালভাবে জল স্প্রে করে পুনরায় বেড পলিথিন চাদর দিয়ে ঢাকা রাখতে হবে। ৪ দিন ঢাকা রাখার পর বেড খুলে আগের মত ৩-৪ দিন ঢাকা খোলা ও প্রয়োজনমত জলস্প্রে করলে কুঁড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। এবার শুধুমাত্র দুবেলা হাল্কা স্প্রে করলে ২-৩ দিন বাদে আরও কিছু ছত্রাক পাওয়া যাবে। একটা বেড থেকে দু'বেলা ছত্রাক তোলার পর খড়গুলি কোন কম্পোস্ট-এর গর্তে পচিয়ে তা ভাল জৈব সার হিসাবে ভবিষ্যতে জমিতে ব্যবহার করা যাবে বা খড়গুলি রোদে শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে।

৪) **ফসল তোলা ঃ—** বেড-এ স্পন্ বা বীজ ছড়ানোর ১০-১২ দিনের মধ্যে ছত্রাকের ছোট ছোট কুঁড়ি দেখতে পাওয়া যাবে এবং তা ১৪-১৫ দিনের মধ্যে তোলার উপযোগী হয়ে উঠবে। ছত্রাকের ছাতা সম্পূর্ণ খোলার আগেই তুলে নিতে হবে। একটা বেড-এ ১ প্যাকেট বীজ ছড়ালে তা থেকে ১.৫—১.৮ কিগ্রাঃ ছত্রাক পাওয়া যাবে। প্রথম ফলনে ১.২—১.৪ কিগ্রাঃ ও দ্বিতীয় ফলনে ০.৩—০.৪ কিগ্রাঃ ছত্রাক পাওয়া যাবে।

৫) **পোয়াল ছাতু চাষের প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন ঃ—**

ক) বেড-এর খড় যেন সব সময় ভিজা থাকে তা নজর রাখতে হবে।

খ) বেড-এর চারিদিকে ক্লোরপাইরিফস ২০% পাউডার ছড়িয়ে রাখতে হবে নইলে পিঁপড়ে বেড-এর ক্ষতি করতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে পাউডার যেন খড়ের উপর না পড়ে।

গ) কপ্রাইনাস নামক একজাতীয় আগাছা ছত্রাক যেন বেড-এর উপর না জমতে পারে। যদি জন্মায় তা তুলে ফেলতে হবে।

ঘ) ছত্রাক তোলার সময় কুঁড়ি ছত্রাকগুলি যেন আঘাত না পায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬) **পোয়াল ছাতু চাষের খরচ ও লাভ ঃ—**

দেশী বা আমন ধানের খড় ৫৬ আঁটি (১৮ — ২০" মাপের)	—	১৬.০০ টাকা
স্পন্ বা বীজ ১ প্যাঃ	—	৭.০০ টাকা
ডালের গুঁড়ো ১৫০ গ্রাম	—	৫.০০ টাকা
আনুষঙ্গিক খরচ	—	৪.০০ টাকা
	মোট খরচ	৩২.০০ টাকা

প্রতি বেড-এ কমপক্ষে ১.৫ কিগ্রাঃ ফলন পাওয়া গেলে প্রতি কিগ্রাঃ ৪০.০০ টাকা হিসাবে মোট ৬০.০০ টাকা পাওয়া যাবে। নীট লাভ হবে ৬০.০০ টাকা - ৩২.০০ টাকা = ২৮.০০ টাকা।

ঝিনুক মাশরুম চাষ ঃ

ঝিনুক মাশরুম দুইভাবে চাষ করা যায় ঃ

১) নাইলন জালের থলিতে

২) ঘনাকার ছাঁদ বা কাঠের বাক্সে

নাইলন জালের থলিতে ঝিনুক মাশরুম চাষের পদ্ধতি ঃ—

১) বাজার-হাট করতে যে নাইলন জালের থলি ব্যবহার করা হয়। সেই রকম ৪৫ সেমি লম্বা ৩০ সেমি চওড়া হাতল যুক্ত থলি নিতে হবে।

২) পরিস্কার, সোনালী রঙের শুকনো আমন ধানের খড় ২ ইঞ্চি লম্বা টুকরো করে ১৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন।

৩) অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে খড়গুলিকে ২ ঘণ্টা গরম জলে ভিজিয়ে শোধন করুন। পরে অতিরিক্ত জল বের করার পর ঠাণ্ডা করে শোধ করুন।

৪) নাইলন জালের থলির ভেতর ২৫ সেমি ভেজা খড়ের স্তর তৈরি করে আধ প্যাকেট মাশরুম স্পন বা বীজ খড়ের স্তরের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে।

৫) মাশরুম স্পন বা বীজের উপর আবার ২০ সেমি পুরু আরেকটি খড়ের স্তর তৈরি করে বাকি আধ প্যাকেট মাশরুম স্পন ছড়িয়ে দিতে হবে।

৬) এর উপর ৫ সেমি পুরু আর একটি খড়ের স্তর চাপিয়ে হাত দিয়ে ঠেসে দিতে হবে।

যাতে গোলাকার বলের মতো আকৃতি হয়।

৭) এবার ৫৫ সেমি লম্বা ও ৪০ সেমি চওড়া একটি পলিথিনের থলির ভিতর সাধারণ খড়, স্পন সহ নাইলন জালের থলিটি ঢুকিয়ে উপরের খোলামুখ বেঁধে, ছায়া ঘেরা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এছাড়া পলিথিনসহ নাইলন জালের ব্যাগগুলি বাঁশের র‍্যাকেই রাখা যায়। তবে পলিথিনের থলিতে কয়েকটা সরু ছিদ্র করে দিতে হবে যাতে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে।

৮) প্রয়োজন অনুসারে ২-১ দিন পর পলিথিন মুখ খুলে সাবধানে জল ঝিটিয়ে দিতে হবে। যেন খড়গুলির ভিজে ভাব বজায় থাকে।

৯) কয়েকদিনের মধ্যে মাশরুমের সাদা রঙের অনুসূত্র জালিকা তুলার আঁশের মত খড়ের মধ্যে ছড়িয়ে দলা পাকিয়ে যাবে।

১০) মাশরুম বীজ বপনের ১৪ দিন বাদেই মাশরুম কুঁড়ি বের হতে শুরু করবে।

১১) কুঁড়ি বের হওয়ার সময় সাবধানে পলিথিন থলিটি তুলে সরিয়ে দিন।

১২) কুঁড়ি ২-৩ দিন পরে পরিণত হলে সমস্ত মাশরুম তুলে নিয়মিত দিনে ২-৩ বার জল স্প্রে করলে ১০-১২ দিন পরে দ্বিতীয়বার আবার মাশরুম পাওয়া যাবে। একই ভাবে আরো ১০ দিন বাদে আবার একবার মাশরুম পেতে পারেন।

সংরক্ষণ ঃ

পোয়াল ছাতু স্বাভাবিক বা কাঁচা অবস্থায় ১ দিন ও ধিংরী ছাতু ২ দিন রাখা যায়। ফ্রিজে রাখলে আরও ২-৩ দিন ভাল থাকে। তবে বেশি দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে হলে এই ছাতু রৌদ্রে ভাল করে শুকিয়ে তা পলিথিন প্যাকেট-এ ভরে আগুনের সাহায্যে প্যাকেট-এর মুখ গলিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে।

রান্নার পদ্ধতি ঃ

বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই ছাতু রান্না করা যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রান্নার পদ্ধতি এখানে দেওয়া হল।

মাশরুম স্যুপ ঃ

কাঁচা ছাতু ৫০ গ্রাম, অর্দ্ধসিদ্ধ গাজরের টুকরো ২৫ গ্রাম, ছাড়ানো মটর (কাঁচা) ৫০ গ্রাম, ময়দা ১ চা চামচ, মাখন ২ চা চামচ, গুঁড়ো গোলমরিচ ১/২ চা চামচ, লবণ প্রয়োজনমত।

প্রথমে ছাতুগুলি পরিষ্কার জলে ভালভাবে ধুয়ে তারপর ছোট ছোট টুকরো করে একটা পাত্রে রাখতে হবে। গাজর অর্দ্ধসিদ্ধ করে টুকরো করতে হবে। এইবার একটি পাত্রে ২ কাপ জল, ছাতু, গাজর, মটর ও প্রয়োজনমত লবণ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। মাখন আগুনে গলিয়ে ঐ সিদ্ধ মিশ্রণে দিতে হবে। তারপর গোলমরিচ ছিটিয়ে গরম গরম পরিবেশন

করলে খুবই স্বাদযুক্ত হবে। যদি স্যুপ খুব পাতলা মনে হয় তবে ১ চা চামচ ময়দা দিয়ে হাল্কা ভাবে নেড়ে একটু গাঢ় করা যেতে পারে।

মাশরুম পকোড়া ঃ

কাঁচা ছাতু ৫০ গ্রাম, ব্যাসন ১০০ গ্রাম, খাওয়ার সোডা ১ চা চামচের ১/৪ ভাগ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচের ১/৪ ভাগ, কুচানো ধনে পাতা, প্রয়োজনমত লবণ ও ৩ টেবিল চামচ বাদাম বা সরিষার তেল।

ছাতুগুলি পরিষ্কার জলে ভাল করে ধুয়ে টুকরো করতে হবে। একটি পাত্রে ব্যাসন, সোডা, লঙ্কা গুঁড়ো, লবণ ও ধনে পাতা একত্রে মিশিয়ে জল দিয়ে ফেটাতে হবে। এবার একটি কড়াই-এ তেল গরম করে ছাতুগুলি ব্যাসন মিশ্রণে ডুবিয়ে তেল-এ ভাল করে ভাজতে হবে যতক্ষণ না পকোড়া বাদামী রঙ ধারণ করে। গরম গরম খেতে খুবই ভাল লাগবে।

মাশরুম কারি ঃ

কাঁচা ছাতু ২০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৫০ গ্রাম, রসুন ৫ গ্রাম, টমেটো ২০ গ্রাম, ভিনিগার ১ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, লবণ প্রয়োজনমত, সরিষার তেল ২ চামচ ও অল্প চিনি।

ছাতুগুলি পরিষ্কার জলে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে একটা পাত্রে রাখতে হবে। আলু ও পেঁয়াজ ছাড়িয়ে টুকরো করতে হবে। রসুন ছাড়িয়ে অল্প থেঁতো করে নিয়ে একটি কড়াই-এ তেল গরম করে প্রথমে রসুন ও পরে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজতে হবে। এইবার কড়াই-এ আলু, লবণ, অল্প চিনি, ছাতুর ও টমেটো টুকরো একসঙ্গে নিয়ে ভাল করে কষে তারপর অল্প জল প্রয়োজনে দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। পরিবেশনের আগে গোল মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে।

মাশরুম বীজের প্রাপ্তিস্থান ঃ

১) সহকারি রোগতত্ত্ববিদ, চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্র, হুগলী, ফোন ঃ ২৬৮০২৪৮৪।

২) সচিব, ওয়েস্ট বেঙ্গল এডিবল মাশরুম কাল্টিভেটরস অ্যাণ্ড স্পন মেকারস্ অ্যাসোসিয়েশন, ২৫/৩ এস.এন. চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা - ৩৪, ফোন ঃ ২৪৬৮৫৮১২।

৩) সচিব, দক্ষিণ ২৪ পরগণা মাশরুম সোসাইটি, বাকরাহাট, মাকালিয়া, দঃ ২৪ পরগণা, ফোন ঃ ২৪৯৫০০৩১।

৪) রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নিমপীঠ, দঃ ২৪ পরগণা। ফোন ঃ ৯১১৮২২৬০০২।

নাইলন জালে ঝিনুক মাশরুম চাষের ক্ষুদ্র প্রকল্প

স্থায়ী মূলধন ঃ—

১)	থলি ঝোলানোর জন্য (২ - ৩ টি স্তরে) বাঁশের কাঠামো ও থলি ঝোলানোর আংটা (বড়শির মতো)	৫০০.০০ টাকা
২)	স্প্রেয়ার, বালতি, দা, বড় হাঁড়ি, স্টোভ ইত্যাদি বাবদ	২০০০.০০ টাকা
৩)	উৎপাদন কেন্দ্রের ঘরভাড়া বাবদ ১ বছরে (মাটির দেওয়াল, টালির বা খড়ের ছাউনি ৫মি X ৩ X ২ মিটার)	৩৬০০.০০ টাকা
৪)	মোট খরচ (স্থায়ী)	৬১০০.০০ টাকা

কার্যকরী মূলধন ঃ—

১)	খড় (৮০০ গ্রাম X ১৫০টি থলি প্রতিদফায় X ৮ দফা = ৯৬০কেজি বা ১০০০কেজি)	১০০০.০০ টাকা
২)	স্পন ১৫০ প্যাকেট X ৮ দফা X ৬টাকা প্রতি প্যাকেট	৭২০০.০০ টাকা
৩)	পলিথিন চাদর ৬কেজি, ৩০ টাকা দরে (৮ দফায়)	১৮০.০০ টাকা
৪)	নাইলন নেটব্যাগ ৫০০টি ১.২৫ টাকা দরে	৬২৫.০০ টাকা
৫)	উদ্যোগী বাবদ, ১৫০০টাকা প্রতি মাসে (৮ মাস)	১২০০০.০০ টাকা
৬)	প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (সাবান, স্পিরিট, সুতলী)	৮০০.০০ টাকা
৭)	মূলধনের উপর সুদ ১৫%	৯১৫.০০ টাকা
৮)	যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ও কাঠামো মেরামত (১০%)	৫০০.০০ টাকা
		২২২২০.০০ টাকা

সর্বমোট খরচ

আয় ব্যায় ঃ

প্রত্যাশিত ফলন :— ৮০০গ্রাম প্রতি ব্যাগে, ১৫০ টাকা থেকে ৮ দফায় X ৯৬০ কেজি প্রতি ব্যাগ ৪০ টাকা	৩৮৪০০.০০ টাকা
মোট উৎপাদন খরচ	২২২২০.০০ টাকা
প্রকৃত আয়	১৬১৮০.০০ টাকা

বি.দ্র. — খড় ও শ্রম নিজের হলে আয় অনেক বাড়বে। উৎপাদন মাত্র ৮০০গ্রাম ধরা হয়েছে এটা ১২০০ গ্রাম পর্যন্ত সহজেই পাওয়াযায়। উপজাত খড় থেকে সময়মতো ভার্মি কম্পোষ্ট করে আয়বাড়ানো যায়।

Mushroom Cultivation as an interesting vegetable

Dr. Ananda Kumar Mandal, Anindita Chakravarti
& Dr. Dhira Gangopadhyay *
* Reader, Calcutta University

লাভজনক ফলচাষ

ডঃ স্বরূপ চৌধুরি,

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, বারুইপুর, কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মানবদেহের অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণগুলির প্রধান আধার হ'ল বিভিন্ন রকমের ফল। কাঁচা বা সরাসরি খাওয়া হয় বলে ফলের মধ্যে বর্তমান প্রায় সবটা ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিই মানব শরীরে কাজে লাগে। অধিকাংশ ফলই সহজ পাচ্য, খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু তাই, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফল জাতীয় খাদ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। চাহিদার তুলনায় ফলের যোগান কম। তাই, প্রায় সবরকম ফলের দামই আজ আকাশ ছোঁয়া। আমাদের এখানে ফল চাষের প্রতি তেমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কোনদিনই। তাই, লাভজনক উপায়ে ফল চাষ করা হয়েছে বা হচ্ছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যত্ন সহকারে চাষ করলে ফল চাষ বা ফল বাগিচা থেকে অন্য অনেক অর্থকরী ফসল অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ পাওয়া সম্ভব। লাভজনক উপায়ে ফলচাষ করতে গেলে যে বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে সেগুলি হল ঃ—

১) জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু জমি ফল চাষের পক্ষে উপযুক্ত

২) চাষের প্রথম ৩ - ৪ বছর গাছ থেকে প্রায় কিছুই ফলন পাওয়া যাবে না (পেঁপে ও কলা বাদে)। ঐ সময় ফল বাগান থেকে অর্ন্তবর্তী ফসল হিসাবে সব্জী, তৈলবীজ, ডালশস্য, গম জাতীয় তন্ডুল শস্য ইত্যাদি চাষ করা যাবে।

৩) নিয়মিত আগাছা নিয়ন্ত্রণ, গোড়ার মাটি আলগা করে দেওয়া, প্রয়োজনে জলসেচ দেওয়া, বছরে কমপক্ষে দুইবার জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা, রোগ-পোকা আক্রমনের প্রতি সজাগ নজর রাখা — ইত্যাদির উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সার প্রয়োগের পরপরই জল সেচ দিতে হবে।

৪) উন্নত জাতের গাছ লাগাতে হবে এবং বাগিচাতে গাছগুলি চিহ্নিত করতে হবে

১ একর পেয়ারা বাগান থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব

	খরচ		আয়	
১)	'মা' গাছ ২৫০টি X ১০.০০ =	২৫০০.০০	ফলন =	৯৬ কুইঃ
২)	বাৎসরিক সার প্রয়োগ =	১৫০০.০০	দর =	৪০০ কুইঃ
৩)	জলসেচ		দাম =	৩৮৪০০.০০
	৬ বার X ২ ঘন্টা X ১০০.০০ =	১২০০.০০		

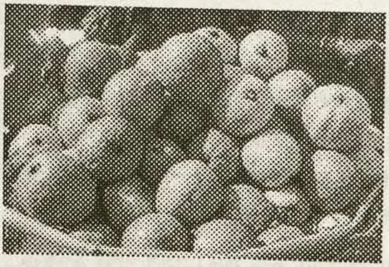
৪) শ্রমিক ২০ জন X ৬০.০০ = ১২০০.০০

৫) অন্যান্য = ১৮০০.০০

মোট খরচ = ৫২০০.০০

লাভ =৩৮,৪০০.০০ - ৫২০০.০০ =৩৩,২০০.০০

খরচের মধ্যে প্রাথমিক ৩ - ৪ বছরে সব্জী বা অন্য ফসলের খরচ এবং বাগিচাতে লাগানোর জন্য 'মা' গাছ ক্রয়, গর্ত খোঁড়া, ঘেরা দেওয়া ইত্যাদির হিসাব ধরা হয়নি। তেমনই, আয়ের মধ্যে সাথী ফসল থেকে প্রাপ্ত আয় এবং 'মা' গাছ থেকে 'কলম' করে চারাগাছ বিক্রয়ের থেকে প্রাপ্ত আয় ধরা হয়নি। প্রথম প্রথম ফলন কম হবে। ফলে, আয় তথা লাভ ও কম হবে। কিন্তু গাছ লাগানোর ৭-৮ বছর পর থেকেই উপরোক্ত ফলন, পাওয়া যাবে। গাছ লাগানোর ৭- ৮ বছর পর থেকেই বর্ষার প্রারম্ভে প্রতি গাছ থেকে গড়ে ২৫টি করে কলম কাটা যাবে। এই হিসাবে এক একর জমি থেকে ২৫০টি গাছ X ২৫ টি কলম X ৪.০০ = ২৫০০০ টাকা পাওয়া যাবে। কলম কাটার সরঞ্জাম, শ্রমিক ইত্যাদির খরচ বাদ দিয়েও কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা আয় হবে। অর্থাৎ, বাগিচা স্থাপনের প্রাথমিক খরচ এবং প্রথম ৪ - ৫ বছরের কম ফলনের ঘাটতি কলম বিক্রির প্রথম ১ - ২ বছরের আয় থেকেই উসুল হয়ে যাবে। পরবর্তী বছর থেকে নিয়মিত উচ্চ হারে লাভ ঘরে তোলা যাবে। আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, লিচু ইত্যাদির গাছ বড় হয়ে গেলে উচ্চ মূল্যের কাঠ পাওয়া যাবে।



ফলচাষ প্রকল্প - ১ ঃ কলা চাষ (৩৩ শতক জমির জন্য)

(ক) প্রকল্পের জন্য যা প্রয়োজন ঃ

(১) জাত নির্বাচন — জায়েন্ট গভর্নর, রোবাস্টার ইত্যাদি। পরামর্শমত মর্তমান, অমৃতসাগর ইত্যাদি উন্নত জাতও নির্বাচন করা যেতে পারে।

(২) চাযের জন্য জমি তৈরী এবং ২' X ২' X ২' গর্ত খনন। জায়েন্ট গভর্নর ও রোবাস্টার জাতের ক্ষেত্রে সারির দূরত্ব ৮ ফুট X ৮ ফুট ও গাছ/গর্তের সংখ্যা ২৩০টি হবে।

(৩) চারা লাগানের পূর্বে প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবরসার ২০০ গ্রাম সুপার ফস্ফেট (S.S.P.) ৫০ গ্রাম মিউরিয়েট্ অব পটাশ এবং ১৫ গ্রাম অলড্রিন ৫% দিয়ে মাটির সঙ্গে মেশাতে হবে।

(৪) চারা লাগানের ২ মাস পরে একবার এবং ৪ মাস পরে একবার চাপান সার হিসাবে মোট ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া (১৫০ X ২) এবং ১০০ গ্রাম মিউরিয়েট্ অব পটাশ দেওয়া প্রয়োজন।

(৫) চারা লাগানোর পর প্রতি গর্তে ২য় বৎসর হতে প্রতি বৎসর ২ বার (মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) করে নিম্নলিখিত প্রণালীতে চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে।

যে সার প্রয়োগ করতে হবে তার নাম	মে-জুন মাসে যে পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে	সেপ্টে:-অক্টো: মাসে যে পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে
(১) কম্পোস্ট/গোবর সার	১০ কেজি	৫ কেজি
(২) ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
(৩) সুপার ফস্ফেট *(S.S.P.)*	২০০ গ্রাম	—
(৪) মিউরেট অব পটাশ (*M.O.P.*)	১০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম

(খ) ৩৩ শতক জমিতে কলা চাষের আনুমানিক খরচ (জায়েন্ট গভর্নর, রোবাস্টার) ঃ

	প্রথম বৎসর (টাকা)	২য় বৎসর ও পরবর্তী বৎসর (টাকা)
(১) জমি তৈরী	২৫০	—
(২) ২৩০টি গর্ত তৈরীর ব্যয়	২৫০	—
(৩) ২৫৫টি কলার তেউড়ের দাম	৮৬৫	—
(৪) জৈব ও অজৈব সার	১৪২০	১৫০০
(৫) কীটনাশক (অলড্রিন ইত্যাদি)	৯০	২২৫
(৬) পরিচর্যা ব্যয়	৩০০	৭০০
(৭) সেচ ব্যয়	১৭৫	—
(৮) বেড়া দেওয়া	১৫০	১৭৫
(৯) ফল সংগ্রহ ও বাজারজাত করা	—	৯০০
(১০) অন্যান্য ব্যয়	—	৯০০
	মোট — ৩৫০০	মোট — ৪০০০

প্রকল্পের মোট ব্যয় — ৩৫০০ + ৪০০০ টাকা = ৭৫০০ টাকা

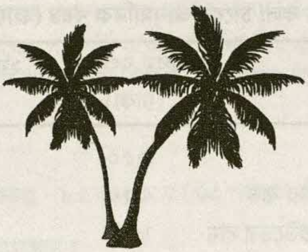
(গ) কলা চারা লাগানোর ১ বৎসর পর হতে বাজারে বিক্রয়ের জন্য ফসল তোলা শুরু করা যাবে ঃ

বৎসর	ফলনের মূল্য (টাকা)	বিক্রয়যোগ্য কলা চারার মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
২য়	৭০০০	২৫০	৭২৫০
৩য়	৯০০০	২৫০	৯২৫০
৪র্থ	১২০০০	৩৫০	১২৩৫০
৫ম	৭০০০	৫০০	৭৫০০

(ঘ) (১) ব্যাঙ্ক ঋণের মেয়াদ — ৭ বৎসর।

(২) ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের কিস্তি — বাৎসরিক।

(৩) প্রথম কিস্তি দিতে হবে ঋণ গ্রহণের ২য় বৎসর থেকে।



ফলচাষ প্রকল্প - ২ ঃ নারিকেল (১.০ একর)

১। **বিশদ প্রযুক্তি ঃ—**

(ক) রোপনের সময় ঃ জুন - জুলাই

(খ) জাত ঃ ইস্ট কোস্ট টল, ওয়েস্ট কোস্ট টল

(গ) রোপনের দূরত্ব ঃ ৮ মি. X ৮ মি.

(ঘ) গর্তের আকার ঃ ১মি. X ১মি. X ১মি.

(ঙ) একর প্রতি গাছের সংখ্যা ঃ ৬২টি

২। গাছ প্রতি জৈব ও রাসায়নিক সার ঃ—

সারের নাম	গর্ত প্রতি	গাছ লাগাবার এক বছর পর	পূর্ণ মাত্রায় ফলন্ত গাছ	মন্তব্য
গোবর / কম্পোস্ট	২০ কেজি	২০ কেজি	৫০ কেজি	রাসায়নিক সার দভাগে ভাগ করে এক ভাগ বর্ষার আগে ও বর্ষার শেষে দিতে হবে,
নাইট্রোজেন	—	১৬০ কেজি	৫০০ গ্রাম	
ফসফেট	৮০ গ্রাম	১২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	
পটাশ	—	৩০০ গ্রাম	১০০০ গ্রাম	

৩। সাথী ফসল ঃ আনারস, পেঁপে, কলা, সবজি, মশলা

২। নাবিকেল চাষেব খবচ (১.০ একব)

খবচেব খাত (টাকায)	১ম বছব	২য বছব	৩য বছব	৪র্থ বছব	৫ম বছব	৬ষ্ঠ বছব	৭ম বছব	৮ম বছব	৯ম বছব
ক) লাঙ্গল দেওযা সমেত জমি পস্তুত	৮০০	—	—	—	—	—	—	—	—
খ) গর্ত খোড়া, জৈব সাব মেশানো এবং চাবা লাগানো	৫৬০	—	—	—	—	—	—	—	—
গ) বেড়াব খবচ বাবদ	৯০০	—	—	—	—	—	—	—	—
ঘ) জৈব ও বাসাযনিক সাব	৫৫০	৯৫০	৯৫০	১৬০০	১৬০০	১৯৫০	১৯৫০	২৪০০	২৪০০
ঙ) ৫ শতাংশ বাড়তি সহ বোপনেব ডপকবণ বাবদ	১৬২৫	—	—	—	—	—	—	—	—
চ) সেচেব খবচ	৬০০	৬০০	৭৫০	৭৫০	৯০০	৯০০	১০০০	১০০০	১০০০
ছ) ফসল বক্ষাব বাসাযনিক পদার্থেব মল্য এবং স্প্রেযাব ভাড়া বাবদ	৪০০	৪০০	৪৭০	৪৭০	৫৪০	৫৪০	৬২০	৬২০	৬২০
জ) পবিচর্যা/আগাছা দমন সাব পযোগ/স্প্রে কবা/ফসল তোলা হত্যাদি বাবদ মোট মজবা খবচ	৯৮০	৯৮০	৯৮০	১১২০	১১২০	১৪০০	১৪০০	১৬৮০	১৬৮০
মোট	৬৪১৫	২৯৩০	৩১৫০	৩৯৪০	৪১৬০	৪৭৯০	৪৭৯০	৫৭০০	৫৭০০

৫। সাথী ফসলের চাষের খরচ ও আয় ঃ—

	সাথী ফসল	চাষের খরচ (টাকা)	আয় (টাকা)
(ক)	সবজি	৬০০০	১২০০০
(খ)	কলা	১০০০০	২৫০০০
(গ)	পেঁপে	১৫০০০	২৫০০০
(ঘ)	মশলা	৬০০০	১০০০০
(ঙ)	আনারস	২০০০০	৩০০০০

৬। আনুমানিক আয় (নারিকেল) ঃ—

বছর	গাছ প্রতি নারিকেল (সংখ্যা)	৬২ টি গাছের মোট নারিকেল ফলন (কেজি)	নারিকেল প্রতি ৩.০০ টাকা হিসাবে মোট মূল্য
৬ষ্ঠ বছর	৫	৩১০	৯৩০
৭ম বছর	১০	৬২০	১৮৬০
৮ম বছর	২৫	১৫৫০	৪৬৫০
৯ম বছর	৫০	৩১০০	৯৩০০
১০ম বছর	৯০	৫৫৮০	১৬৭৪০
১২ বছর			

আর্থিক অনুদান ঃ—

ফল বাগান করার জন্য প্রকৃত চাষের ৫০ শতাংশ খরচ আর্থিক অনুদান হিসাবে সরকার হইতে পাওয়া যাবে, যার উর্দ্ধসীমা হবে;

ক) ৪০০০ টাকা ০.৫০ একর ফল বাগানের জন্য ১ম বছর এবং

খ) ২০০০ টাকা ২য় ও ৩য় বছর

গ) ফল বাগানের আর্থিক অনুদান ৩.০ একর পর্য্যন্ত দেওয়া হবে।

Profitable fruit crops cultivation

Dr. Swarup Chowdhury,
A.D.O., Baruipur, Deptt. of Agriculture, Government of W. B.

স্বনির্ভরতার লক্ষে লাভজনক কৃষিভিত্তিক ব্যবসা — নার্সারী

শ্রী অমিয় কুমার জানা

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নার্সারী হল একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বীজ, চারা ও নানান বাহারী গাছ পাওয়া যায়। নার্সারী একটি ভালো কৃষিভিত্তিক লাভজনক ব্যবসা। অল্প জমিতে বাহারী গাছের ও ফুলগাছের নার্সারী করা যায় অথবা একটু বেশী জমি নিয়ে ফলের গাছের নার্সারীও করা যায়। সম্ভব হ'লে একই সাথে ফুল, বাহারী গাছ ও ফল গাছের চারা ও কলম তৈরীর নার্সারী তৈরী করা যেতে পারে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। শহর কেন্দ্রিক মানুষ বরাবরই পুষ্প প্রেমিক। আজকাল গ্রামের মানুষের মধ্যেও সৌখিন গাছ লাগানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে, সৌখিন বা ব্যহারী গাছ ও ফুলের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ার সাথে সাথে ফলের চাহিদাও বাড়ছে প্রচুর পরিমাণে। তুলনামূলক ভাবে ভালোমানের নার্সারীর অভাব রয়েছে। তাই, ভালোমানের নাসরিী প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সন্তোষজনক লাভের পাশাপাশি অনেক বেকার ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

বাহারী গাছের পাশাপাশি ফুলের গাছ ও ফলের গাছের নার্সারী করতে একটু বেশী জায়গার প্রয়োজন হয় ঠিকই তবে ফলের নার্সারী থেকে ফল বিক্রয়ের মাধ্যমে এবং ফুলের গাছ থেকে ফুল বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় হবে। তাছাড়া ফলের গাছের কলমের দামও তুলনামূলক ভাবে বেশী। নার্সারী তৈরী করার জন্য যে যে বিষয়গুলি প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন সেগুলি হ'ল —

১) আলো-বাতাস যুক্ত, জলনিকাশী ব্যবস্থা আছে এমন উঁচু জমি, ২) চারা গাছ ও কলম বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা, ৩) সেচ এর'জলের সুবিধা ৪) জৈব সারের গর্ত, ৫) চারা হাপর দেওয়ার ছাউনি, ৬) টব রাখার জায়গা, ৭) সার ও অন্যান্য সামগ্রী রাখার ঘর নার্সারীর ভিতর গাছ সাজিয়ে রাখার ও বিক্রির জায়গা, ৯) জলদেওয়ার ঝারি, কলম করার ছুরি সহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, দড়ি পলিথিন ইত্যাদি ও ১০) দক্ষ মালি ও শ্রমিক ও সম্ভব হলে একটি কুয়াশা ঘর ও একটি গ্রীন হাউস। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত ঘরে চারা গাছ বড় করার জন্য এ দুটি ঘর থাকলে খুবই সুবিধা হয়। নার্সারীর চারিদিকে গবাদি পশু খায় না — এমন গাছ দিয়ে বেড়া দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

এক একর জমিতে নার্সারী করার জন্য খরচও আয়ের সম্ভাব্য হিসাব দেওয়া হ'ল —

স্থায়ী খরচ

১) অফিস ও গোডাউন —১৫ X ১০ X৩৫০.০০ প্রতি বর্গফুটের জন্য = ৫২৫০০.০০

২) মাটির টব, জৈবসার ইত্যাদি রাখার জন্য ছাউনি —

১৫ X ১০ X ২০০.০০ প্রতি বর্গফুটের জন্য = ৩০,০০০.০০

৩) জলদেওয়ার ব্যবস্থা (কুয়া/টিউবওয়েল/টুলু পাম্প) = ১০,০০০.০০

৪) জৈব সারের গর্ত — ১০ X ৫ X ৪ = ৪০০০.০০

৫) ছায়াচ্ছন্ন ঘর বা হাপরের ঘর বা থ্যাচ্ হাউস — ১৫ X ১৫ = ২৫০০.০০

৬) মা গাছ (যে গাছ থেকে কলম কাটা হবে) ২০০ গাছ X ১০.০০ = ২০০০.০০

৭) মাটির টব — ২০০০ টব X ১.০০ = ২০০০.০০

৮) যন্ত্রপাতি = ২০০০.০০

৯) অন্যান্য খরচ — = ১০০০.০০

মোট খরচ = ১,০৬,০০০.০০

প্রাথমিক ভাবে অফিস ও গোডাউন পাকাপোক্তভাবে না করলে ৫২৫০০.০০ খরচ বাদ যাবে। অর্থাৎ মোট খরচ হবে = ৫৩,৫০০.০০। কুয়াশা ঘরের সুবিধা যুক্ত একটি গ্রীণ হাউস তৈরীর জন্য খরচ হবে ১০ X ২০ X ১৫০.০০ = ৩০,০০০.০০ + মিষ্ট সিস্টেম এর মূল্য ১০,০০০.০০ অর্থাৎ মোট ৪০,০০০.০০। নার্সারীর আয়তন বড় হলে এবং লাভজনক ভাবে চালু হয়ে গেলে অফিস গোডাউন ও কুয়াশা ঘর তৈরী করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্য্যায়ে খরচ লাগবে ৫৩,৫০০.০০ টাকা। বার্ষিক ক্ষয় জনিত আনুপাতিক খরচ ২০% হারে ৫৩৫০.০০।

বার্ষিক খরচ ঃ—

১)	স্থায়ী খরচের বার্ষিক ক্ষয়জনিত খরচ	৫,৩৫০.০০
২)	রাসায়নিক ও জৈবসার ইত্যাদির মূল্য	৪,০০০.০০
৩)	চারার বীজ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য	২,০০০.০০
৪)	অন্যান্য খরচ (শ্রমিক)	১,০০০.০০
	মোট	১২,৩৫০.০০

চারাগাছ বিক্রয় থেকে বার্ষিক আয় ঃ—

১) চারা বিক্রয় থেকে আয় = ৫,০০০.০০

২) কলম থেকে আয় = ১০,০০০ X ৪.০০ = ৪০,০০০.০০ মোট ৪৫,০০০.০০

প্রথম ২-৩ বছরে আয়ের পরিমান কম হবে কারণ, গাছ বড় হতে ২-৩ বছর সময় লাগবে। তেমনি ৫-৭ বছর পর থেকেই মা গাছ থেকে ফুল ও ফল পাওয়া যাবে। ফলে, আয়ের পরিমাণ ও বেড়ে যাবে।

প্রকৃত লাভ ঃ—

৪৫,০০০.০০ — ১২,৩৫০.০০ = ৩২,৬৫০.০০ অর্থাৎ এক একর নার্সারী থেকে বছরে গড়ে ন্যূনতম ৩২,৬৫০.০০ টাকা লাভ হতে পারে।

নার্সারী প্রকল্প - ১

ফল ও ফুল গাছের চারা / কলম তৈরীর আদর্শ নমুনা প্রকল্প

(ক) স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধন ঃ

১।	বাগানের যন্ত্রপাতি ও কলমচারা তৈরী করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি	১,২০০
২।	(১) ভালজাতের আমের "মুকুলশাখা" ১০০০টি @ ২.২৫ টা.	২,৮০০
	(২) চিকু বা সবেদার কলমশাখা ১০০০টি @ ১.৭৫ টাকা	২,১০০
	(৩) লেবু, পেয়ারার গুটি ৫০০টি @ ৭৫পঃ প্রতিটি	৫০০
	(৪) লিচুর গুটি ৫০০টি @ ১.২৫ টাকা প্রতিটি	৮০০
	(৫) ভালজাতের নারিকেল বীজ ৫০০টি @ ৫ টাকা প্রতিটি	২,৫০০
	(৬) বিভিন্ন জাতের পাম, ক্রোটন, ক্যাক্টাস্ গাছ ইত্যাদি ও মরসুমী ফুলের কলম/বীজ ইত্যাদি	২,২০০
	(৭) গোবর সার, খইল, পাতা সার ইত্যাদির জন্য	১,২০০
	(৮) কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ঔষধ ইত্যাদি	৫০০
		১৩,৮০০
৩।	মজুর ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	১,২০০
৪।	সর্বমোট মূলধন	১৫,০০০

(খ) প্রকল্প হতে বাৎসরিক আনুমানিক আয়ব্যয় ঃ

(অতিবৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে কিছু কলম/চারা নষ্ট হতে পারে)

আয়	টাকা
(১) আমের কলম বিক্রি ১০০০টি @ ৫ টা./ কলম	৫,০০০
(২) চিকু বা সফেদার কলম ৮০০টি @ ৩.৫০ টা/কলম	৩,০০০
(৩) লেবু ও পেয়ারার চারা/২৫০ কলম গুটি ৪০০টি @ ২.৫০ টা.	১,২০০
(৪) লিচুর গুটি ৩৫০টি @ ২.৫০ টা.গুটি	৯০০
(৫) নারিকেল চারা ৪৫০ টি @ ৮ টাকা	৪,০০০
(৬) বাতিল নারিকেল বীজ হইতে নারিকেল তৈল বাবদ আয়	৪০০
(৭) পাম, ক্রোটন, ক্যাকটাস্ ইত্যাদি ও মরসুমী ফুলগাছ বিক্রি বাবদ আয়	৪,৫০০
	মোট — ১৯,০০০

ব্যায়	টাকা
(১) চারা পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচ	১,৬০০
(২) বাৎসরিক আনুমানিক ব্যয়	২,৮০০
(৩) সুদসহ ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ	২,১০০
	মোট — ৬,৫০০

লাভ — ১৯০০০.০০ — ৬৫০০.০০ = ১২,৫০০.০০ টাকা

সুতরাং প্রকল্পটি লাভজনক হবে।

(গ) (১) ঋণশোধের মেয়াদ — ৭ বৎসর।

(২) প্রথমে কিস্তি দিতে হবে — ঋণ গ্রহণের ১ বৎসর পর।

(৩) কিস্তির হার — বাৎসরিক।

Nursery as a profitable Agri-business for achieving self employment

Dr. Amiya Kumar Jana

Dept. of Agriculture, Govt. of West Bengal

অধিক লাভজনক চাষের জন্য সুসংহত সার প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা

শ্রী রণজিৎ দাস, কৃষিবিদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লাভজনক ফসল দু'ভাবে ফলান যেতে পারে। প্রথমতঃ একক জমিতে উৎপাদিকাশক্তি বাড়িয়ে। দ্বিতীয়তঃ কম খরচ করে। উৎপাদন বজায় রাখতে হলে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমানে মানুষের কোন রকম চিকিৎসা পরিসেবা নিতে হলে অনেকসময়ই রক্ত পরীক্ষা করতে বলা হয়। ঠিক সেই রকম ভাবেই মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে সারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে জৈব, অজৈব ও অনুখাদ্য সারের পরিমিত ব্যবহারে ফসল লাভজনকভাবে উৎপাদন করতে মাটি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগ করতে হবে সুসংহত উদ্ভিদখাদ্য ব্যবস্থাপনার সমস্ত নীতি মেনেই। স্বাভাবিক কারণেই চাষীভাইদের মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয় — যেমন ঃ

মাটির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করবো কিভাবে ? স্থানীয় কৃষিপ্রযুক্তি সহায়ক কিংবা ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে মাটির নমুনা দিলে উনিই সুপারিশ করে দেবেন। এর জন্য যে জমি থেকে মাটি সংগ্রহ করা হবে সেখানে ফসল অনুযায়ী ১৫ সেমি (ধান বা গম) বা ২৩ সেমি (পাট, আম ও আলু) গভীরতা থেকে অনেকগুলি স্থানের (১০-১৫ জায়গায়) মাটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভি-আকৃতি করে নির্দ্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত পাউরুটির স্লাইসের মতো করে তুলতে হবে। এই মাটিগুলি মিশিয়ে একটা পুরো জমির প্রতিনিধিত্বকারী মাটির নমুনা তৈরি করতে হবে। মাটি পরীক্ষাগারে পাঠানোর আগের নমুনাতে চাষীর নাম ঠিকানা, মৌজা, দাগ নম্বর ইত্যাদি আনুসঙ্গিক তথ্য দিতে হবে। তাহলে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের প্রয়োজনীয় বার্তা বিশেষ করে আপনার পছন্দ মতো ফসলের জন্যই কৃষি দপ্তর থেকে জানতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ যে প্রশ্নটির সম্মুখীন কৃষকবন্ধুরা হোন তা হলো — **মাটি পরীক্ষার সুপারিশ জেনে সারের হিসাব করবো কিভাবে?** মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে কোন ফসলের জন্য সারের মাত্রা সুপারিশ করা হয়। এই মাত্রা জেনে পছন্দ মতো সারের পরিমান হিসাব করা হয়। ধরুণ এক বিঘা বোরো ধান চাষের জন্য মূলসার হিসাবে ৪ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ সারের দরকার। এখন দেখা যাক ঐ পরিমান উদ্ভিদ খাদ্য যোগাতে কি পরিমান সার লাগে।

৪ কেজি নাইট্রোজেন = ৯ কেজি ইউরিয়া (২.২৫ দিয়ে গুণ করে)

৮ কেজি ফসফেট = ৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট (৬.২৫ দিয়ে গুণ করে)

৮ কেজি পটাশ = ১৩ কেজি ২৮০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ (১.৬৬ দিয়ে গুণ করে)

ফসলের সঠিক বৃদ্ধি ও উপযুক্ত ফলনের জন্য গাছের ১৬টি খাদ্যোপাদান কমবেশী প্রয়োজন, যেমন — কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রণ, কপার, জিংক, বোরণ, মলিবডেনাম ও ক্লোরিন। ষোলটি খাদ্যোপাদানের মধ্যে প্রথম নয়টিকে প্রধান খাদ্য, বাকী সাতটিকে অনুখাদ্য বলা হয়। প্রধান খাদ্যের মধ্যে প্রথম তিনটি উপাদানের জন্য গাছ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। গাছ বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন এবং শিকড়ের মাধ্যমে মাটির জলীয় অংশ থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংগ্রহ করে। সেই সাথে অন্যান্য খাদ্যগুলিও শিকড়ের মাধ্যমেই সংগ্রহ করে।

প্রধান খাদ্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সালফারের অভাব সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু যে সমস্ত ফসলে বেশী সালফারের প্রয়োজন যেমন সরষে, চীনাবাদাম ইত্যাদি তৈলজাতীয় শস্যে সালফার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি পায়। যে প্রধান খাদ্য যোগানের উপর ফলন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেগুলি হচ্ছে নাইট্রোজেন (এন্), ফসফরাস (পি) ও পটাশিয়াম (কে)। উত্তরোত্তর ফসলে নাইট্রোজেন, ফসফরাস পটাশের অভাব বেশী করে প্রকট হচ্ছে। অনেক জায়গায় পটাশের অভাব নেই বলে মনে হলেও ফলন বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পটাসের প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে উপযুক্ত পরিমাণে এন.পি.কে প্রয়োগ করে চাষীভাইরা লাভবান হচ্ছে।

যতটুকু সমীক্ষা চালানো হয়েছে তার মধ্যে কপার, আয়রণ, এবং ম্যাঙ্গানীজ-এর অভাব পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দেখা যায়নি। জিংক- এর অভাব সাধারণতঃ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় সমীক্ষায় পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাতে বিভিন্ন ফসলে জিংক-এর অভাব দেখা যাচ্ছে। বোরণের অভাব উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার কিছু কিছু এলাকায় বোরণের অভাব রয়েছে। মলিবডেনাম অভাবজনিত লক্ষণ পশ্চিমবঙ্গে অনেক জায়গায় দেখা গেছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, সালফার, জিংক, বোরণ ও মলিবডেনাম এই সাতটি উদ্ভিদ খাদ্যের যোগান দেওয়ার কথা চাষী ভাইদের সবসময় মনে রাখতে হবে। রাসায়নিক সারের মাধ্যমে এইগুলি যোগান দেওয়া সম্ভব হলেও তা ব্যায় সাপেক্ষ ও সময়মত পাওয়া যায় না। কিন্তু জৈবসার চাষী ভাইদের আওতার মধ্যে পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা। জৈব সার প্রয়োগে মাটির গঠন, জলধারণ ক্ষমতা এবং সবরকম খাদ্যের গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ে। জৈব সার থেকে উদ্ভিদ খাদ্য যোগান দেওয়ার একটি বিশেষ সুবিধা হল আনুপাতিক হারে খাদ্যোপাদানের যোগান। উদ্ভিদ খাদ্যের যোগান আনুপাতিক হারে না হলে গাছের সুসংহত বৃদ্ধি ব্যাহত হয় যেমন ফসফরাস ও পটাশের তুলনায়

প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে গাছের সবুজ অংশ অযথা বৃদ্ধি পায়, রোগ পোকার আক্রমণ বাড়ে এবং ফুল ও ফল উৎপাদন ব্যাহত হয়। মাত্রাতিরিক্ত অনুখাদ্য ব্যবহারে বিষক্রিয়াও দেখা দিতে পারে। তখন ফলন না বেড়ে কমবে। কিন্তু জৈব সার ব্যবহারে সেই সম্ভাবনা থাকে না কারণ জৈব সারের উৎস গাছপালা এবং যে অনুপাতে গাছপালা খাদ্য গ্রহণ করে জৈব সারেও মোটামুটি সেই অনুপাত বজায় থাকে।

জমিতে ধৈঞ্চা উৎপাদন করে মাটিতে জৈব সারের যোগান দেওয়া সম্ভব। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একর প্রতি ১৫ কেজি ধৈঞ্চা বুনে ১ মাস ১৫ দিনের মতো বয়স হলে মই দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিলে জৈব সারের প্রয়োজন মিটবে। ধৈঞ্চা বোনার সময় যদি একরে ৮ কেজি ফসফেট দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তী ফসলে ফসফেট সারের প্রয়োজন নাও হতে পারে। শুটি জাতীয় ফসলর মাধ্যমে প্রতি একরে ৫-১০ টন জৈব পদার্থ, ২৫-৩৫ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যোগান দেওয়া সম্ভব। খামারের গোবর এবং আবর্জনা কম্পোষ্ট পিটে পচিয়ে ২-৩ টন হিসাবে ব্যবহার করলে ফলন বাড়বে। জৈব সার সম্পর্কে মূল কথা, কম করে প্রয়োগ করলেও কিছু না কিছু ফলন বাড়বে আবার বেশী প্রয়োগে কোন অপকার হবে না বরঞ্চ ফলন ভালই হবে।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে শুধু জৈব সার থেকে গাছের সবটুকু প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। সেইজন্য জৈব সারের সাথে পরিপূরক হিসাবে রাসায়নিক সারের যোগান দেওয়া ফলন বাড়ানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

জৈব এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের সাথে সাথে শস্য পর্যায় ঠিকমত বজায় রাখলে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন কিছুটা কমানো যেতে পারে। শুঁটি জাতীয় ফসল বাতাস থেকে নাইট্রোজেন শেকড়ে বসবাসকারী রাইজোবিয়াম-এর সাহায্যে নিজ দেহে রূপান্তরিত করে। কাজেই এমন ভাবে শস্য পর্যায় ঠিক করতে হবে যাতে প্রতি বছর কিংবা প্রতি দু'বছর অন্তর একটি করে শুঁটি জাতীয় ফসলের চাষ করা যায়। এর ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগান বাড়াবে এবং পরবর্তী ফসলে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন কমবে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমির অম্লতা অনুসারে চুন প্রয়োগ করলেও গাছের বিভিন্ন খাদ্যের যোগান বাড়বে।

এছাড়া আর একটি বিষয়ে নজর রাখা দরকার - ফসলের যতটুকু উদ্ভিদ খাদ্য ব্যবহার করা হয় তার সবটাই ফসল নিতে পারে না, কিছু অংশ মাটিতেই থেকে যায় বিশেষ করে ফসফরাস ও পটাশ, যা কিনা পরবর্তী ফসল ব্যবহার করে। সেই কথা মনে রেখে একটি মাত্র ফসলের জন্য সারের প্রয়োগ মাত্রা ঠিক না করে সারা বছরের জন্য যে শস্য পর্যায় ঠিক করা হবে তার জন্য সম্যক সার ব্যবহারের সূচী প্রণয়ন করলে সারের সাশ্রয় হবে এবং অপচয় এড়ান যাবে।

● উদ্ভিদখাদ্য রাসায়নিক সার হিসাবে দিতে গেলে জানা দরকার কোন উদ্ভিদ খাদ্য কোন সার থেকে কি পরিমানে (প্রতিশত) পাওয়া যায়।

	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
নাইট্রোজেন ঘটিত সার ঃ			
ইউরিয়া	৪৬	—	—
অ্যামোনিয়াম সালফেট	২০-২১	—	—
ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	২৫	—	—
ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট	১৮	৪৬	—
এন.পি.কে ১০ ঃ ২৬ ঃ ২৬	১০	২৬	২৬
ফসফেট ঘটিত সার ঃ			
সিঙ্গল সুপার ফসফেট	—	১৬	—
ট্রিপিল সুপার ফসফেট	—	৪২.৫	—
পটাশ ঘটিত সার ঃ			
মিউরেট অব পটাশ	—	—	৬০

সালফার ঘটিত সার ঃ

অ্যামোনিয়াম সালফেট	সালফার ৪০ শতাংশ
জিপসাম	সালফার ১৮ শতাংশ
জিংক ঘটিত সার ঃ	
জিংক চিলেটেড	জিংক ১২ শতাংশ
বোরন ঘটিত সার ঃ	
বোরাক্স	বোরণ ১০.৫ শতাংশ
মলিবডেনাম ঘটিত সার ঃ	
অ্যামোনিয়াম মলিবডেট	মলিবডেনাম ৫২ শতাংশ

● **কোন জৈব সারের মধ্যে উদ্ভিদ খাদ্য কত প্রতিশত পাওয়া যায়**

	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
গোবর	০.৩-০.৪	০.১-০.২	০.১-০.৩
কম্পোষ্ট	০.৫-১	০.৪-০.৮	০.৮-১.২
কাঠের ছাই	০.৭৩	০.৪৫	০.৫৩
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
ফার্ম ইয়ার্ড মেনিওর	০.৪-১.৫	০.৩-০.৯	০.৩-১.৯
ধৈঞ্চা	০.৬২	—	—
মুগ	০.৭২	০.১৮	০.৫৩

মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের (এন.পি.কে) যোগানের মাত্রানুযায়ী হারে ২:১:১ অনুপাতে সার ব্যবহার দরকার। বর্তমানে এই মাত্রা ১৫:৬:২। অর্থাৎ কৃষকবন্ধুরা সুষম হারে সার প্রয়োগ করতে এখনো অভ্যস্থ নন। সব সময় পটাশ সার ব্যবহারের প্রতি কৃষকবন্ধুদের অযথা অনীহা প্রকাশ পায়। জৈব, অজৈব, অনুখাদ্য ও জীবানুসারের সমন্বিত প্রয়োগকে বলে সুসংহত উপায়ে উদ্ভিদখাদ্য ব্যবস্থাপনা। কোনো ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের চাহিদার এক তৃতীয়াংশ জৈবসারের মাধ্যমে এবং দুই তৃতীয়াংশ রাসায়নিক সারের মাধ্যমে মেটানো উচিত। সুষম হারে সার প্রয়োগ করলে মাটি ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সহ উর্বরতা শক্তি বজায় থাকে এবং সোনার ফসল চাষীভাইদের মুখে হাসি ফোটায়।

Integrated Nutrient management in agriculture
for higher economic return

Sri Ranjit Das
Agronomist, Dept. of Agriculture, Govt. of West Bengal

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সুরক্ষায় কেঁচোর ভূমিকা

ডঃ অমলেশ মিশ্র
পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ

ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে প্রথাগত চাষবাসে কোনো রকমের রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা ছাড়া খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু এটা এখন প্রমাণিত যে ক্রমাগত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। তাই এখন জোর কদমে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা চলছে কিভাবে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিষয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার বিধি অবলম্বন করা যায়।

এছাড়া, আমাদের শহরাঞ্চলে পাহাড়প্রমাণ জঙ্গল সমস্যা নিয়ে আজ সবাই চিন্তিত। শিল্প ও বাসস্থান, দুজায়গাতেই তৈরী হয় আবর্জনা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই আবর্জনা দূষণকারক, কখনো বা বিষাক্ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ফুরিয়ে যাচ্ছে আবর্জনা ফেলার জায়গা। কিন্তু কোথায় সরানো যায় এই আবর্জনাকে? অন্য কোন উপায় আছে কি? পাল্টে ফেলা যায় কি এই আবর্জনার রূপ ও গুণ? পরিবর্তন করা যায় কি একে কোনো উপযোগী জিনিসে - সম্পদে? আসলে বর্জ্যপদার্থের পরিবর্তন হয় স্বাভাবিকভাবেই — রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তনের ফলে। মাটিতে বসবাসকারী জীবাণুরা আবর্জনার জটিল জৈব যৌগগুলিকে ভেঙে সরল যৌগমূলকে পরিণত করে থাকে। একে সাধারণ ভাষায় **পচন** বলে। এই পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরী হয় **কম্পোস্ট** বা **জৈবসার**। এর ফলে মাটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পোষক উপাদান যথা **নাইট্রোজেন, ফসফরাস** ও **পটাসিয়াম**-এর বিভিন্ন সরল যৌগ যোগ হয়, যা গাছেদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই জৈবসার মাটিকে পরিপুষ্ট করে। প্রকৃতিতে এই জৈবসার প্রস্তুতিতে কেঁচোর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহু আগেই প্রমাণিত। ১৮৮১ সালে একটি রচনায় চার্লস ডারউইন কেঁচোকে 'কৃষকের বন্ধু' বলে অভিহিত করে ছিলেন।

কেঁচো এক উপকারী বন্ধু জীব

কেঁচোর দেহ সরু নলের মতো; দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ দশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার; আংটির

মতো বহু খণ্ড দ্বারা দেহ গঠিত; আলো পছন্দ করেনা; মাটির উপরে রাখা জৈব আবর্জনার নীচে অথবা মাটির মধ্যে সরু অগভীর নালির মতো গর্তের মধ্যে থাকে। এরা ক্রমাগত মাটিতে মিশ্রিত পচনশীল জৈবপদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণের তাগিদে, মাটি-ভক্ষণ করে। এই মাটি মিশ্রিত জৈব পদার্থ কেঁচোর অন্ত্রে উপস্থিত অনুজীব ও উৎসেচকের মাধ্যমে সরলীকরণের পর ছোট ছোট নানা প্রকার দানা বা কুণ্ডলীর আকারে মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষ্ঠা কুণ্ডলীগুলি গাছেদের উৎকৃষ্ট সার। তাই কেঁচোকে 'কৃষকের পরমবন্ধু' হিসাবে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে কেঁচো যে কৃষিকার্যে সহায়ক তা সর্বজন স্বীকৃত। এরা মাটিতে নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগের বা সারের পরিমান বাড়ায়। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মাটিতে বেশী পরিমাণে বায়ু চলাচলের ফলে **'এরোবিক'** জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে। ফলে মাটি উর্বর হয়। এছাড়া কেঁচো বহুবিধ পাখী, মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যরূপে বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এহেন উপকারী **'বন্ধুজীব'** কেঁচোকে আমরা কি কোনো কাজে লাগাতে পারি?

কেঁচো চাষের মাধ্যমে জৈবসার প্রস্তুতিকরণ (ভার্মি-কম্পোস্টিং পদ্ধতি)

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় কেঁচোকে কৃত্রিমভাবে সংখ্যায় বাড়িয়ে জৈব আবর্জনাকে রূপান্তর করে কম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতিকে 'ভার্মি-কম্পোস্টিং' বলে। এর ফলে যে জৈব সার উৎপন্ন হয় তার নাম **'ভার্মিকম্পোস্ট'** বা **কেঁচোসার**।

সব প্রজাতির কেঁচো ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরীর উপযোগী নয়। সাধারণতঃ উচ্চ প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন রাক্ষুসে কেঁচো যাদের বাড় খুব বেশী এবং প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে সক্ষম তাদের ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে তিনটি প্রজাতির কেঁচো - **আইসেনিয়া ফেটিডা, ইউড্রিলাস ইউজেনি এবং পেরিওনিকস্ একস্কেভেটাস** এই সার তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে কেবলমাত্র শেষের প্রজাতির কেঁচো আমাদের দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এই কাজে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে —

১। উপযুক্ত প্রজাতির কেঁচো সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া (কেঁচো চাষ)।

২। উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে কেঁচো-সার উৎপাদন (ভার্মি-কম্পোস্টিং)।

৩। আলাদা করে নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচোর সংরক্ষণ (ভার্মি-কন্ জারভেশন)।

এর মধ্যে প্রথম দুটি কাজ একসঙ্গে করা যেতে পারে।

ভার্মি-কম্পোস্টিং বা কেঁচো সার উৎপাদন ঃ—

এই কাজটি ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

প্রয়োজন ঃ উপযুক্ত স্থান ও পাত্র, যথেষ্ট পরিমান সঠিক প্রজাতির কেঁচো, জৈব (সহজে পচনশীল) আবর্জনা, পচা গোবর বা কম্পোস্ট এবং নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থা।

স্থান ঃ বাগানের ছায়াযুক্ত উঁচু স্থানে (যেখানে জল জমে না) উপযুক্ত ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

পাত্র ঃ কাঠের বাক্স বা মাটির টব বা মাটিতে সামান্য গর্ত করে শুরু করা যেতে পারে। মাপ হবে দৈর্ঘ্য ১ মি., প্রস্থ ১ মি., এবং উচ্চতা ০.৪৫ মি.। যে কোনো আয়তনের পাত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পদ্ধতি ঃ কয়েকটি ধাপে কাজটি করতে হবে।

১। বাছাই করা জৈব আবর্জনাকে ছোট ছোট টুকরো করে দু-একদিন ফেলে রাখতে হবে শুকানোর জন্য (যদি বেশী রস/জলীয় অংশ থাকে)।

২। শুকনো জৈব আবর্জনাগুলোর সাথে অল্প পরিমাণ গোবর মিশিয়ে (৫:১) প্রাথমিক পচনের জন্য একটি পাত্রে রেখে দিতে হবে (১৫-২০ দিন)।

৩। নির্দিষ্ট পাত্রের নীচে খড় বা নারকেল ছোবড়া দিয়ে ৪-৫ ইঞ্চি পুরু করে তার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরানো গোবরের (এক বা ২ মাস) স্তর বানিয়ে পরিমাণ মত (১ কেজিতে ২৫-৩০টি) কেঁচো ছাড়তে হবে।

৪। এরপর আধপচা জৈব আবর্জনাগুলো গোবরের স্তরের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে (৫-৬ ইঞ্চি পুরু)। ১৫-২০ দিন পর আবার অনুরূপ ভাবে আধপচা আবর্জনা ছড়াতে হবে।

৫। প্রতিবার আবর্জনা দেওয়ার পর জল দিয়ে ভিজিয়ে চট ঢেকে দিতে হবে।

৬। মাঝে মাঝে পরিমাণ মত জল ছিটিয়ে দিতে হবে।

৭। তাপমাত্রা (২৫°-৩০° সে.), জলের পরিমাণ (৪০%-৫০%) এবং অম্লত্বের মাত্রা নিরপেক্ষ হওয়া দরকার।

৮। ইঁদুর, ছুঁচো এবং পিঁপড়ের আক্রমণ যাতে না ঘটে খুবই সতর্কতার সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রায় ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে দানা দানা হাল্কা কেঁচো সার তৈরী হয়ে যাবে। ২/৩ দিন জল দেওয়া বন্ধ রেখে, ছাঁকনির সাহায্যে কেঁচোগুলো আলাদা করে নতুন করে আবার শুরু করা যেতে পারে।

উপসংহার ঃ—

এককভাবে বাড়িতে বা বাগানে যে কেউই কেঁচো চাযের মাধ্যমে কেঁচো সার তৈরী করতে পারে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে অল্প জায়গায়, অল্প খরচে (বা বিনা খরচে), অল্প শ্রম ও সময় নিয়োগ করে উন্নতমানের জৈবসার, উৎপাদন সম্ভব। জৈব সারের সাথে সাথে জৈব আবর্জনা-জনিত সমস্যাও দূর করা যেতে পারে। সর্বোপরি এটি একটি গঠনমূলক, আনন্দদায়ক, পরিবেশ-সহায়ক ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজ।

Role of Earthworm is improving Soil fertility
& Enviromental Projection
Dr. Amalesh Misra
Paribes Unnayan Parishad

সুসংহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ

শ্রী রতন মুখার্জী

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে রোগ, পোকা, আগাছা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক নাশকের ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজন ভিত্তিক এবং সর্বশেষ কলা-কৌশল হিসাবে। কিন্তু রোগ-পোকার পরিমান বা সংখ্যা বা ক্ষতির মাত্রা আর্থিক সীমা রেখায় *(Economic Threshold Level)* পৌঁছানোর আগে এই কলা কৌশল গ্রহণ করতে হবে কারণ এদের সংখ্যা বা পরিমান আর্থিক ক্ষতির সীমায় *(Economic Injury Level)* পৌঁছে গেলে রাসায়নিক নাশক ব্যবহার করার কোন মানেই হয় না। বর্তমানে আবার রাসায়নিক নাশকের মধ্যে অনেক নিরাপদ নাশকের *(Safe Pesticide)* ব্যবহার বা জৈব *(Bio-Control Agent)*, উদ্ভিদজাত কীটনাশক *(Botanical Pesticide)* ও জীবাণুজাত কীটনাশক *(Microbial Pesticide)* -এর ব্যবহারের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি বাস্তুতন্ত্রে *(Ecosystem)* এই সব উদ্ভুত জটিল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞগণ দেখলেন যে শুধু রাসায়নিক নাশক *(Chemical Pesticide)* ব্যবহার করেই ফসলকে রোগ-পোকার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ ফল, বিগত তিন দশকের ভুল-ভ্রান্তির পর্যালোচনা, সমাজ, কৃষি ও কৃষকের চাহিদা এবং রাসায়নিক নাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের কুফল মাথায় রেখে ধীরে ধীরে তৈরী করা হল সুসংহত রোগ, পোকা ও আগাছা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা যাকে বলা হয় *IPM (Integrated Pest Management)*। এই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সামগ্রিকভাবে কৃষিতে ব্যবহার্য্য সকল প্রযুক্তি-র এক সমন্বিত রূপ। যেমন - জমির উর্ব্বরতা নিরূপণ এবং সেইমত সারের ব্যবহার, ফসল কাটার পর জমি চাষ দিয়ে ফেলে রাখা, সঠিক জাত ও বীজ নির্বাচন এবং বীজ বপন বা চারা রোয়া করার আগে সঠিকভাবে বীজ বা চারা শোধন করে নেওয়া, মাটি পরীক্ষার পর মূল জমিতে নির্দেশমত সুষম সারের ব্যবহার, পরিমিত দূরত্বে রোয়া করা এবং নিয়মিত ''মাঠ পরিদর্শন'' করা। মাঠ পরিদর্শনের উপর নির্ভর করছে পরের প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রয়োজন ভিত্তিক উপযোগ। মাঠ পরিদর্শন পরিচিতি দেয় মাঠের প্রকৃতিগত মান, গাছের স্বাস্থ্য এবং তার পরিচর্য্যা। রোগের লক্ষণ দেখে প্রযুক্তিগতভাবে নিরাময়ের বিধান নিরূপণ, শত্রু পোকার অনুপ্রবেশ ও বংশবৃদ্ধির সমীক্ষাকরণ এবং সেই সঙ্গে মিত্র পোকার ভূমিকা ও অনুপাত নিরূপণ করতে হবে। শত্রু ও মিত্র পোকার অনুপাত এর উপর নির্ভর করে প্রয়োজনভিত্তিক রাসায়নিক নাশক (জৈবজাত, জীবানুজাত, উদ্ভিদজাত) সঠিক মাত্রায় এবং

সঠিক পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট কৃষি যন্ত্রপাতির দ্বারা শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ বা আপাদ ক্ষতিগ্রস্থ অংশবিশেষে ব্যবহার করতে হবে। *IPM* পদ্ধতির অন্য একটি দিক হল কৃষককে স্বনির্ভর করে তোলা। নিজের জমিতে ঘাম ঝরানো পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে গিয়ে রোগ, পোকা বা আগাছা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য অপরের উপর নির্ভর না করা। সঠিক প্রযুক্তিগত অজ্ঞানতার ফলে অধিকাংশ কৃষককেই রাসায়নিক নাশক, সার, বীজ বিপণীর দ্বারস্থ হতে হয় এবং কম বেশী বিপণীর লোকেদের ইচ্ছানুসারে রাসায়নিক নাশক প্রয়োগ করতে হয়। ফলে অধিকাংশ কৃষকই নিরুপায় ও হতাশায় জর্জরিত হয়ে আর্থিক অসংকুলান দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েন। তাই ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আই-পি-এম পদ্ধতিতে (বিশেষ করে ধানে) চাষ করাবার জন্য গত ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে কৃষকদের জন্য মেঠো স্কুল *(Farmers Field School)* চালু করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্যের প্রতিটি জেলাকেই এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও ভারতবর্ষে শুধুমাত্র তুলা চাষেই বেশী রাসায়নিক নাশকের ব্যবহার হয়। তারপর ব্যবহার হয় ধান, ফল ও সবজী এবং চা, কফি ইত্যাদিতে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী তুলা শতকরা ৫ ভাগ জমিতে চাষ হলেও রাসায়নিক নাশকের ব্যবহার হয় শতকরা ৫৪ ভাগ। আমাদের রাজ্যে ধানই প্রধান ফসল। যদিও ভারতবর্ষে ব্যবহৃত মোট রাসায়নিক নাশকের শতকরা ৬ ভাগ ব্যবহৃত হয় আমাদের রাজ্যে এবং সামগ্রিক ফসল চাষের উপর কোন ক্রমেই তা ৫০০ গ্রাম প্রতি হেক্টরে ছাড়িয়ে যায়নি। এটাও দেখা গেছে যে ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে মূল বিষ *(Technical grade)* ৫০০০ মেট্রিক টনের নীচে ব্যবহৃত হয়েছে। আই-পি-এম *(IPM)* পদ্ধতির প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সব জেলায় চালু করার পর রাসায়নিক নাশকের ব্যবহার হয়েছে ৩৮০০ মেট্রিক টন।

ধানচাষে সুসংহত রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি ব্যবস্থাপনা —

১. এলাকাভিত্তিক রোগ পোকার সম্ভাবনা বিচার করে জমির অবস্থান অনুযায়ী জাত নির্বাচন করতে হবে। সহনশীল জাতের নির্বাচন বিশেষতঃ রোগ দমনের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। প্রয়োজন হলে স্বল্প মেয়াদী জাতেরও চাষ করা যায়, যাতে করে বেশ কিছু পোকার আক্রমণের তীব্রতাকে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে।

২. ধানে অনেক রোগই বীজবাহিত এবং বীজশোধন বেশ কিছু রোগ দমনের জন্য একমাত্র পথ যেমন - বাঁকানো বা গোড়াপচা। এই বীজ শোধন শুকনো পদ্ধতি বা ভিজে পদ্ধতিতে যথাক্রমে শুকনো বীজতলা বা কাদানো বীজতলার জন্য উপযুক্ত বীজ শোধনের ব্যবস্থা রাসায়নিক নাশক দ্বারা করতে হবে।

৩. গাছের চারা রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য বীজতলায় কম খরচে রোগ, কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে মূল জমিতেও বিস্তারলাভ কম হবে। ধানের কুটে রোগ (টুংরো ভাইরাস) প্রবন ও ভেঁপু পোকা প্রবন এলাকায় এই পদ্ধতিই একমাত্র উপায় যাতে করে মূল জমিতে এই রোগ ও পোকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৪. জমির মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্দেশমত সুষম সার ও জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণে ফসফেট, পটাশ ও জৈবসারের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। চাপান-সারও মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্দেশমত দেওয়া উচিত। বেশী মাত্রায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে জীবানুজনিত ধসা রোগের প্রকোপ বাড়ে।

৫. মূল জমির কাদা ঠিকমত যেন হয়। বিশেষ করে তড়িঘড়ি চাষ দিয়ে রোয়া উচিত নয়। ঠিকমত গোড়া ও আগাছা পচান দিলে রোগ-জীবাণু নষ্ট হয় এবং মাজরা পোকার কীড়া বা শুককীট নষ্ট হয়।

৬. রোয়া করার সময় সঠিক দূরত্বে চারা লাগাতে হবে। আসল উদ্দেশ্য জমির মাটিতে যেন সূর্যালোক ঠিকমত প্রবেশ করে। এতে করে রোগ-পোকার উপদ্রব কম দেখা যায়।

৭. ধানের ক্ষেতে ক্ষতিকারক পোকা খুব বেশী হলে ৭-৮ রকমের দেখা যায়। যার মধ্যে ৫-৬ রকমই হয় প্রধান। কিন্তু এই ক্ষতিকারক পোকার শত্রু পোকা যা আমাদের কাছে বন্ধু পোকা তা প্রায় কম করে ২৫ রকমের। অতএব ক্ষতিকারক পোকার ২-১টি নগণ্য সংখ্যা। দেখে বা আশংকা করে কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়। আমন ধানে বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদী জাতে মাজরা পোকার জন্য রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে কীটনাশক প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই। আশংকার ভিত্তিতে প্রথম দিকে কীটনাশক প্রয়োগে বন্ধু পোকা ও মাকড়সা মারা পড়ে। ফলে পরবর্তীকালে ওই জমিতে বা ক্ষেতে অন্য ক্ষতিকারক পোকার উপদ্রব বাড়ে।

৮. ধানের জমিতে নেমে এক কোণ থেকে অন্য কোণ হেঁটে যেতে হবে সমীক্ষা করার জন্য। এই সময় ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ যেমন দেখতে হবে তেমনি দেখতে হবে মাকড়সা, লেডীবার্ডবিটল বা মিরিড বাগ ইত্যাদি বন্ধু পোকার সংখ্যাও। এই সমীক্ষা সপ্তাহে একদিন ফুল আসার আগে পর্যন্ত এবং ফুল আসার পর এই সমীক্ষা করতে হবে সপ্তাহে ২ দিন। কারণ এই সময় বাদামী শোষক পোকা, শীষকাটা লেদা পোকার আক্রমণ হয়। শত্রু ও মিত্র পোকার অনুপাতের বিচারে প্রয়োজন হলে

রাসায়নিক নাশক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন হলে শ্যামা পোকা ও মাজরার জন্য আলোক ফাঁদের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৯. গাছে ফুল আসার আগে বেশী জল জমিতে বা ক্ষেতে যেন না রাখা হয়। সম্ভব হলে ২-১ দিনের জন্য দাঁড়ানো জল বের করে দেওয়া এবং পরে আবার জল ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত। এতে করে বাদামী শোযক পোকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

১০. ফুল আসার দীর্ঘমেয়াদী জাতে ক্ষেতে ধানের পাশ ঠেলে দিতে হবে। ৫-৬ ঝাড় করে ধানগাছ উত্তর দক্ষিণ বরাবর দু-পাশে ঠেলে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

১১. শীযকাটা লেদা পোকা বা ইঁদুরের আক্রমণ হলে জমিতে পাখি বসার জন্য গাছের ডালপালা বা বাঁশের ডগা পোঁতার ব্যবস্থা করা ভাল।

১২. জীবানুজনিত পাতা ধসা রোগ কোন রাসায়নিক নাশক ব্যবহারে দমন করা যায় না। সহনশীল জাতের চাষ এবং সুসম সারের ব্যবহারই রোগের প্রকোপ কমাতে পারে।

১৩. পামরী পোকা, লেদা পোকা, পাতামোড়া পোকার বিক্ষিপ্ত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টিগত ভাবে দমন ব্যবস্থা নিলে সুফল পাওয়া যায়।

ধানক্ষেতে আমরা যেমন পাই বেশ কিছু শত্রু পোকা সেই রকম বহু সংখ্যক বন্ধু পোকাও থাকে যারা এই শত্রু পোকার জীবানচক্রের কোন না কোন পর্যায়ের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে। সাধারণতঃ বন্ধু পোকা দুই ভাগে বিভক্ত, যেমন - (ক) পরভোজী এবং (খ) পরজীবি।

(ক) **পরভোজী ঃ—** এরা শত্রু পোকাকে জীবনচক্রের যে কোন দশাতেই খেয়ে ধ্বংস করে। যতদিন এই সব পরভোজী বেঁচে থাকে এবং এদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয় শত্রু পোকার।

(খ) **পরজীবি ঃ—** এরা সাধারণতঃ শত্রু পোকার জীবনের যে কোন দশায় নিজেদের জীবনের ডিম, শুককীট বা কীড়া ও মুককীট বা পুত্তলী দশাগুলি অতিক্রান্ত করে এবং শত্রুপোকাকে পরোক্ষভাবে ধ্বংস করে। এক কথায় শত্রু পোকার জীবনদশায় এরা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে।

পরভোজী পোকা —

লেডি বার্ড বিটল, গ্রাউন্ড বিটল, উরচুঙ্গা (ক্রিকেট), লম্বা শুঁড় ঘাসফড়িং, ওয়াটার বাগ, ওয়াটার ট্রিডার, ওয়াটার স্ট্রাইডার, অ্যাসাসিন বাগ, ড্যামসেল ফড়িং ও ড্রাগন ফড়িং, মিরিড বাগ, ইয়ার উইগ, লাল পিঁপড়ে, বোলতা, মাকড়সা।

পরজীবি পোকা — এই পোকাদেরও আবার শত্রু পোকার ডিম ও কীড়া ভেদে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) **বিভিন্ন প্রকার ডিমের পরজীবি পোকা ঃ—** বোলতা, টেলিনোমাস, টেট্রাস্টিকাস, ট্রাইকোগ্রামা, গোনাটোসেরাস, এনাগ্রাস, ওলিগোসেটা, কপিডো সোস্পসিস - এরা সকলেই আকারে খুবই ছোট এবং খালি চোখে এদেরকে দেখা যায় না। মাজরা পোকা ও বিভিন্ন মথের ডিমের মধ্যেই এদের স্ত্রী-পোকাদের কীড়া বেড়ে উঠে। প্রয়োজনে একাধিক ডিমেও এরা জীবন অতিবাহিত করে। এদের অনেকেই শত্রু পোকার ডিমকে প্যারাসিটাইজ *(Parasitise)* করে। ফলে ডিমের সাধারন রং পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সমস্ত আক্রান্ত ডিম থেকে পরবর্তীকালে শত্রু পোকার বাচ্চা বা নিম্ফ বের হয় না। তবে জীব জগতের নিয়ম অনুসারে সব ডিমকে এরা প্যারাসিটাইজ করে না । কিছু রেখে দেয় যাতে করে বন্ধু পোকার পরবর্তী প্রজন্ম আবার খাদ্য বা শিকার পায়।

খ) **বিভিন্ন প্রকার কীড়ার পরজীবি পোকা ঃ—** বোলতা, অ্যামপোসরফা, জ্যান্থপিমপলা, স্টেনোব্রাকন, ফেনারোটোমা, ট্রাইকোমা, ম্যাকসোমেন্টু কার্ডিওচাইনেস, কোটোসিয়া, পোনাইওজাম, ইলাসমাস, ইটোপ্রোকটিস, কারপস, টোসেলুচা স্নেলেনিয়াস, ব্রাকাইমোরিয়া, এপিয়াস, হ্যাপলোগোনাটোপাস, মোটা মাথা মাছি, স্ট্রেপসিপটেরা ইত্যাদি বন্ধু পোকারা মাজরা পোকার, পাতামোড়া পোকার, লেদা পোকার, বিছা পোকার, ঘোড়া পোকার এবং সাদা মাছি পোকার কীড়ার উপর প্যারাসিটাইজ করে জীবনধারন করে। অনেকে এই সব কীড়ার ভিতরে ডিম পাড়ে এবং ডিমফুটে নিম্ফ বা বাচ্ছা এইসব কীড়ার মধ্যে জীবন ধারণ করে বড় হয় এবং পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ হয়ে বের হয়ে জীবনচক্র শুরু করে।

ধানের ক্ষেতে উপকারী রোগ জীবানু —

অনেক শত্রু পোকা আবার নানা রকমের রোগ-জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সব রোগ জীবানুগুলি যথাক্রমে - ছত্রাক, জীবানু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া বা কৃমি। যারা এই সব শত্রু পোকার জীবদ্দশার কোন না কোন পর্যায়ে আক্রমণ করে এবং ধীরে ধীরে শত্রু পোকাকে মেরে ফেলে।

ছত্রাকজনিত — মিটার থিজিয়াম, বিউভেরিয়া, হিরগুটেলা, নোমুরিয়া - এই সমস্ত ছত্রাক বেশীর ভাগই সাদা রং-এর দেখতে হয়। কেউ কেউ কালো বা বাদামী রং-এরও হয়। এরা

শ্যামা পোকা, বাদামী বা সাদাপীঠ শোষক পোকার পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ অবস্থা বা নিম্ফ বা বাচ্চা এবং চুঙ্গী পোকার, লেদা পোকার, পাতামোড়া পোকার কীড়াকে আক্রমণ করে থাকে। এই সব শত্রু পোকার উপর এরা জীবনধারণ করে।

ভাইরাসজনিত উপকারী রোগ জীবানু — নিউক্লিয়ার পলিহাইড্রোসিস ব্যকুলোভাইরাস, গ্রানুলোসিম ব্যাকুলোভাইরাস-এই সব ভাইরাস বিভিন্ন ধরনের লেদা পোকার রোগ সংক্রামন করে থাকে। আক্রান্ত লেদা পোকা প্রথম সাদা এবং পরে কালো রং -এর হয় এবং শেষে আক্রান্ত লেদা পোকা মারা যায়। ভাইরাস কোনক্রমে লেদা পোকার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে লেদা পোকাকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে ফেলে এবং অবশেষে মেরে ফেলে। পরবর্তীকালে উপযুক্ত পরিবেশে এই সব মৃত লেদা পোকা থেকে ভাইরাস আবার সুস্থ সবল লেদা পোকাতে সংক্রমিত হয়।

সুসংহত রোগ পোকা দমনের জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

আমন ধানে সুসংহত রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ঃ

১। এলাকাভিত্তিক প্রধান রোগ বা পোকার সহনশীল জাত নির্বাচন।

২। বীজ শোধন।

৩। বীজ তলায় কীটনাশক ও রোগনাশকের ব্যবহার।

৪। জমিতে কাদা করে পচান দেওয়া।

৫। সুষম সার প্রয়োগ (পটাশ সারের ব্যবহারের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া যাতে জমিতে পটাশের ঘাটতি না থাকে)

৬। পোকার আক্রমণের আশংকার ভিত্তিতে কীটনাশক ব্যবহার না করা।

৭। প্রয়োজনভিত্তিক রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ।

৮। জমিতে অতিরিক্ত জল না রাখা।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য —

১। টুংরো রোগপ্রবণ এলাকায় বীজতলায় চারা সবুজ রং হওয়ার সাথে সাথে সর্বাঙ্গ বাহী দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

২। কেরোসিনে ভিজা দড়ি ধানগাছের উপর দিয়ে টানলে পামরী পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

৩। সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাঠে সন্ধ্যের পর আগুন জ্বালিয়ে আলোয় আকর্ষিত অনেক শত্রু পোকা

নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। দীর্ঘ কার্যকরী ও তীব্র বিষযুক্ত কীটনাশক শত্রু পোকার সাথে অনেক বন্ধু পোকাও ধ্বংস করে।

৫। ধান গাছের পাতার উপর জমে থাকা জল বা শিশির ঝরিয়ে দিলে ঝলসা রোগের প্রকোপ কমে।

৬। সঠিক পোকায় সঠিক কীটনাশক সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করলে প্রাকৃতিক শত্রু (বন্ধু পোকাকে) সংরক্ষণ করে।

৭। শীষকাটা লেদা পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে বিকালের দিকে কীটনাশক দেওয়া ভাল।

৮। ভেঁপু পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে বীজতলাতেই সর্বাঙ্গবাহী কীটনাশকই প্রয়োগ করা ভাল। একইসাথে অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৯। আটসারি অন্তর এক সারি ছাড় করলে ও সারি উত্তর-দক্ষিণ করলে বাদামী শোষক পোকার প্রকোপ কমে।

১০। ধানগাছ সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেলে জমির দাঁড়িয়ে থাকা জল বের করে দিলে বাদামী শোষক পোকার প্রকোপ কমে।

কীটশত্রু দমনের জন্য রাসায়নিক নাশকের মাত্রা

নাম	প্রতিলিটার জলে রাসায়নিক নাশকের মাত্রা	হেক্টর প্রতি ওষুধের পরিমাণ
ক) তরল কীটনাশক বা জলে গোলা পাউডার ঃ		
১। এ্যাসিফেট ৭৫%	০.৭৫ গ্রাম	৫৬০ গ্রাম
২। ফসফামিডন ৪০%	২.০০ লিটার	১৫০০ মিলি
৩। মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০%	১.০০ মিলি	৭৫০ মিলি
৪। কুইনলফস ২৫%	২.০০ মিলি	১৫০০ মিলি
৫। মনোক্রোটোফস ৩৬%	১.৫০ মিলি	১১২৫ মিলি
৬। ফেনথিয়ন ৮২.৫%	০.৭৫ মিলি	৫৬০ মিলি
৭। এন্ডোসালফান ৩৫%	২.০০ মিলি	১৫০০ মিলি
৮। ডাইক্লোরভস ৭৬%	০.৭৫ মিলি	৫৬০ মিলি
৯। ক্লোরপাইরিফস ২০%	২.৫০ মিলি	১৮৭৫ মিলি
১০। কারবারিল ৫০%	২.৫০ গ্রাম	১৮৭৫ গ্রাম

১১। ম্যালাথিয়ন ৫০%	১.০০ মিলি	৭৫০ মিলি
১২। কার্বোসালফান ২৫%	২.০০ মিলি	১৫০০ মিলি
১৩। ফিপ্রোনিল ৫%	১.০০ মিলি	৭৫০ মিলি
১৪। নীমজাতীয় কীটনাশক ১৫০০ পি.পি.এম.	২.০০ মিলি	১৫০০ মিলি
১৫। কারটাপ ৫০%	১.০০ মিলি	৭৫০ মিলি
১৬। ইথিফেনপ্রক্স ৫০%	০.৫০ মিলি	৩৭৫ মিলি
১৭। ইমিডেক্লোরপিড ১৭.৬ এস.এল	১.০০ মিলি/প্রতি ১০ লিটার জলে	১০০ মিলি

কীটশত্রু দমনের জন্য রাসায়নিক নাশকের মাত্রা

নাম	প্রতিলিটার জল রাসায়নিক নাশকের মাত্রা	হেক্টর প্রতি ওযুধের পরিমাণ
ক) গুঁড়া কীটনাশক ঃ		
১। মিথাইল প্যারাথিয়ন ২%	—	২৫ কেজি
২। কুইনলফস ১.৫%	—	২৫ কেজি
৩। কারবাবিল ৫%	—	২৫ কেজি
৪। এন্ডোসালফান 4%	—	২৫ কেজি
৫। লিনডেন ১.৩%	—	২৫ কেজি
গ) দানাদার কীটনাশক ঃ		
১। কারটাপ ৪%	—	২৫ কেজি
২। ফিপ্রোনিল ০.৩%	—	১৮.৭৫০ কেজি
৩। কারবোফুরান ৩%	—	৩০ কেজি
৪। ফোরেট ১০%	—	১০ কেজি
৫। কুইনলফস ৫%	—	২০ কেজি

কয়েকটি বোগ নাশকেব নাম ও পযোগমাত্রা

	বাসাযনিক নাম	কাযকাবিতা ও বিষাক্ততা	বোগ পতিবোধ কবে	বাণিজ্যিক নাম	পযোগ মাত্রা
১)	টাইসাইকোজল	অন্তর্বাহী ছত্রাক নাশক (হলদে)	ঝলসা বোগ	৭৫% ডব.পি.বিম, ট্পাব	০.৫ গাম/লি.
২)	হেক্সাকোনাজল	অন্তর্বাহী ছত্রাক নাশক (সবজ)	ঝলসা, খোল পচা	৫% ই.সি. কনটাফ,	১ মিলি/লি.
৩)	পেনকোনাজল	অন্তর্বাহী ছত্রাক নাশক (নীল)	পাউডাবি মিলডিউ	১০% ই.সি. টোপাস	০.৫ মিলি/লি.
৪)	পোপিকোনাজল	টাযাজোল (নীল)	বাদামী দাগ	২৫% ই.সি. টিল্ট ও সেলেকন, পিনাকল	০.৭৫ মিলি/লি.
৫)	এডিফেনফস ৫০%	ছত্রাক নাশক	ঝলসা বোগ	৫০% ই.সি. হিনোসান	১ মিলি/লি.
৬)	ওবিওফাজিন	বহুমুখী অ্যান্টিবাযোটিক ও ছত্রাক নাশক (সবজ)	ঝলসা, ধসা	৪৬.১৫% এস.পি. ওবিওফাঞ্জিনসল	১গাম/৭.৫ লি.
৭)	স্ট্রেপটোসাইকিন	ব্যাকটেবিযা নাশক ও অ্যান্টিবাযোটিক (সবজ)	ধসা, দাদ, ফ্যাঙ্গাব	৯০.১০% এস.পি. স্ট্রেপটোসাইকিন, পোষাসাইসিন,	১গাম/১০ লি.
৮)	কাসুগামাইসিন	অ্যান্টিবাযোটিক ও ছত্রাক নাশক (সবজ)	ঝলসা, দেদোবোগ, দাগ, ...	৩% এস.এল. কাসবি,	১ মিলি/লি,
৯)	ভ্যালিডামাইসিন	অ্যান্টিবাযোটিক ও ছত্রাক নাশক	খোলাপচা	৩% এস.এল. শাথমাব, বাইজোসিন, ভ্যালিডান	২মিলি/লি.
১০)	স্টিডোমোনাস ফ্ওবেসেন্স	ছত্রাক নাশক ব্যাক্টেবিযা	ঝলসা, পানামা ডইল্ট টলে পড়া	বক্ষক, বাযোশিল্ড, স্প্রিংবাযো, আর্মি বাযোটিক বি.	০.৫-১% স্প্রে
১১)	টাইকোডার্মা ভিবিডি	জৈব ছত্রাক নাশক	পচন বোগ	গাডডাব, হকোডার্মা, গার্ড	১-২গাম/লি., ২-৩ গাম/লি.

Integrated Pest Management (IPM) in Rice
Sri Ratan Mukherjee
Agriculture Development Officer, Government of West Bengal

ফসলের কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে জৈবিক পদ্ধতি

ডঃ দিলীপ কুমার নাথ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন কীটতত্ত্ববিদ

ফসলের পোকা-মাকড় দমনের জন্য বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবহারে বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ায় রাসায়নিক কীটনাশকগুলি পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখী, জমির মাটি, পুকুর নালা কোন কিছু দূষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সাপ, ব্যাঙ, কেঁচো, কুচো মাছ, গেঁড়ি-গুগলি নিয়ে ক্ষেতি ফসলের জমিতে যে জৈব বৈচিত্র্য আজ তা হারিয়ে গেছে নানা রকম অতি তীব্র বিষাক্ত দানাদার ও তরল কীটনাশকের অত্যধিক ব্যবহারের জন্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ায় এই সব বিষগুলি থেকে আগের মত কাজ পাওয়া যায় না। উল্টে অনেক রকম প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি হয়েছে ও সাধারণ মানের পোকা ক্ষতিকারক পোকার জায়গা নিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে তাই বিষাক্ত রাসায়নিক ওষুধগুলির বিপক্ষে শোরগোল উঠেছে। পুরোপুরি বাদ দিতে না পারলেও বিষাক্ত ওষুধের ব্যবহার এখনি কমানো প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এমন সব ব্যবস্থা নিয়ে চাষবাস করা দরকার যাতে পোকা-মাকড় মাথা তুলতে না পারে। এখন চিন্তাভাবনা হচ্ছে পোকা বাড়াবাড়ি করলে কি করে জৈব উপায়ে তাকে দাবিয়ে রাখা যায়। এতে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া না গেলেও পরিবেশের কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে সজাগ ও উৎসাহী হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

প্রাকৃতিক নিয়মে ভারসাম্য বজায় রাখার তাগিদে জীবজগতে বিভিন্ন রকম পোকামাকড়, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা অন্য প্রাণীর মধ্যে খাদ্যখাদক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। জৈবিক নিয়ন্ত্রণ হল বিভিন্ন জীবের মধ্যে সহজাত যে বৈরিতা তাকে চাষবাসের ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় দমনে মানুষের দ্বারা নানাভাবে কাজে লাগানো।

ফসলের ক্ষতিকারক পোকা খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারা আমাদের মিত্র। মিত্র প্রাণীদের বড় অংশ জুড়ে আছে আবার সেই পোকা-মাকড়ই। বাছবিচার না করে ক্ষতিকারক পোকাকে শিকার করে খায় — এ রকম একধরণের প্রাণী হল — মাকড়সা, ক্ষুদে মাকড় ও নানান জাতের পোকা। এরা হল পরভুক। ফসল মাত্রেরই যেমন কিছু না কিছু ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় থাকেই, তেমনি থাকে বহু রকম পরভুক। আমাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এরা ফসলের প্রহরীর কাজ করে। ছোট বড় নানান জাতের মাকড়সা, মথ, শ্যামা, শোষকপোকা ইত্যাদি খেয়ে বাঁচে। অতি ক্ষুদ্র সাদা চকচকে মাকড় পাতার ক্ষতিকারক মাকড় বা মাইটের

ডিম খায়। পাটে বা আমগাছে তীব্র স্পর্শবিষ বারবার দিলে মাইটের আক্রমণ ভয়ানক বেড়ে যায়। তার কারণ হল, ওষুধে শত্রু-মিত্র দুরকম মাইটই মারা যায় কিন্তু মাইটের ডিমের কিছু হয় না। শত্রু মাইটের ডিম বেশী থাকার জন্য পরে তাদের বাচ্চা পাতায় ছেয়ে ফেলে। মাকড়-মাকড়সা ছাড়াও শিকারজীবি পরভুক মিত্র পোকা সব সময় জমি-বাগিচায় চরে বেড়ায়। পরভুক পোকারা শত্রু পোকাকে চিবিয়ে দেহাংশ খায়। যত না খায় তার থেকে বেশি পোকার দেহ ছিন্নভিন্ন করে। কিছু মিত্র পোকা শত্রু পোকার ডিম-বাচ্চার দেহরস শুষে খায়। চিবিয়ে খাওয়া পোকার উদাহরণ হল — সুন্দরী পোকা যারা জাব পোকা খেয়ে ধ্বংস করে। বাদামী শোষক পোকার রস শুষে খায় মিরিড বাগ।

শিকারজীবি ছাড়া আছে পরজীবি পোকা, সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে তারাই বেশী। অসংখ্য রকম পরজীবি বোলতা চাষবাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে থাকে। শত্রু পোকার ডিম বা বাচ্চা বা ধাড়ির দেহের ভিতর থেকে বোলতারা তাদের জীবনচক্র শেষ করে, পূর্ণাঙ্গ হয়ে আবার নতুন করে ডিম পাড়ে। এমনি করে বংশবৃদ্ধি হয়। শুধু শত্রু পোকার দেহ আশ্রয় করে তাদের বাচ্চা ও বৃদ্ধি পায় তাই প্রখর ও তীক্ষ্ণ তাদের শত্রু পোকা খুঁজে নেবার ক্ষমতা। তবে বিশেষ জাতের বোলতা একটি নির্দিষ্ট জাতের শত্রু পোকার দেহ আশ্রয় করে জীবনচক্র শেষ করে। বাইরে ঘুরে বেড়ানো পাতা থেকে লেদারাই নয়, গাছের কাণ্ডে বা জলে ঢুকে যে সব লেদা ফসলের ক্ষতি করে, তাদেরও সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে এই সব বোলতা। এমন কোন লেদা বা অন্য গোষ্ঠীর পোকা নেই যারা কিছু না কিছু বোলতা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ছোট বড় নানান রকম বোলতার মধ্যে খালি চোখে দেখা যায় না এরকম অতি ক্ষুদ্র বোলতা ক্ষতিকারক পোকার ডিমের ভিতর জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। আক্রান্ত ডিম থেকে ক্ষতিকারক লেদা বের হয় না, পূর্ণাঙ্গ বোলতা বের হয় যারা আগাছার ফুলের মধু খেয়ে থাকে। ধানের মাজরা পোকার ডিমের গাদায় কালো রঙের ডিমগুলি বোলতা আক্রান্ত, এর থেকে বোলতা বের হবে, লেদা নয়।

পরভুক ও পরজীবি মিত্র পোকা-মাকড়গুলি প্রকৃতির অঙ্গ। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না করে তাদের নিজেদের স্বভাবের জন্য প্রকৃতির ভারসাম্য অনাদি কাল থেকে বজায় রেখে চলেছে। আমাদের উদ্যোগে বন্ধু পোকার সংখ্যা বাড়িয়ে জমি মা বাগিচায় ছেড়ে দেওয়ার কাজ অল্প-স্বল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ধানের জমিতে মাজরার ডিম নষ্ট করার জন্য ক্ষুদে বোলতা ট্রাইকোগ্রামার ডিম ছাড়া হয়। এখন এজ-কার্ড কিনতে পাওয়া যায়। টমেটোর ফুল আসার পর ফলছিদ্রকারী লেদা হেলিকোভারপার জন্য ট্রাইকোগ্রাম াব্রেসিলিয়েনসিস ছাড়া হয়। জাব-সাদামাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রাইসোপারলা, ধানের

বাদামীশোষকের জন্য মিরিড বাগ, সিট্রোসিনাস, পরভুক হিসাবে ছাড়া হয়।

জমিতে বা বাগানে পোকার আক্রমণ নজরে পড়লে, শত্রু ও মিত্র পোকাকে যদি আলাদাভাবে চেনা যায়, তবে বন্ধুপ্রাণীগুলিকে প্রকৃতিতে সংরক্ষণ করা যায়। বন্ধু পোকা-মাকড় বা প্রাণী যাতে বহাল তবিয়তে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার সুযোগ অন্ততঃ আমরা সৃষ্টি করতে পারি। প্রাকৃতিক মিত্র প্রাণী সংরক্ষণ ও সংক্রমণের কাজ এরকমভাবে করা সম্ভব —

(১) আশেপাশের কোন জঙ্গলের থেকে মাকড়সার ডিমের গাদা জমিতে বা ফল-সবজির বাগানে রেখে দেওয়া।

(২) ধান কাটার সময় জমির আলে খড় ছিটিয়ে রাখা — তাতে মাকড়সার আশ্রয় হয়। ধান রোয়ার সময় খড় তুলে নিলে মাকড়সা জমিতে সংক্রমিত হবে।

(৩) ধানের আলে পোতা বাঁশে খোল করে তাতে মাজরায় ডিম রেখে দেওয়া। এর থেকে ক্ষুদে বোলতা বেরিয়ে নতুনভাবে আবার মাজরার ডিমকে আক্রমণ করবে।

(৪) হাতজাল দিয়ে বা বড়গাছের তলায় ছাত' উল্টো করে ধরে পোকামাকড়সা ধরা। বন্ধুগুলি বেছে নিয়ে বাগানে বা জমিতে ছেড়ে দে..া।

(৫) পোকা লাগলেই বিষাক্ত ওষুধ না ছিটিয়ে, পোকা সত্যি ফলনে ক্ষতি করছে কিনা — তা বিচার করে রাসায়নিক কীটনাশক ছিটালে, ওষুধের অযথা ব্যবহার এড়ানো যায়। মিত্র পোকা সংরক্ষণে এটাই এখন কার্যকরী পদ্ধতি।

বেশির ভাগ পাখী পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচে। ধানে কাতারে লেদা বা শীষকাটা লেদা লাগলে জমিতে ঝোপ পুঁততে বলা হয় — পাখীর বসার সুবিধার জন্য। এক জোড়া চড়ুই জাতীয় পাখি (টিট) বছরে তার ছানা সহ পোকার ১২ কোটি ডিম বা দেড় লক্ষ লেদা ও পুত্তলি নষ্ট করে।

মানুষের নিজের প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত ও কার্যকারীতায় পরীক্ষিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জৈব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চালু ব্যবস্থাগুলি হল ঃ ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, নিমজাত অ্যাজাডিরেকটিন ও যৌন ফেরোমোন ব্যবহৃত ফাঁদ দিয়ে ফসলের পোকা দমন। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস্ ভার কারস্টাকি নামে এক ব্যাক্টেরিয়া লেদা পোকার পাকস্থলিতে ঢুকলে পোকা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। শুধু মথগোষ্ঠীর লেদা পোকার উপর কার্যকরী হওয়ায় এই ব্যাকটেরিয়া গুলো পাতায় ছিটালে অন্য কোন বন্ধু পোকা মারা পড়ার সম্ভাবনা নেই। জীবানুটি গাছে

কোন রোগসৃষ্টি করে না ও ব্যবহারকারীর স্পর্শে এলেও কোন ক্ষতি হয় না। তবে ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলিতে যাওয়া চাই, পোকার শরীরে লাগলে কোন কাজ হবে না। বায়োলেপ নামে গুড়ো অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। প্রতি লিটার জলে একগ্রাম হারে মিশিয়ে বিকেলে স্প্রে করতে হয়।

নিউক্লিয়ার পলিহিড্রাল ভাইরাস, সংক্ষেপে এন.পি.ভি., এরকম আর একটি জৈব ওষুধ যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় — মাত্র দুটো জাতীয় লেদা দমন করার জন্য, টমেটোর ফলছিদ্রকারী লেদা, হেলিকোভারপা আর্মিজেরা (এন পি ভি এইচ এ) ও বিভিন্ন সব্জি ফসলের পাতা কুঁড়ি থেকে লেদা, স্পোডোপটেরা লিটুরা (এন পি ভি-এস এল) ফসলে পরিবেশের অন্য প্রাণী বা মানুষে এর কোন ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া নেই। জমির মধ্যে ভাইরাস আক্রান্ত পোকা চেনাও সহজ। আক্রান্ত মরা লেদা ভাঁজ হয়ে পাতা থেকে ঝুলতে থাকে। এরকম মরা পোকা বেটে তার রস জলে গুলে নতুন পোকা-আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করা যায়। এক একর জমির জন্য অন্তত ১০০টি ভাইরাস আক্রান্ত মরা পোকা লাগবে। বাজারে প্রচলিত ওষুধ, বায়োভাইরাস এইচ/এল, এক লিটার জলে এক মিলি লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ব্যাকটিরিয়ার মত ভাইরাসটি এখানো তত চালু হয়ে ওঠেনি।

বহু প্রাচীন কাল থেকে নিমকে অত্যন্ত দরকারী একটি গাছ হিসেবে দেখা হয়। যেদিন থেকে নিমের বীজের শ্বাসে পঙ্গপালের খাওয়া বন্ধ করার গুণ জানা গেল, তখন থেকে রসায়নবিদরা নিম নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। লিমোনয়েড নামে অত্যন্ত তেতো উপাদান নিমের বীজ থেকে আলাদা করতে সক্ষম হলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তেতো উপাদানগুলি ট্রাইটারপেনয়েড নামে পরিচিত। এইসব ট্রাইটারপেনয়েডগুলির মধ্যে যারা পোকা দমন করতে পারে সে রকম খুব কার্যকরী অ্যালকালয়েড হল অ্যাজাডিরেকটিন। অনেকগুলি রাসায়নিক যৌগের মধ্য থেকে অ্যাজাডিরেকটিনকে আলাদা করা বেশ কঠিন কাজ। অশোধিত অ্যাজাডিরেকটিন ব্যবহারে কতগুলি সমস্যা আছে। যেমন, দ্রবণে ভাল করে গুলতে চায় না, সুস্থিত থাকে না এবং ব্যবহারে নিরাপদও নয়। এই অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিমের শাঁস থেকে অ্যাজাডিরেকটিনকে প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করার পদ্ধতি বের করা হয়েছে। নিমভিত্তিক পোকা দমনে ওষুধগুলিকে এখন অ্যাজাডিরেকটিনের পরিমাণ দিয়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। নিমারিন এই রকম একটি পোকা দমনের ওষুধ যার মধ্যে অ্যাজাডিরেকটিন আছে ০.১৫ শতাংশ। এটা প্রপিলিন গ্লাইকলে (৯৮.৫ শতাংশ) দ্রবীভূত করা হয়। এছাড়া নিমারিন ০.০৩ শতাংশও পাওয়া যায়।

ফসলে অ্যাজাডিরেকটিন ছিটালে পোকা (১) ফসল খায় না, (২) ফসল থেকে পালায়, ও (৩) ফসলে ডিম পাড়ে না। পোকার গায়ে অ্যাজাডিরেকটিন লাগালে পোকার মধ্যে শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন, হরমোনে ভারসাম্য নষ্ট হয়, তাতে পোকার অঙ্গ বিকৃতি দেখা যায়। শুষে খাওয়া পোকা যেমন, জাব, শ্যামা, সাদামাছি বা চিরুণী পোকার সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আগেভাগে নিমারিন ০.১৫ শতাংশ (যা নিমারিন ১৫০০ পি পি এম নামের প্রচলিত) প্রতি লিটার জলে ৩-৫ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৭-১০ দিন পরপর ব্যবহার করা চলে। এতে পোকার প্রতিরোধীজাত সৃষ্টি হয় না। উল্টে বারবার রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করার জন্য যেখানে পোকার প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি হতে চলেছে সেখানে রাসায়নিক কীটনাশকের মাঝে অ্যাজাডিরেকটিন ব্যবহার করলে প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি হওয়া ব্যাহত হবে।

বায়োট্রেপ-এ পোকার যৌনস্বভাবের উপর ভিত্তি করে পোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি। এতে একটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী ফাঁদ থাকে যার তলায় একটি ফানেল লাগানো হয়। উপরের ঢাকনার মাঝে একটি নলের মত গর্তে পুরুয বা স্ত্রী মথ আকর্যণের জন্য যৌন ফেরোমোন লাগানো থাকে। ফোরোমেন এক একটি প্রজাতির জন্য এক এক রকম হয়। যেমন বায়োলিওর এইচ এ — হেলিকোভারপা আর্মিজেরা, বায়োলিওর এস এল — স্পোডোপটেরা লিটুরা, বায়োলিওর এস-ই — সিরপোফেগা ইনসারটুলাস ইত্যাদি। ১৫ দিন অন্তর লিওর পাল্টানোর দরকার হয়। দুরকমভাবে এটাকে ব্যবহার করা চলে (১) প্রতি একরে ৭টি লাগিয়ে সোজাসুজি পোকা নিয়ন্ত্রণ বা (২) প্রতি একরে ৩টি লাগিয়ে জমিতে পোকার উপস্থিতি জানা যার উঁপর ভিত্তি করে ওযুধ ছেটানো যাবে।

সবজি ও ফল রপ্তানী করতে হলে বিষাক্ত কীটনাশক ছিটানো চলে না। বিশেষ করে পাতা-সবজি, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো, মুলা, আদা, পেঁয়াজ ইত্যাদি যেগুলি কাঁচা খাওয়া হয় বা বেশি পরিমাণে শরীরের স্পর্শে আসে। এছাড়া যেখানে মৌমাছি চাষ হয় সেখানে বিষাক্ত কীটনাশকে মৌমাছি মারা পড়ে। এখনি ওষুধ বাদ দিতে না পারলেও জনগণের সচেতনতা চাষবাসে পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করবে।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মৌমাছি পালন

শ্রী জয়ন্ত দাস

ভারতীয় কৃষি ও মৌমাছি বিজ্ঞানীদের মতে পতঙ্গের দ্বারা পরাগ মিলনের প্রয়োজন আছে এমন গাছ (এনটোমোফাইলাস)-এর চাষ হয় প্রায় ৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে। এই জমির প্রায় ২০ শতাংশ ফসলের পরাগ মিলন ঘটে মৌমাছির মাধ্যমে। বেশীর ভাগ অবশিষ্ট ফুল মৌচাক অভাবে ঝরে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাই মৌমাছি চাষের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাকৃতিক সম্পদের (মধু) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে মৌমাছি মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। মৌজাত সামগ্রী কেবলমাত্র চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধক হিসাবেই কাজ করে না। মৌমাছি ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে তৃণভূমি ও বনভূমি রক্ষা করতে এবং চাষের ফলন বাড়াতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করেছে মৌমাছিদের মাধ্যমে উৎপাদিত মধু ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্যের তুলনায় ৮ থেকে ১০ গুণ লাভ হচ্ছে এদের থেকে পরাগ সংযোগের কাজ থেকে। ২০০১-২০০২ বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাড়ে ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে তৈলবীজ ও ডালশস্য চাষের এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এর সুষ্ঠু পরাগ সংযোগের জন্য হেক্টর প্রতি ৫টি মৌচাক হিসেবে ৫৫ লক্ষ মৌকলোনি প্রয়োজন ছিল। অথচ বর্তমানে বাক্সে রাখা মৌমাছি সহ প্রকৃতিতে থাকা মৌচাকের সংখ্যা আনুমানিক ৫ লক্ষের বেশি হবে না। সম্প্রতি জাতীয় কৃষি কমিশন এক সমীক্ষায় বলেছেন, আমাদের দেশে প্রত্যেক গ্রামে যদি ১০টি করে মৌমাছির বাক্স রাখার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ৭০ লক্ষ মৌ কলোনীর প্রয়োজন হবে। চাষযোগ্য জমি ও বনাঞ্চলের আয়তন অনুযায়ী এদেশে মৌমাছি পালনের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। মৌমাছি পালন শুধু যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আনে তাই নয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এর ভূমিকা অনন্য।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মৌমাছি পালকেরা যে মধু সংগ্রহ করেন তার ৩০ শতাংশ আসে সরষে ও ইউক্যালিপটাস থেকে যা শীতে জমে যায়। তাছাড়া ওই মধুর স্বাদ গন্ধ কটু হওয়ার কারণে এবং ফ্রুকটোজের তুলনায় গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি থাকায় ওই মধু আগমার্কের আওতায় আসে না। সেই কারণে মৌমাছি পালকরা ওই দানাদার মধুকে ভালো মধুর সঙ্গে বিক্রি করে থাকেন। এই অভ্যাস মৌমাছি পালনের একটি বড় সমস্যা। ওই দানাদার মধুকে বর্ষাকালে ফিডিং হিসেবে এপিস সেরানা মৌমাছির কলোনীতে ব্যবহার করলে একটি মৌচাক থেকে ৭৫০ টাকার ফিডিং (খাবার যোগান) এর বিনিময়ে ৪টি নতুন

মৌচাক উৎপন্ন করা যাবে। এই মৌচাক প্রতিটি ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করে ১৬০০ টাকা রোজগার করা যাবে। এর ফলে একদিকে অপ্রচলিত মধুর সুষ্ঠু ব্যবহার করে যেমন যে কোনও মৌপালক স্বনির্ভর হতে পারবেন তেমন অন্যদিকে ঘরে ঘরে মৌমাছি চাকের উৎপাদন বাড়ানো যাবে।

মৌমাছি পালনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সুষ্ঠুভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌমাছি পালন করলে এপিস সেরেনা প্রজাতির মৌমাছির কলোনী থেকে যে আয় হবে তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেলিফেরার থেকেও বেশি। ১টি মেলিফেরা কলোনীকে বর্ষাকালে ফিডিং হিসেবে প্রায় ৫০ কেজি চিনি খাওয়াতে হয়। ৮ টাকা দর হিসেবে যার জন্য খরচ হবে ৪০০টাকা। তাছাড়া প্রতিটি মাইগ্রেশন ক্যাম্পের জন্য খরচ হয় প্রায় ১০ হাজার টাকা। সারা বছরে এরকম ৪টি ক্যাম্প করলে খরচ হবে ৪০ হাজার টাকা। এত খরচ করে তারা মধু বা কলোনী বিক্রি করে লাভ হয়তো করে কিন্তু সামগ্রিকভাবে স্থানীয় সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে কোনওরকম ভূমিকা নিতে পারে না। অনুমানের ভিত্তিতে যদি ধরে নিই পশ্চিমবঙ্গে ২০ হাজারের কাছাকাছি মেলিফেরা মৌমাছির কলোনী আছে তাহলেও সামগ্রিকভাবে মৌপালকরা মাইগ্রেশনের জন্য ২টি বনাঞ্চল এবং একটি উদ্যানজাত ফসল লিচু ও কৃষিজ ফসল সরষের উপর নির্ভরশীল। তাহলে উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, আলু, বেগুন এই ফসলগুলোর পরাগ সংযোগের দায়িত্ব কে নেবে? এইজন্য চাষিদেরই এগিয়ে আসতে হবে এলাকাভিত্তিক এপিস সেরানা প্রজাতির মৌমাছি পালনের জন্য। মাইগ্রেশনের প্রয়োজন হয় না বলে এই মৌমাছি পালনের খরচও অনেক কম। ফিডিং হিসেবে দানাদার মধু খাওয়ালে ১ টি সেরেনা কলোনীর জন্য প্রয়োজন হয় ১৫ কেজি মধু। ৫০ টাকা কেজি হিসেবে যার জন্য খরচ হয় ৭৫০ টাকা। ওই ১ টি কলোনী থেকে বছরে ৪টি কলোনী পাওয়া যাবে। ৫০০ টাকা বর্তমান বাজার দর হিসেবে সেগুলি বিক্রি করে ২০০০ টাকা পাওয়া যাবে। তাছাড়া দুধ মধু ও ভেষজ মধু উৎপাদন করা গেলে তো বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ তো আছেই। তাছাড়া কৃষি বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, মৌমাছির মাধ্যমে পরাগ মিলন হলে ফসলের উৎপাদন ৪ গুণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

- **কোথায় গেলে মৌচাষ প্রশিক্ষণ পেতে পারেন?**

১) লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, দঃ ২৪ পরগণা।

২) সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদ, ময়ুখভবন, সল্টলেক, কলকাতা।

৩) ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন এণ্ড সার্ভিসেস্ সেন্টার,
৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কলকাতা।

৪) খাদি কমিশন, পঃ বঃ সরকার।

৫) জেলা শিল্প কেন্দ্র

- **কয়েকজন অভিজ্ঞ মৌপালকের নাম ঃ**

১) কৃষ্ণদাস মুখার্জী, উঃ ২৪ পরগণা মৌপালক সমিতি, শাসন, উঃ ২৪ পরগণা।

২) রউপ আলি নস্কর, পূর্বজটা, ২৪ পরগণা।

৩) বিমলেন্দু মণ্ডল, শাসন, উঃ ২৪ পরগণা।

৪) মহম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাদুড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা।

৫) হোসেনারা বেগম, সীতাকুণ্ডু, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা।

মধু চাষের আয়-ব্যায়ের হিসাব

ব্যয় ঃ

১ কুইঃ দানাদার দুধ মধু @৪০ টাকা/কেজি	=	৪,০০০ টাকা
৩০ কেজি গরুর দুধ @ ১৪ টাকা/কেজি	=	৪২০ টাকা
ভেষজ মধুর জন্য কুমড়ো, গাজর, বেল আমলকি ইত্যাদি ফলের খরচ	=	৫৮০ টাকা
মোট খরচ	=	৫০০০ টাকা

আয় ঃ

১৫ কেজি দুধ মধু @ ১৫০ টাকা/কেজি	=	২২৫০ টাকা
২৫ কেজি প্রাকৃতিক মধু @ ৫০ টাকা/কেজি	=	১২৫০ টাকা
১৪টি মৌ কলোনী @ ৪০০ টাকা/প্রতিটি (৮টি মৌমাছি সহ)	=	৫৬০০ টাকা
৩ কেজি ভেষজ মধু @ ২০০ টাকা/কেজি	=	৬০০ টাকা
মোট আয়	=	৯৭০০ টাকা

প্রকৃত লাভ = ৯৭০০-৫০০০ = ৪৭০০ টাকা

কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প বিষয়ক কিছু প্রকল্প ও ঋণ গ্রহণের নিয়মাবলী

কৃষি প্রকল্প যা নাবার্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং ব্যাঙ্কের ঋণদান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তা হলঃ

- ❒ সেচের জন্য পাম্পসেট ক্রয়, অগভীর নলকূপ-খনন এবং সাবমার্সিবল পাম্পসেট ক্রয়ের জন্য।
- ❒ ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার, থ্রেসার ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- ❒ গাইপালন, মুরগী পালন, শুকর পালন, ছাগল পালন ও মৎস চাষ প্রকল্প।
- ❒ ফুল বাগিচা, ফলের বাগান ও পানচাষ প্রকল্প।
- ❒ ক্ষুদ্র চা বাগান তৈরী।
- ❒ হিমঘর নির্মাণ।

এছাড়া কৃষি প্রকল্পে নবতম সংযোজন ঃ

- ❒ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য চাষযোগ্য জমি ক্রয়।
- ❒ সকল শ্রেণীর চাষী ভাইদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দ্বিচক্রযান বা মোটর বাইক ক্রয়।
- ❒ কৃষি ও পশুপালন ক্লিনিক স্থাপনের জন্য কৃষি ঋণ ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুসারে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা।
- ❒ গ্রামীণ গুদামঘর নির্মাণ।

অকৃষি প্রকল্পগুলি যা সবরকম উৎপাদন ও পরিষেবামূলক উদ্যোগের জন্য জেলা শিল্পকেন্দ্র অথবা ওয়েবকনের মতো সরকারী সংস্থা বা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন কর্তৃক তৈয়ারী ও শংসিত হয়ে থাকে, সেইসব প্রকল্পগুলি ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী সাপেক্ষে ঋণদানের জন্য মঞ্জুর করা হয়।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত কাজে এ.আর.ডি.বি ঋণ দিয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল ঃ ক্ষুদ্র পরিবহনকারীদের পরিবহন ক্রয়ে ঋণ, ক্ষুদ্র চালকল ও আধুনিক হাস্কিং মিল, তেলকল ও গমভাঙ্গার কল, গুল কয়লার কারখানা, ইটভাটা তৈরী (আধুনিক পদ্ধতি), পাথর ভাঙ্গার মিল, বরফ কল, পাউরুটি ও বিস্কুট কারখানা, মিষ্টির দোকান, চানাচুর তৈরীর কারখানা, জামাকাপড় তৈরীর কারখানা, ব্যাটারী তৈরী, বিজলীবাতির ফিলামেন্ট তৈরী, জুতোর কারখানা, কাপড় কাঁচার সাবান তৈরী, চটের বস্তা তৈরী, রূপোর গয়না তৈরী, কাঠের

আসবাব পত্র তৈরী, টালি তৈরী, হোটেল ও রেঁস্তোরা, হাতে চলা তাঁত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত, জরির কাজ, গাড়ি মেরামতির কারখানা, গাড়ির ডালা ও অবয়ব তৈরী, পলিব্যাগ তৈরী, প্লাস্টিক দ্রব্য ও পিভিসি পাইপ তৈরী, দুগ্ধ পরিবহনের জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ক্রয়, ছাপাখানা স্থাপন, এম্ব্রয়ডারীর কাজ ও উলবোনা, নার্সিংহোম স্থাপন. সুতো রং করা, ফিস্ট্রলার রিপিয়ারিং ও সার্ভিসিং এর জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ডক স্থাপন ইত্যাদি।

ঋণদানের নিয়মাবলী ঃ

- ❒ ঋণ গ্রহণের আবেদনপত্র আমাদের সদস্য ব্যাঙ্কগুলির কার্যালয়ে এবং দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব শাখা অফিসে পাওয়া যায়।
- ❒ ঋণের আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রকল্পের বিবরণ, পঞ্চায়েতের প্রশংসাপত্র, রেশন কার্ডের ফোটোকপি, প্রস্তাবিত সিকিউরিটি যেমন জমি বা বাড়ির খতিয়ান বা দলিল জমা দিতে হবে। অন্যান্য সিকিউরিটি যথা ফিক্সড্ ডিপোজিট (স্থায়ী আমানত), এন.এস.সি., কে.ভি.পি বা এল.আই.সি. পলিসির ক্ষেত্রে মূল সার্টিফিকেট ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখতে হবে। চাকুরীজীবি আবেদনকারীদের ওয়েষ্ট বেঙ্গল কোঃ অপঃ আইনের ১৯৮৩ এর ধারা ৫৮ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারপত্র দাখিল করতে হবে।
- ❒ ঋণের সমপরিমাণ জামিন (সিকিউরিটি) হিসেবে প্রস্তাবিত বন্ধকী জমির ব্যাঙ্ক নির্ধারিত মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ এবং বন্ধকীকৃত বাড়ির ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ভাগ ঋণ হিসেবে মঞ্জুর করা যায়। প্রস্তাবিত শিল্পে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের শতকরা ৬৫ ভাগ ঋণের সিকিউরিটি হিসেবে মূল্যায়ন শতকরা ৬৫ শতাংশ সিকিউরিটি হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া স্থায়ী আমানতের বা এন.এস.সি., কে.ভি.পি-র ক্রয়মূল্যের শতকরা ৮৫ শতাংশ এবং এল.আই.সি. পলিসির ক্ষেত্রে জমা দেওয়া প্রিমিয়ামের শতকরা ৮৫ শতাংশ প্রস্তাবিত ঋণের সিকিউরিটি হিসেবে নেওয়া হয়। এছাড়া সরকারী, আধাসরকারী বা স্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিও প্রস্তাবিত ঋণের জামিনদার হতে পারেন।

এছাড়া ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার বেশি হলে ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী স্থায়ী আমানত রাখা বাধ্যতামূলক।

- ❒ প্রকল্প অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়।
- ❒ সুদের হার (সকল) বিস্তারিতভাবে নীচে দেওয়া হল ঃ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে ঋণের

পরিমাণ ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত — ১১% এবং তদুর্দ্ধে ১২%।

অন্যান্য কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে সুদের হার ঃ

ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	**বর্তমান সুদের হার**
২৫,০০০	১১%
২৫,০০১ - ২,০০,০০০	১২%
২,০০,০০০ ও তদুর্দ্ধে	১৩%

❒ ঋণ পেতে হলে আবেদনকারীকে প্রস্তাবিত ঋণের শতকরা ১ ভাগ তদন্ত ফি এবং ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী উকিলের ফি, সার্চ্চ ফি, শেয়ারের মূল্য ইত্যাদি জমা দিতে হবে। এছাড়া রয়েছে বিশেষ কিছু প্রকল্প যেমন বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প। এই প্রকল্পের "আত্মমর্য্যাদা" ও "আত্মসম্মান" প্রকল্পগুলি যথাক্রমে শহরের একক বা যৌথভাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের শিক্ষিত বেকার যুবক বা যুবতীদের জন্য রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে অনুমোদিত। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি শিল্পস্থাপন বা পরিষেবামূলক কাজে প্রকল্প ব্যয় সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা হিসেবে ধার্য্য করা হয়।

প্রকল্পের ১০ ভাগ আবেদনকারীর, ১৫ ভাগ সরকারী অনুদান এবং ৭৫ ভাগ ব্যাঙ্ক ঋণ। আবেদনকারীর পরিবারের আয় সুনির্দিষ্ট সীমারেখার নীচে হতে হবে।

বিঃ দ্রঃ — প্রকল্প বিশেষে ব্যাঙ্কের অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য, বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য আমাদের শাখা অফিস ও সহযোগী এ.আর.ডি.বি. (এগ্রিকালচারাল রুরাল ডেভলপ্‌মেন্ট ব্যাঙ্ক) গুলির জেলা বা মহকুমাস্তরের কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

গ্রামীণ গুদামঘর প্রকল্প ঃ

কৃষকভাইদের উৎপাদিত ফসল বিজ্ঞানসম্মতভাবে মজুত করবার জন্য ব্যাঙ্ক এই প্রকল্প চালু করেছে। চাষীভাইরা তাদের নিজেদের উঁচু জমিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে গুদামঘর নির্মাণ, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন। গুদামের আকার সর্বনিম্ন ১০০ মেট্রিক টন অথবা ইহার গুণিতক অনুযায়ী হবে। এই প্রকল্পের জন্য তপশীল জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে ঋণের ৩৩ শতাংশ ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ অনুদান হিস্াবে সর্বাধিক ৩৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। প্রকল্পের বাকী অংশ ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে গণ্য করা হবে। সুদের হার ঋণের ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ১১ শতাংশ এবং তদুর্দ্ধে ১২ শতাংশ। ঋণ ১১ বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

চাষযোগ্য কৃষিজমি ক্রয় প্রকল্প ঃ

রাজ্যের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বর্গাদার ও ভাগচাষী ভাইরা এই প্রকল্পের অধীনে চাষযুক্ত অথবা পতিত জমি ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারবেন। জমির উপযুক্ত কাগজপত্রসহ চাষীভাইরা এ ব্যাপারে নিকটবর্তী ব্যাঙ্কের শাখার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই প্রকল্পের সুদের হার ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ১১ শতাংশ এবং তদুর্দ্ধে ১৩ শতাংশ। জমির মূল্যের ৭৫ শতাংশ ঋণ হিসাবে ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে এবং অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ গ্রাহককে নিজের তহবিল থেকে জমি কেনার জন্য ব্যয় করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১০ বৎসর।

মোটর বাইক প্রকল্প ঃ

গ্রামে উৎপাদিত ফসলকে নিকটবর্ত্তী বাজারে পণ্যজাত করা ও কৃষিকাজে বিভিন্নরকম যোগাযোগের জন্য, কৃষক ভাইদের মোটর বাইক ক্রয়ের জন্য এক নতুন প্রকল্প ব্যাঙ্ক গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায়, মোটর বাইকের মূল্যের সর্বাধিক ৭৫ শতাংশ ঋণ হিসাবে পাওয়া যাবে। বাকী ২৫ শতাংশ ঋণের সর্বাধিক পরিমাণের উপর ১১ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ হবে এবং এই ঋণ পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

কৃষি শুশ্রুষা কেন্দ্র (Agri-Clinic) এবং কৃষি ভিত্তিক ব্যবসা কেন্দ্র (Agri-Business Centre) ঃ

এই প্রকল্পের আওতায় যে সব স্কীম আছে তা কৃষি স্নাতক বা প্রাণীবিদ্যা স্নাতকদের জন্য খুবই উপযোগী এবং সহজেই এদের ব্যবসা করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। আমাদের ব্যাঙ্ক এই সব প্রকল্পে ঋণ দিয়ে এদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সাহায্য করছে। নীচে কয়েকটি প্রকল্প-এর মোট খরচ ও তার ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হল ঃ—

(ক) জল ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত নানা সামগ্রীর পরীক্ষাকেন্দ্র —
খরচ ঃ ৫,২৩,৫০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ ঃ ৪,৩১,৫০০ টাঃ।

(খ) শস্যের রোগ পোকা দমনের জন্য সেবাকেন্দ্র —
খরচ ঃ ৬,৭৫,০০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ ঃ ৫,৭৩,৮০০ টাঃ।

(গ) ফল ও ফুল চাষের জন্য শুশ্রুষা কেন্দ্র ও ব্যবসা কেন্দ্র —
খরচ ঃ ৩,২৬,৫০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ ঃ ২,৭৭,১০০ টাঃ।

(ঘ) কৃষি সেবা কেন্দ্র (কৃষি যন্ত্রপাতি) —

খরচ : ৬,৫৬,৪০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ : ৫,৫৮,০০০ টাঃ।

(ঙ) পশু চিকিৎসা কেন্দ্র —

খরচ : ১,৪৬,০০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ : ১,৩১,০০০ টাঃ।

(চ) পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ও পশুখাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্র —

খরচ : ২,০০,০০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ : ১,৮০,০০০ টাঃ।

(ছ) পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ও ছোট দুগ্ধ প্রকল্প —

খরচ : ৩,৩০,০০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ : ২,৯৭,০০০ টাঃ।

(জ) মৎস প্রজনন কেন্দ্র ও তাহার সম্প্রসারণ —

খরচ : ৬,০৩,৮৫০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ : ৫,৪৩,০০০ টাঃ।

(ঝ) কৃষি সার তৈয়ারী প্রকল্প —

খরচ : ৪,২১,০০০ টাঃ; ব্যাঙ্কঋণ : ৩,৩৬,০০০ টাঃ।

মাটি ও ফসলের প্রকৃত বন্ধু অ্যাজোফস্ ও রাইজোফস্ এর ব্যবহারে চাষ হয়ে ওঠে দীর্ঘস্থায়ী ও লাভজনক

সকলেই জানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের দাম ক্রমে চাষীভাইদেরর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পোকা ও কীটের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় তাদের দমনে সমস্যা বাড়ছে। এই সমস্যা সমাধানে রয়েছে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সহজলভ্য জীবানুসার অ্যাজোফস্ ও রাইজোফস্।

জীবানুসার কি ঃ কয়েক প্রকার জীবানু পরিবেশে স্বাধীনভাবে বা শুটি জাতীয় গাছের শিকড়ে গুটি তৈরীর মাধ্যমে নাইট্রোজেনঘটিত উদ্ভিদখাদ্য যোগান দেয়। এদেরই সাধারণতঃ জীবানুসার বলে। কিন্তু কিছু জীবানু ফসফেটঘটিত খনিজপদার্থ থেকে ফসফরাস দ্রবীভূত করে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করে, এদেরও জীবানুসার বলে। এই জীবানুসার উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক হরমোনস্ ও ভিটামিন নিঃসৃত করে। মাটিতে জৈবপদার্থ যোগান দেয়। মাটির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখে।

জীবানুসার অ্যাজোফস্ ঃ জীবানুসার অ্যাজোফস্ একটি নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী অ্যাজোটোব্যাকটার ও ফসফেট দ্রাবক জীবানুর সংমিশ্রণে তৈরী।

জীবানুসার রাইজোফস্ ঃ জীবানুসার রাইজোফসে আছে নির্দিষ্ট প্রজাতির শিম্ব বা গুটি জাতীয় গাছের জন্য নির্দিষ্ট জীবানু।

ফসলের নাম	মাত্রা বিঘা প্রতি (প্যাকেট)	বিভিন্ন প্রণালীতে ব্যবহারে প্যাকেট সংখ্যা		
		জমিতে	স্প্রেতে	স্প্রেতে
ধান (আমন)	৩ + ১*	১	১	১
ধান (বোরো)	৫ + ১*	২	২	১
পাট, ভুট্টা, গম, তৈলবীজ	৩	১	১	১
আলু, পান	৬	২	২	২
লঙ্কা, ঢেঁড়স, কপি, পালং, শসা, পটল	৪	২	২	২
আখ, তামাক	৫	২	২	২
পান, তুঁত	৫ - ৯	২ প্যাকেট বৎসরে ১বার প্রতিবার ফসল তোলার পর ১ প্যাকেট স্প্রে		

* চারা রোয়া করার আগে ১ প্যাকেট অ্যাজোফস জলে গুলে ধান চারার শেকড়ের অংশ তার মধ্যে ডুবিয়ে নিন।

অ্যাজোফস ব্যবহারে সতর্কতা ঃ

১) অ্যাজোফস ও অন্য রাসায়নিক সার একসঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত নায়। ২) অ্যাজোফস প্যাকেট সূর্যালোক থেকে দূরে রাখা দরকার। ৩) একবার প্যাকেট খুলে সেই প্যাকেটের জীবাণুসার পুরোটাই ব্যবহার করে ফেলতে হবে। ৪) প্যাকেটের উপর উল্লিখিত আয়ুস্কালের মধ্যে অ্যাজোফস ব্যাবহার করতে হবে।

প্রস্তুতকারক
পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, ৮ম তল
কলিকাতা - ৭০০ ০১৩, ফোন : ২২৩৭-০০৬০
২২৩৭-০০৬১/২২৩৬-৫২০২

সহযোগিতা
নাইট্রোফিক্স ল্যাবরেটরিস
২৫, বাঁশদ্রোণী এ্যাভিনিউ
কলিকাতা - ৭০০ ০৭০
ফোন - ২৪৭১-৮৪৮৬

কৃষি বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা

প্রথমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ণ আধিকারিকের সাথে ব্লক অফিসে কৃষিতথ্য নিতে দেখা করুন। কাজ না হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বীজ ঃ- ১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড। ৪, গঙ্গাধর বাবু লেন, ষষ্ঠতল, কলকাতা-১২, ফোন ঃ ২২২৫-৯৩১১

কৃষিপত্রিকা ঃ- ২) 'সার সমাচার', দি ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, 'গণপতি', ৩, কবি ভারতী সরণী (লেক রোড) কলকাতা - ২৯, ফোন ঃ ২৪৬৩-৮২৫৬/৮২৫৭

সার ও ঔষধ ঃ- ৩) পশুপতি দাস এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩৭এ, এস.এন. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ১৪, ফোন ঃ ২২৪৪ ৪৩৮২

হাইব্রীড বীজ ঃ- ৪) ইন্দোআমেরিকান এক্সপোর্টস। ২ সি, শিভম্ চেম্বারস্, ৫৩, সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলকাতা - ১৯, ফোন ঃ ২২৮১ ৪৮২২

৫) মহারাষ্ট্র হাইব্রীড সীডস্ কোঃ লিঃ। ১০৪ সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-২০, ফোন ঃ ২৪৭৪ ৯০৫০

৬) সাটনস্ এণ্ড সন্স (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ। ১৩ ডি, রাসেলস্ স্ট্রীট, কলকাতা-৭১, ফোন ঃ ২২২৬ ৪৯৩০

৭) বাকরা সীড স্টোর্স, বাকরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, ফোন ঃ ২৪৯৩ ৯৩২৫/৫৯, আমতলা শাখা - ২৮৭০৯০৩

বীজ, হর্মোন ও কৃষি উপকরণ ঃ- ৭) পশ্চিমবঙ্গ ফার্মসিউটিক্যালস এণ্ড ফাইটোক্যামিক্যালস কর্পোরেশন, ইল্লাকো হাউস, ১ ও ৩ ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা - ১

ফুল গাছ/বাহারী গাছের নার্শারী ঃ- ৮) অভয়া নার্শারী, উমেদপুর, চাউলখোলা, বজবজ ২নং ব্লক, ফোন ঃ ২৪৭০ ০১৫৩

৯) পরমানন্দ নার্শারী, মুচিশা, বজবজ ২নং ব্লক

সবুজ গোখাদ্য ঃ- ১০) গোখাদ্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, তৃণভূমি ও গোখাদ্য গবেষণা কেন্দ্র, গয়েশপুর, নদীয়া

১১) কৃষিবিদ, শালবনী গোখাদ্য খামার, পোঃ শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর

পুষ্প সমিতি ঃ-

১২) দি এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, ১ আলিপুর রোড, কলকাতা-২৭

১৩) বেঙ্গল রোজ সোসাইটি. ৭, এসপ্ল্যানেড পূর্ব, কলকাতা-৬৯

ফল ও সবজি সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ- ১৪) কম্যুনিটি ক্যানিং, সেন্টার, ২৪ কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪

মাটি, বীজ ও সার পরীক্ষাগার ঃ- ১৫) ২৩০এ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৪০

কীটনাশক পরীক্ষাগার ঃ- ১৬) স্টেট পেস্টিসাইডস্ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, আবাস, কৃষি ভবন, পোঃ - মেদিনীপুর, জেলা - পঃমেদিনীপুর।

স্বউপার্জন ও স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যম নিবিড় মৎস্যচাষ

ডঃ অজয় কুমার ঘোষ

প্রাক্তন অধিকর্তা, কেন্দ্রীয় অর্ন্তদেশীয় মৎস্য গবেষনা সংস্থা

মৎস্য ভগবানের দশাতবতারের অন্যতম অবতার। সেই মাছ জলে বাস করে ও জল ছাড়া সে বাঁচেনা। বাঙালীর পুষ্টি, কৃষ্টি, নিত্য সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় যদি তার দৃষ্টি মাছ থেকে সরে যায়।

মৎস্য ক্ষুধার বিশাল পরিমান সারা ভারতের মধ্যে কলকাতা মহানগরী ছাড়া আর কারো নেই। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি মহানগরী সমূহেও মৎস্য চাহিদার পরিমান কম নয়। কলকাতা মহানগরীতে মৎস্য ও ডিমের কাটতি প্রচুর হলেও এখানকার বাসিন্দাদের কাছে মাংস ও ডিমের তুলনায় মাছের প্রতি আকর্ষনই সর্বাধিক। মাছ বিক্রয়ের সবচেয়ে বড় বাজার এই কলকাতা। তাই ভারতের সকল রাজ্যেই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা ছিল কলকাতা।

জলের ফসল মাছ, মনুষ্য সমাজকে দেহ পুষ্টির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জান্তব প্রোটিন জোগান দেয়। তার মধ্যে দেশের অভন্ত্যরের ঘেরা জলাশয়গুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যেই অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং তা চাষীদের পক্ষে সহজ নিয়ন্ত্রনসাধ্য। সে কারনে সব দেশেই বদ্ধ জলাশয়ে মাছের চাষ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর পড়েছে বহুদিন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা দ্রুতবর্ধনশীল বা উচ্চফলনশীল জাতের চাষযোগ্য মাছের বীজের জন্য চাষীদের পরনির্ভরতা। মিষ্টি জলের আবাদী জলকরের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত চাষযোগ্য মাছ রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প প্রভৃতি এদেশী ও বিদেশী পোনা মাছ। পুকুরের জলে ওরা কেউই প্রজনন করে না, প্রজনন করে মিষ্টি জলের নদীতে মাছ চাষীদের ফার্ম বা আবাদী জলাশয় থেকে বহু দূরে নদী থেকে এসব মাছের ডিমপোনা সংগৃহীত হয় এক শ্রেণীর জেলেদের জালে। তারপর তা বিক্রি হয় ডিমপোনার পাইকারী বাজারে। সেখান থেকে তা চালান যায় নার্শারী এবং পালকদের পুকুরের বড় আকারের চারা পোনা রূপে গড়ে ওঠার উদ্দেশ্যে। কাজেই নদী থেকে সংগৃহীত মাছের ডিমপোনা শেষ পর্যন্ত আবাদী জলাশয় এসে পৌঁছায় ৩ - ৪ শ্রেণীর হাত ঘুরে। প্রকৃত মাছচাষী চাষ তাদের জলাশয় মাছের ফসলের পরিমান বাড়িয়ে এবং চাষের খরচ কমিয়ে লাভের পরিমান বাড়তে। এক্ষেত্রে মৎস্যবীজের উৎকর্ষতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কোন কোন মাছের চারা - পোনায় তাদের দেহের ওজন বৃদ্ধি দ্রুত তালে বাড়ে, আবার কোন কোন মাছের

চারা পোনার গ্রোথ রেট, যথেষ্ট কম এই সব মাছের চারা পোনা কেনার সময় বোঝা যায় না - চাষ করতে করতে পরে বোঝা যায় কেননা ওসব ব্যাপার ফলের পরিচয়তে মাছ চাষীদের এই পরনির্ভরতা দূর করার জন্য মৎস্যবিজ্ঞানী সমাজে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অর্ন্তদেশীয় মৎস্য গবেষনা সংস্থা বহুদিন ধরেই সচেতন, কেননা এ ব্যাপারে মাছচাষীদের সাহায্য করলে মৎস্যবীজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম সফল মৎস্যবিজ্ঞানী আর্জেন্টিনার ডঃ বি. এ. হাউসে ১৯৩০ সালে সাফল্যলাভ ঘটান। প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছকে পিটুটারী হর্মোন ইনজেকশন দিয়ে পুকুরের জলে তাদের প্রজনন করানোর পদ্ধতিই মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বা প্ররোচিত প্রজনন বা প্রনোদিত পদ্ধতি নামে পরিচিত। পরে ১৯৩৪ সালে ব্রাজিল, ১৯৩৭ সালে রাশিয়া, ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৫ সালে লালচীন, ১৯৫৭ সালে ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র সমূহে ঐ গবেষনায় সাফল্য হয়। ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রনালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় অর্ন্তদেশীয় মৎস্য গবেষনা সংস্থার মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ হীরালাল চৌধুরী, রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি এদেশী পোনা মাছের প্রনোদিত প্রজননে ১৯৫৭ সালে সফল হন। মোট কথা মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির সাহায্যে সকল মাছচাষীকে যতি তাদের আবাদী জলাশয়ের উৎকৃষ্ট বড় মাছদের হর্মোন ইনজেকশান প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের ফার্মে প্রজনন করিয়ে উৎকৃষ্ট জাতের ডিম পোনা উৎপাদন করিয়ে নেয় তবে রাজ্যে মৎস্যবীজের কনামাত্র ঘাটতি থাকেনা। তাছাড়া মৎস্যবীজের উৎকর্ষের অবনতি ঘটতে পারে না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দৌলতে ভারতের সর্বত্র জনগনের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, খাদ্য রুচি পাল্টেছে। সেইজন্য সকল রাজ্যে মাছের চাহিদা বেড়েছে এবং সে কারনে কলকাতার বিকল্প মাছের বাজার আয়তনে কলকাতার মত না হলেও সংখ্যায় অনেক (ছোট ও মাঝারি শহরে) বেড়ে গেছে। তাছাড়া আরব দুনিয়ায় কম কাঁটা যুক্ত মাছের চালান বেড়েছে যেখানে মাছের দাম অত্যন্ত চড়া বলে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্নাটক, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমান মাছ রপ্তানী হচ্ছে। তাছাড়া, বাগদা চিংড়ী রপ্তানী হচ্ছে পৃথিবীর বহু সংখ্যক রাষ্ট্রে। কাজেই সারা ভারতে মাছ উৎপাদনের পরিমান বহু লাংশে বৃদ্ধি পেলেও সেই বর্ধিত পরিমান উৎপাদনের কনামাত্র কলকাতায় চালান আসবে না।

পশ্চিমবঙ্গ জলসম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যের সমস্ত পুকুরের আয়তন মিলিয়ে মোট ২ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর আয়তনের পুকুর আছে। এই সমস্ত পুকুরে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মাছ চাষ করলে বছরে হেক্টর প্রতি ৪০০০ - ৬০০০ কিলোগ্রাম মাছ অনায়াসে উৎপাদন সম্ভবপর, সেই সঙ্গে দেশের মাছের চাহিদা পূরন, এ ছাড়া গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছ চাষ করে সাফল্য লাভকরতে হলে কয়েকটি বিষয়ের উপর মাছ চাষীদের সাম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। যথা ঃ পুকুরের জল ও মাটির অবস্থা, চাষযোগ্য পোনা মছের স্বভাব ও খাদ্যাভাস; পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য, পুকুরে পরিবেশিত পরিপুরক খাদ্য সম্পর্কে, পুকুরে চুনের ব্যবহার, পুকুরে সারের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার, মাছ চাষের বিভিন্ন প্রকার পুকুরে কিভাবে মাছ চাষ করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান, মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার এবং সর্বশেষে মাছ চাষের লাভ এবং লোকসানের ক্ষতিয়ান।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাছের সঙ্গে গৃহপালিত পশুপক্ষি যেমন হাঁস, শূকর প্রভৃতির পালন করে তাদের বজ্যপদার্থকে পুকুরে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে সুসংহত মৎস্য চাষ বলে। শুধুমাত্র মাছচাষে সারাবছর যা খরচ হয় তা ৬০ শতাংশ মাছের খাদ্য ও সারে ব্যয় হয়। কিন্তু মাছের সঙ্গে এই সমস্ত পশুপক্ষী পালন করলে তাদের দ্বারা সৃষ্ট বজ্যপদার্থ পুকুরে প্রয়োগ করলে তা জৈব সারের কাজ করে। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যকনার বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে থাকা অপাচ্য খাদ্যকনাও মাছ ভক্ষণ করে। তাই এই ধরনের মিশ্র চাষে রাসায়নিক সার ও পরিপূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয় না বলে আর্থিক দিক থেকে চাষী লাভবান হতে পারে। সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগীর ডিম ও মাংস এবং পরিনত শূকর বিক্রি করেও চাষীর আর্থিক স্বচ্ছলতার উন্নতি হয়।

একই খামারে (১) মাছ চাষ ও হাঁস এবং মুরগী পালনের ফলে মাছ চাষের উপকার : (ক) হাঁসের এবং মুরগীর মল পুকুরে সরাসরি ব্যবহারের ফলে ইহা জৈব সারের কাজ করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যকনার সংখ্যাবৃদ্ধি করে। তাই মাছ চাষের জন্য কোন সার প্রয়োগ করতে হয় না। (খ) মাছের পক্ষে ক্ষতিকর জলজ উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গহাঁস ও মুরগী খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ঠিক রাখে।

(২) মাছ চাষের ফলে হাঁসের এবং মুরগীর উপকার ঃ- (ক) হাঁসের এবং মুরগী থাকার ঘরের জন্য পুকুর পাড়ে প্রয়োজনীয় জায়গা থাকে তাই হাঁসের জন্য অন্য কোথাও জায়গা সংগ্রহ করতে হয় না। (খ) হাঁস মুক্তভাবে পুকুরে ঘোরাফেরা করার জায়গা পায় এবং পুকুর থেকে তাদের প্রাকৃতিক খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। পুকুরে এ ভাবে ঘোরাফেরার জন্য তাদের ব্যায়াম হয় এবং তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। (গ) মাছের উপজাতবস্তু অর্থাৎ ফিস মিল হাঁসের এবং মুরগীর পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) মাছ ও শূকর পালনের যৌথ খামারের বছরে দুবার বিক্রয়যোগ্য শূকর ও একবার মাছের ফলন পাওয়া যায়। শূকরের মল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেমন সাহায্য করে

তেমনি পুকুরে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত জলজ উদ্ভিদ যেমন কচুরী পানা, টোপাপানা, ক্ষুদে পানা, অ্যাজোলা প্রভৃতি এবং পুকুর পাড়ের ঘাস শূকরের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ সূত্রে জানা যায় একটি শূকর বছরে ৫০০ - ৬০০ কেজি মল ত্যাগ করে, তাই এক হেক্টর পুকুরের জন্য ৩০ - ৪০ টি শূকর পালন করলে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার ও খাদ্যের যোগানের সমস্যা মিটে যায়। শূকরের তাড়াতাড়ি বৃদ্ধির জন্য বাজারে প্রাপ্ত শূকরের খাদ্য প্রত্যহ প্রতি শূকরকে ১ কেজি করে খাওয়াতে হবে। শূকর পালনের জন্য এই খরচ শূকরের মাংস বিক্রি করে পুষিয়ে যায়।

সুসংহত মৎস্য চাষের উৎপাদন ঃ—

মাছ চাষের সঙ্গে হাঁস পালনে উৎপাদন ঃ—

প্রতি হাঁস প্রত্যেকদিন ১২৫-১৫০ গ্রাম মলত্যাগ করে। এক হেক্টর পুকুরে ২০০-৩০০ টি হাঁস দরকার যারা বছরে ১০,০০০-১৫,০০০ কেজি মলত্যাগ করে, যা চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে মাছ চাষের খরচ কমায়। মাছ ছাড়ার ৪ মাস পরে জালের সাহায্যে বড় বড় মাছ ধরে পুনরায় চারাপোনা ছাড়তে হবে। ১২ মাস পরে পুরো মাছ ধরে নিতে হবে। ভালো ভাবে পরিচর্যা পেলে পরিপূরক খাদ্য না দিয়েও বছরে প্রতি হেক্টর-এ ৩৫০০-৪০০০ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া প্রতি হাঁস থেকে বছরে প্রায় ২৭৫-৩০০টি ডিম এবং ২.০-২.৫ কেজি মাংস পাওয়া যায়।

মাছ চাষের সঙ্গে মুরগী পালনে উৎপাদন ঃ—

মাছ ছাড়ার ৪ মাস পর বড় বড় মাছ ধরে নিয়ে সমসংখ্যক মাছ পুকুরে ছাড়তে পারলে ভাল। এক বছর পর পুরো মাছ ধরে নিতে হয়। এই মুরগীর সঙ্গে মাছ চাষের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি ৪০০০-৫০০০ কেজি মাছের উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া মুরগী থেকে ৭০০০০ ডিম এবং ১০০০ কেজি মুরগীর মাংস পাওয়া যাবে।

মাছ চাষের সঙ্গে শূকর পালনে উৎপাদন ঃ—

দুমাস বয়সের শূকর ছানা ছয় মাসেই ৬০-৭০ কেজি ওজনের শূকরে পরিণত হয় এবং এই সময়ে এদের বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে অর্থাৎ বছরে দু বার শূকর পালন করা যাবে। হাঁসের এবং মুরগীর সঙ্গে মাছ চাষের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শূকরের খামারে সঙেগ মাছ চাষ করে বছরে ৪০০০-৪৫০০ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব।

মৎস্যচাষ শিল্প লাভজনক করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে মজুদ মাছ যেন রোগগ্রস্ত না হয়। কারণ রুগ্ন মাছের চাহিদা ও দাম কমে যেতে বাধ্য ও রোগের জন্যে মাছের মড়ক হওয়াও অসম্ভব নয়। যদিও মাছ ও তার রোগের জীবানু একই পরিবেশেই থাকে অর্থাৎ যে জলে মাছ বাড়ে সেই জলেই মাছের রোগের জীবানুরাও বসবাস করে, কিন্তু সাধারণতঃ মাছ রোগের প্রকোপে পড়ে না, মাছ দুর্বল হলে, তার পরিবেশ দূষিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশে মাছের রোগের জীবানুরা দ্রুত বংশ বিস্তার করলেই মাছের রোগ হয়। পরিবেশ দূষিত হওয়া ছাড়াও মাছ অনেক সময় মারা যায় পরিচালনায় ত্রুটির জন্য। অথবা পরশ্রীকাতরতার জন্য। মৎস্য শিল্প স্থাপনের আগে শেযোক্ত দুটি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থার ব্যাপারে সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেযে জানাই যে, উন্নতপ্রথার মাছ চাষ শিল্পে যে টাকা বিনিয়োগ করা যায়, তা মাত্র এক বছরেই দ্বিগুণ থেকে চর্তুগুণ হয়ে ফিরে আসতে পারে। এবং স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা সার্থক হতে পারে।

Intensive Fish Farming for Income generation and self employment

Dr. Ajay Kumar Ghosh
Former Director, Central Inland Capture
Fisheries Research Institute

মধ্যম শিক্ষিতের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প - মাছের ডিমপোনা উৎপাদন

ডঃ কামাখ্যাপদ বিশ্বাস

গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হ'ল কৃষি। মাছ চাষও কৃষির অন্তর্ভূক্ত। মাটির উৎপাদনের ক্ষমতার চেয়ে জলের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশী ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক। এখন অর্ন্তদেশীয় মৎস্য উৎপাদনে গোটা ভারতের প্রায় শতকরা চল্লিশভাগ মাছই পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন হয়। ভাল উৎপাদনের জন্য চাই ভাল মৎস্য বীজ। অর্থাৎ ডিম পোনা। অধিক উৎপাদন সম্পন্ন কার্প জাতীয় মাছ, অর্থাৎ রুই, কাত্‌লা ও মৃগেলের সর্বভারতীয় চাযের জন্য প্রয়োজনীয় চারা পোনার আশি শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষীরা উৎপাদন করে থাকে। ভাল চারা পোনা উৎপন্ন করতে চাই ভাল ডিম পোনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতমানের ডিম পোনা উৎপাদনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে পিটুইটারী ইন্‌জেকশনের দ্বারা দেশী কার্প, অর্থাৎ রুই, কাতলা ও মৃগেল জাতীয় মাছের বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন ও ডিম পোনা উৎপাদন গ্রামীণ এলাকায় প্রযুক্তিবিদরা করে থাকে বর্ষাকালে।

কিন্তু এই উৎপাদনের পরিমান চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ভারত সরকারের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে দেশে বর্ত্তমানে রুই, কাতলা ও মৃগেলের চারা পোনার উৎপাদন চাহিদার ৫০ শতাংশ মাত্র। ২০০৩ সালে এই রুই কাতলা ও মৃগেলের ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা চারাপোনার চাহিদা হবে প্রায় ৩০০০ কোটি। এই পরিমান চারাপোনা উৎপাদনের জন্য প্রায় ৩০০০০ কোটি ডিম পোনা উৎপন্ন করা প্রয়োজন। এবং তা একমাত্র সম্ভব হবে গ্রামীণ এলাকায় মধ্যম শিক্ষিত যুবকেরা যদি আধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বন করে। পিটুইটারী ইন্‌জেকশনের সাহায্যে বদ্ধ জলাশয়ে, রুই, কাতলা ও মৃগেলের প্রজনন করিয়ে ও গোলাকার হ্যাচিং শুলে ডিম ফুটিয়ে, ডিম পোনা উৎপাদন করে।

কি লাগবে ডিম পোনা উৎপাদন করতে

(১) ডিমওয়ালা জ্যান্ত মাছ — আজকাল গ্রামে ডিমওয়ালা কাত্‌লা, রুই ও মৃগেল মাছ কিনতে পাওয়া যায় ডিম ফোটানোর জন্য। স্বল্পমূল্যে ডিম ফোটানোর পর (ফেরৎযোগ) ১১/২ থেকে ২১/২ কেজি ওজনের মাছকে ডিম ফোটানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।

(২) ব্রীডিং হাপা — নাইলনের মশারী তৈরী করানো বা কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন মাপের। এই হাপাতে ইন্‌জেকশন দিয়ে মাছের প্রজনন করা যায় অনায়াসে।

(৩) গোলাকার হ্যাচিং পুল — ইটের গাথ্‌নি দিয়ে ২ মিটার ব্যাসের ও দুই মিটার উচ্চতার হ্যাচিং পুলে চক্রাকারে জলের প্রবাহের ব্যবস্থা করে নিষিক্ত মাছের ডিম ফোটানো যায় তিন দিনে।

(৪) জলাধার — আট ফুট উচ্চতায় জলাধারের ব্যবস্থা করতে হয়। হ্যাচিং পুলে জল প্রবাহের জন্য। চক্রাকারে জল প্রবাহের জন্য হ্যাচিং পুলের ভিতরে দেওয়ালের গায় ৪৫ ডিগ্রি *angle* এ জলের পাইপের মুখে *duck mouth* লাগিয়ে জল প্রবাহের ব্যবস্থা করতে হয়। হ্যাচিং পুলের মধ্যভাগে ১.৮ মিটার উচ্চতার পাইপ দিয়ে বাড়তি জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয় মশারী কাপড়ের ছাকনির মাধ্যমে।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির ব্যবস্থা করতে হয়। এই সব জিনিষ সহজলভ্য ও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

(ক) পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড - ১০০ মিলিগ্রাম

(খ) ইনজেক্‌শনের সিরিঞ্জ ও সূঁচ - ৫ মিলি./২০ নম্বর।

(গ) ডিষ্টিল্ড ওয়াটার - ১০০ মিলি.

(ঘ) হোমজিনাইজার - ১০ মিলি.

(ঙ) মাছ ওজনের স্প্রীং ব্যালেন্স - ৫ কেজি

(চ) হ্যাণ্ড নেট - ৬ টা

(ছ) ১৪ লিটার প্লাষ্টিকের বালতি - ১ টা

(জ) ১ লিটার প্লাষ্টিকের মগ - ১ টা

প্রজননের জন্য মৎস্য নির্বাচন

রুই, কাতলা ও মৃগেলের প্রজননের সাফল্য নির্ভর স্ত্রী ও পুরুষ মাছ নির্বাচনের উপর। পরিপক্ক পুরুষ মাছের পেটের নীচের দিকে সামান্য চাপ দিলে দুধের মত সাদা *milt* বের হবে। আর পরিপক্ক স্ত্রী মাছের পেটের দিক নরম, গোলাকার ও ফোলা থাকবে ডিমের ভারে।

প্রজননের প্রযুক্তি

বর্ষাকালে পুকুরের জলের তাপমান ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম হলে, পুকুরের জলে চারটে বাঁশের খুটির সাহায্যে নাইলনের ব্রীডিং হাপা এমনভাবে টানিয়ে দিতে হয়ে, যাতে

হাপার দুই-তৃতীয়াংশ জলের নীচে, পুকুরের তলার মাটীর থেকে ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি উপরে থাকে। নির্বাচিত স্ত্রী ও পুরুষ মাছের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে স্প্রীং ব্যালেন্সে ওজন করে হ্যাণ্ড নেটে প্রত্যেকটি মাছকে আলাদা আলাদা করে জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

নির্বাচিত মাছের ওজন জানা হয়ে গেলে, ইন্‌জেকশন দেওয়ার মাত্রা *(dose)* ঠিক করতে হবে প্রত্যেকটি মাছের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে; কারণ মাত্রা নির্ভর করে মাছের পরিপক্কতা ও জলের তাপমানের উপর। প্রথমে স্ত্রীমাছকে তার শরীরের ওজনের কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ মিলিগ্রাম কেজি হিসাবে পিটুইটারী গ্ল্যান্ডের চূর্ণ দ্রবণ ইনজেকশন দিয়ে, স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে একসঙ্গে ব্রীডিং হাপায় রাখা হয়। ইন্‌জেকশন সাধারণতঃ মাছের লেজের ঠিক উপরে অথবা পিঠের পাখ্‌নার গোড়ায় দিতে হয়। সাধারণতঃ সম ওজনের স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে একসঙ্গে ইন্‌জেকশন দিয়ে ব্রীডিং হাপাতে ছাড়া হয়। কিন্তু সংখ্যার হিসাবে প্রতিটি স্ত্রী মাছের সাথে দুটি করে পুরুষ মাছ রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

একবার ইন্‌জেকশন দেওয়ার জন্য পিটুইটারী গ্ল্যান্ডের মাত্রা ঠিক হয়ে গেলে, সঠিক ওজনের গ্ল্যান্ড কাঁচের পেশাই করা টিউবে (হোমজিনাইজার) নিয়ে ভাল করে পেশাই করে প্রতি কেজি মাছের ওজনের জন্য ০.২ মিলিলিটার ডিষ্টিল্ড ওয়াটারে ভাল করে হস্তচালিত ঘূর্ণায়মান সেন্ট্রিফিউজে পাঁচ মিনিট ঘোরালে, দ্রবীভূত পিটুইটারীর ভারী আমিষ অংশ নীচে থিতিয়ে পড়বে, আর উপরে পরিষ্কার গ্ল্যান্ডের দ্রবণ পাওয়া যাবে। এই দ্রবণই মাছে ইন্‌জেক্ট করা হয়।

ইন্‌জেকশন দেওয়ার পরই পুকুরের কিনারে বাঁশের খুঁটি দিয়ে টানানো ব্রীডিং হাপার স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ইন্‌জেকশনের ৩ থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে স্ত্রী মাছ হাপার মধ্যে ডিম ছাড়ে ও পুরুষ মাছেরা *milt* হাপার জলেই *milt* এর দ্বারা ডিমগুলি নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত হওয়ামাত্র ডিমগুলির মধ্যে জল ঢুকে ফুলে যায় ও ডিমের উপরিভাগের খোল শক্ত হয় ৩ থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে। ডিমের ভিতরে মাছের ভ্রূণ (*embryo*) বড় হতে থাকে কোষ বিভাজনের দ্বারা। নিষিক্ত হওয়ার ৬ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে ডিমের ভিতরে ভ্রূণ ইষৎ বেঁকে মৌরীর দানার মত হয়। এই সময়ে ব্রীডিং হাপার থেকে ডিমগুলিকে প্লাষ্টিকের মগে মেপে বালতিতে করে হ্যাচিং পুলের জলে স্থানান্তরিত করে হ্যাচিং পুলের জলের প্রবাহ চালু করা হয়। হ্যাচিং পুলে তিন দিন অবিরাম জলের প্রবাহ চালু রাখতে হয়। মাঝে মাঝে জলাধারে পাম্পের সাহায্যে জল ভর্ত্তি করে। তিন দিনের মধ্যে হ্যাচিং পুলে ডিমের ভ্রূণের বৃদ্ধি হতে থাকে ও তিন দিন পড়ে হ্যাচিং পুল থেকে ডিম পোনা বার করে হয় আঁতুর পুকুরে পাঠাতে হয় বড় করার জন্য। নতুবা চারাপোনার চাষীদের বিক্রি করে দেওয়া যায়। যারা আঁতুর পুকুরে খাদ্য দিয়ে ডিম পোনা পালন করে মাসখানেক পড়ে চারা পোনা হিসাবে মাছের চাষীদের বিক্রি করবে।

আনুমানিক আয় ও ব্যায় ঃ

ব্যায় —

১)	ব্রীডিং হাপা ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১০০০ টাকা
২)	হ্যাচিং পুল পাইপ লাইন সমেত	৫০০০ টাকা
৩)	জলাধার (*Over head tank*)	৫০০০ টাকা
৪)	জল তোলার ও *HP* পাম্পের ভাড়া ও অন্যান্য খরচ (৪ মাসের জন্য)	৪০০০ টাকা
৫)	৪ মাসের জন্য এক জন কাজের লোক মাসে ১০০০ টাকা হিসাবে	৪০০০ টাকা
৬)	ডিমওয়ালা পরিপক্ক মাছের দাম	৩০০০ টাকা
	মোট	২২০০০ টাকা

আয় —

১০ কেজি ডিমওয়ালা মাছের থেকে ১০ লক্ষ
ডিমপোনা প্রতি সপ্তাহে, ও মাসে ৪০ লক্ষ হিসাবে
৪ মাসে ১৬০ লক্ষ ডিম থেকে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ
৮০ লক্ষ ডিম পোনা পাওয়া যায়। তার নূনতম
দাম হবে ৪০০০০ টাকা

তাহলে ৪ মাসে মোট লাভ হবে (৪০০০০ - ২২০০০) = ১৮০০০ টাকা

Self employment of less educated people through fish spawn production

Dr. K. P. Biswas

Jt. Director (Retd.), Fishery Dept., Govt. of Orissa

ভারতে মাছ চাষের বিবর্তন ও গ্রামীণ অর্থনীতি

অধ্যাপক সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মানবসভ্যতার ইতিহাসের অতি প্রাচীনকাল থেকেই মাছ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। খাদ্যগুণের দিক থেকে মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ (দশ মিলিয়ন) লোকের মৃত্যু হয় অনাহার বা অপুষ্টিজনিত রোগের কারনে। পৃথিবীর অফুরন্ত জলরাশিকে মাছ উৎপাদনের কাজে লাগালে মানুষের মৃত্যুর এই হার কে অনেকাংশে আটকানো সম্ভব হয়। ভারবর্ষের বিস্তীর্ন উপকূল ভাগ ও সমুদ্রের জলরাশি ও অর্ন্তদেশীর বিপুল জল সম্পদকে সঠিক ভাবে কাজে লাগালে অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। বর্ত্তমানে মাছের যে উৎপাদন তা থেকে বহুগুণ পরিমানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

মাছ চাষ কেন লাভজনক ? মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি?

মাছ চাষ অন্যান্য চাষ অপেক্ষা লাভ জনক কারণ —

ক) মাছ চাষ জল নির্ভরচাষ অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক *(three dimensional)* বৈশিষ্ট্যযুক্ত সহজেই জলের গভীরতাকে কাজে লাগানো সম্ভব ও একই জলাশয়ে বহুগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়াও সুসংহত মাছ চাষও লাভজনক। অর্থাৎ মাছের সঙ্গে ধান, মুরগী, হাঁস, শূকর প্রভৃতির চাষ করা যায়।

খ) বিভিন্ন মাছের প্রোটিন মূল্য ও অন্যান্য খাদ্যগুন ও বেশী। মাছের প্রোটিন সহজ পাচ্য ও বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

গ) প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য মাছ চাষ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঘ) ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস, লোহা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ মাছে পাওয়া যায়।

ঙ) মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে *A, D* এবং *B* প্রভৃতি ভিটামিন থাকে।

চ) মাছ থেকে তৈরী তেল অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মাছের যকৃত থেকে তৈরী তেলে ভিটামিন *A* ও *D* থাকে।

ছ) এছাড়াও মাছ রপ্তানীর সাহায্যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

ভারতে মাছ চাষের অতীত ও বর্তমান ঃ—

অতীতে যে কোন জলাশয়ে মাছের যে কোন প্রজাতির চাষ করা হতো। কোন বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াই মাছউৎপাদন হতো। সেকারণে উৎপাদনের পরিমান ছিল অত্যন্ত কম।

পরবর্তী কালে মাছ চাষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ধাপে ধাপে প্রয়োগ করা হয় সঠিক উৎপাদনের জন্য। মাছ চাষের বিবর্তনের ধাপ ছিল এরকম।

একক চাষ

↓

মিশ্র চাষ (তিন প্রজাতির)

↓

মিশ্র চাষ (ছয় প্রজাতির)

↓

নিবিড় মিশ্রচাষ

↓

প্রবাহমান জলে *(flowing water)* নিবিড় মিশ্র চাষ

একক চাষে কার্প জাতীয় মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন হতো কমবেশী হেক্টর প্রতি ৩০০ কিলোগ্রাম। তিন প্রজাতির মাছ চাষ (কাতলা, রুই, মৃগেল) উৎপাদন বেড়ে হল ৩০০০ কিলোগ্রাম। পরবর্ত্তীকালে বিদেশ থেকে আরও তিন প্রজাতির কার্প-আমদানী করার পর ছয় প্রজাতির (তিন ভারতীয় প্রজাতি ও তিন বিদেশী প্রজাতি) মাছ চাষ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে হল ৬০০০ - ১০০০০ কিগ্রা প্রতি হেক্টরে। মিশ্রচাষের মাছের মজুতের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে মাছচাষকে নিবিড় মাছ চাষ করা হল। ফলে মাছের উৎপাদন (কয়েক গুন বেড়ে গেল। পরবর্তীকালে নিবিড় মাছচাষ প্রবহমান জলে *(flowing water)* করার ফলে পৃথিবীর কোন কোন দেশে হেক্টর প্রতি ২৫০০০ - ৫০০০০ কিলোগ্রাম মাছ উৎপাদন সম্ভব হল।

ভারতে মাছ চাষের বৈপ্লবিক পরিবর্তন কিন্তু খুব প্রাচীন নয়। কার্পজাতীয় মাছের প্রণোদিত প্রজনন আবিষ্কারের পরই মিশ্র মাছ চাষ বৈজ্ঞানিক প্রথা মেনে করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের পর থেকেই ভারতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিপ্লব শুরু হয়েছিল। প্রয়োজনীয় অনুপাতে বিভিন্ন কার্প প্রজাতির মাছের শুদ্ধ চারা *(pure seed)* ছাড়া সম্ভব হল। পরবর্তী কালে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব -এর মতনই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরাও নীল বিপ্লব *(Blue revolution)* ভাবতে শুরু করেছিল। তবে নীল বিপ্লব যথার্থ ভাবে এখনও সম্ভব হয়নি। একমাত্র প্রবাহমান জলে নিবিড় মাছ চাষই সে বিপ্লব আনতে পারে ভারতবর্ষে।

মিশ্রমাছ চাষে উৎপাদন বেশী হয় কেন?

একই জলাশয়ে একই সময়ে একাধিক মাছের প্রজাতির চাষকে মিশ্র চাষ বলে।

মিশ্রচাষের জন্য যে মাছগুলোকে নির্বাচন করা হয় সেগুলো খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে জলাশয়ের সম্ভাব্য সব ধরণের বাসস্থান ও প্রাকৃতিক রসদ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে। এরফলে একই জলাশয়ে প্রাকৃতিক খাদ্য যে পরিমাণে পাওয়া যায় তার সফল ব্যবহারের ফলে একই জলাশয়ে একই সময়ে অনেক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়।

মিশ্র চাষের জন্য নির্ব্বাচিত বিভিন্ন মাছের বৈশিষ্ট্য ঃ

লাভজনক মাছ চাষের জন্য সঠিক প্রজাতির নির্ব্বাচন অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত মাছের প্রজাতি নির্ব্বাচন করা হয় তাদের মধ্যে নীচের বৈশিষ্ট্য গুলো থাকা প্রয়োজন।

ক) উন্নত ও দ্রুত বৃদ্ধিক্ষমতা।

খ) পরিপূরক খাদ্যবস্তু গ্রহণের ক্ষমতা।

গ) একত্রে চাষযোগ্য অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে সহ অবস্থান ক্ষমতা।

ঘ) বেশী সংখ্যায় অল্প জায়গায় থাকার ক্ষমতা।

ঙ) স্বল্প দৈর্ঘ্যের খাদ্যশৃঙ্খল যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ফলে বেশী পরিমাণে শক্তির রূপান্তর সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত মাছের প্রজাতি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র প্রাণী বা উদ্ভিদকণার উপর বা গলিত পচা জীবদেহের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন।

চ) জলের ভৌত রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা।

ছ) বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ার ক্ষমতা।

জ) উন্নত স্বাদ, সুদর্শন, বেশী বিক্রয় মূল্য যোগ্য হওয়া প্রয়োজন।

এই সমস্ত গুণের ভিত্তিকেই ভারতীয় কার্প প্রজাতির মধ্যে কাতলা, রুই ও মৃগেল আর বিদেশী কার্প প্রজাতির মধ্যে সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প-ও কমনকার্প প্রজাতি নির্ব্বাচন করা হয়। জলের উপরের স্তরে কাতলা ও সিলভার কার্প, মাঝের স্তরে রুই ও গ্রাসকার্প তবে সবচেয়ে নীচের স্তরে মৃগেল ও কমনকার্প প্রজাতি। খাদ্যাভ্যাসও প্রত্যেক মাছের আলাদা আলাদা। যেমন উপরের স্তরে কাতলা ও সিলভার কার্পের মধ্যে খাদ্যের ব্যপারে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা থাকেনা। কেন না কাতলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিকণা খায় অন্যদিকে সিলভার কার্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদকণা খায়। ফলে একই জলস্তরে থাকা সত্ত্বেও কোন রকম প্রতিযোগিতা

থাকেনা। মাছের ৩ ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে নির্ব্বাচনই জলের যে কোন স্তরের খাদ্য বস্তুকে পরিপূর্ণ ভাবে মাছের বৃদ্ধির কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

তবে বর্তমানে অধিক লাভের জন্য চার বা পাঁচ প্রজাতির মাছ চাষ চাষীদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। ভারতীয় তিনপ্রজাতির (কাতলা, রুই, মৃগেল) সঙ্গে বিদেশী কার্পের মধ্যে কমন কার্প ও কিছু পরিমাণে সিলভার কার্প ছাড়া হয়। কাতলা ২.৫, রুই ২.৫, মৃগেল ২ এবং কমনকার্প ২ এই অনুপাতে ছাড়া হয় সঙ্গে ১ ভাগ সিলভার কার্প ছাড়া যেতে পারে। কেননা অনেক সময় অতিরিক্ত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগের ফলে জলে উদ্ভিদ কণার পরিমান বৃদ্ধি ঘটে। উদ্ভিদকণা নিয়ন্ত্রনের জন্য সিলভার কার্প থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে কমন কার্প (সাইপ্রিনাস) এর বাজার খুব ভাল না থাকা সত্ত্বেও মিশ্র চাষের জন্য নেওয়া হয় কারণ কমনকার্প একমাত্র কার্প যা প্রণোদিত প্রজনন ছাড়াই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম ছাড়ে। জলের নীচের স্তরের পচা জৈব পদার্থ নিয়ন্ত্রন করে ও অন্যদিক এর পিটুইটারী গ্রন্থিকে প্রণোদিত প্রজননের কাজে লাগানো যায়। মিশ্র মাছ চাষ গ্রাসকার্পকে চাষের জন্য নির্ব্বচন করার বড় সমস্যা হল এ মাছ পুরোপুরি তৃণভোজী ফলে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতিদিন দেওয়া সমস্যার ব্যাপার। গ্রাস কার্প চাষের জন্য আলাদা পুকুরে গ্রাসকার্পের খাবার তৈরী করা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই কারণে মিশ্র মাছ চাষে গ্রাসকার্প রাখা অসুবিধার ব্যাপার।

নিবিড় মিশ্র চাষ পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে মিশ্রচাষ পদ্ধতি কেবল মাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সার প্রয়োগ হলে যে খাদ্যকণা তৈরী হয় তার ভিত্তিতে মাছ চাষ করলে ব্যাপক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই মিশ্রচাষ পদ্ধতিকে নিবিড় মিশ্রচাষে পরিণত করা হয়েছে। অর্থাৎ একই জলাশয়ে মজুত মাছের পরিমাণ অনেকগুণ বাড়ানো হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণে প্রাকৃতিক খাদ্য অতিরিক্ত সংখ্যায় মাছের জন্য যথেষ্ট নয়। এই কারণে বাইরে থেকে পরিপূরক খাবার দেওয়া প্রয়োজন। এই পরিপূরক খাবার বিজ্ঞান সম্মতভাবে তৈরী করা হয়। মাছের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ভিটামিন, খনিজলবণ ইত্যাদির সঙ্গে অন্যান্য স্বল্পমাত্রিক খাদ্যগুণও দেওয়া হয় ফলে এই খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় পাচ্য খাদ্য শক্তি *(digestible energy)* থাকে। সহজেই এই খাদ্য প্রয়োগে নিবিড় মাছ চাষে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এছাড়াও এ খাদ্য প্রয়োগে মাছের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব।

প্রবহমান জলে নিবিড় মাছ চাষ ঃ

নিবিড় মাছ চাষে মাছ মজুতের সংখ্যা অনেক বেশী হয়। এছাড়াও জলে প্রচুর পরিমাণে পরিপূরক খাদ্য প্রতিদিন দেওয়া হয়। ফলে জলে অতিরিক্ত খাদ্য, অপাচ্য খাদ্য, বর্জ্য

পদার্থের পরিমাণও অনেক হয়। এ সকল পদার্থ সহজেই জলকে দূষিত করে ও মাছের পক্ষে জলের প্রয়োজনীয় ভৌতরাসায়নিক গুণাবলীকে নষ্ট করে। বিশেষকরে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা, পি.এইচ ও অ্যামোনিয়ার পরিমান ক্ষতিকর অবস্থায় পৌঁছায়। কিন্তু সহজেই এই সব গুণাবলী সঠিকমাত্রায় রক্ষা করা সমস্যার ব্যাপার। তবে পৃথিবীর বহু উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে মাছ চাষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রবহমান জলে করা হয়।

এধরণের মাছ চাষ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়। যেমন রেসওয়েজ কালচার *(Race ways culture)*, রিসারকুলেশন কালচার *(Recirculation culture)* ইত্যাদি। এছাড়াও নদী বা খালে প্রবহমান জলে খাঁচার মধ্যেও অনেক সংখ্যায় মাছ মজুত করে চাষ করা হয়। তারমধ্যে রেসওয়েজ কালচার ব্যাপকভাবে করতে পারলে মাছ চাষকে শিল্পের *(industry)* পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। আয়তাকার সিমেন্ট দিয়ে তৈরী চৌবাচ্চার একদিকে জল ঢোকার জায়গা থাকবে। সাধারণতঃ জল উপর তলে প্রবেশ করে। বিপরীত দিকে চৌবাচ্চার তলদেশ দিয়ে জল বের হওয়ার জায়গা থাকে। ক্রমাগত জল ঢোকা ও বেরোনোর মধ্য দিয়েই জলের প্রবাহ তৈরী করা হয়। সম্পূর্ণভাবে পরিপূরক খাবার দিয়েই মাছ চাষ করা হয়। চাষে সহজেই মাছকে দেখা সহজ। প্রয়োজনে যে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মাছের স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিচর্যা ঠিক ঠিক ভাবে করা যায়। এ ছাড়াও প্রবহমান জলে চাষের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে জমা বর্জ্য পদার্থ সহজেই বাইরে বের হয়ে জলের পরিবেশ ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করে। ফলে অল্প জায়গায় ব্যাপক উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কোন জায়গায় যদি জলের অভাব থাকে তবে মাছ চাষের পর বের হওয়া জলকে প্রয়োজনীয় পরিশোধনের সাহায্যে বার বার ব্যবহার করা যেতেই পারে। আমাদের দেশে এধরণের চাষ এখন পরীক্ষার পর্যায়ে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই চাষ পদ্ধতিতে মাছ চাষকে শিল্পের পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে নীল বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে। ছোট পর্যায়ে এখনই আমাদের দেশে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করা উচিত। কেননা নিবিড় মিশ্রচাষে বদ্ধ জলাশয়ে খুব বেশী হলে ১০-১২ হাজার কি.গ্রাম প্রতি হেক্টরে উৎপাদন করা সম্ভব। অন্যদিকে উন্নত পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ কি.গ্রাম প্রতি হেক্টরে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

মাছ চাষ ও গ্রামীণ অর্থনীতি ঃ

মাছ চাষের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি সরাসরি যুক্ত। ভারতের গ্রাম বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে চাষযোগ্য জলাশয়ের অভাব নেই। বিভিন্ন জলাশয়ে সারা বছরই মাছ চাষ করা সম্ভব।

উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রয়োগে জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে ব্যপক উৎপাদনও সম্ভব। মাছ চাষের জন্য সরাসরিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বহু সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব। যেমন —

১) মাছ চাষের জন্য পুকুর কাটা ও পুকুর তৈরীতে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান।

২) মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মাছের চারা উৎপাদন কেন্দ্রে কর্মসংস্থান।

৩) উৎপাদিত মাছের চারা বাজার জাত করার জন্য কর্মসংস্থান।

৪) জলাশয়ে চাষ পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য কর্মসংস্থান।

৫) মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও পরিপূরক খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রে কর্মসংস্থান।

৬) মাছ উৎপাদনের পর বাজার জাত করা বা সংরক্ষণের মাধ্যমে বিদেশে মাছ পাঠানোর জন্য কর্মসংস্থান।

৭) মাছ থেকে বিভিন্ন উপজাত পদার্থ তৈরী করার জন্য কর্মসংস্থান।

মাছ চাষে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে। ফলে বিজ্ঞান সম্মতভাবে অর্ন্তদেশীয় জলাশয়ে মাছ চাষ উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম সংস্থান-এর ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটাতে পারে। এছাড়াও ভবিষ্যতে দরিদ্র গ্রামীণ জনসংখ্যাকে কম দামে প্রাণীজাত সহজপাচ্য প্রোটিন সরবরাহ করা সম্ভব। নদীমাতৃক দেশে পর্যাপ্ত জলাশয়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এ দেশেই যথার্থ নীল বিপ্লব সম্ভব।

Evolution of Fish farming in India and rural economy
Prof. Samir Banerjee
Department of Zoology, University of Calcutta

মাছ চাষের উপযুক্ত জলাশয় প্রস্তুতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক সার ও চুন প্রয়োগ

শ্রী অলোক প্রহরাজ

মৎস্য দপ্তর, কন্টাই শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জলাশয় মানে মাটি তার উপর জল, উভয় পরিবেশের মধ্যে এক নিবিড় আদান প্রদান চলে, যেহেতু জল মাটির উপরে অবস্থান করে তাই জলের বহুবিধি গুণাগুণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকে জলের তলদেশে অবস্থিত মাটির। মাটি যদি উর্বর হয় তবে জলের গুণগতমান বাড়ে।

উর্বর মাটি বলতে কি বোঝাতে চাইছি, যে মাটি বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্য মৌল যেমন নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি ধীরে ধীরে গ্রহণীয় অবস্থায় জলে সরবরাহ করতে সক্ষম হয় সেই মাটিকে উর্বর ক্ষমতা সম্পন্ন বলে অভিহিত করি। কারণ এই সব রাসায়নিক মৌলগুলি জলীয়, পরিবেশের সাথে বিক্রিয়া করে জলাশয়ে পরিমানমত জৈব উপাদান স্বরূপ উদ্ভিদ কণা তৈরী করতে সাহায্য করে। আবার উদ্ভিদকনার আবির্ভাব এর পরে পরে প্রাণীকণার আধিক্য ঘটে অর্থাৎ প্রাণীকণার অধিকাংশে উদ্ভিদকনার উপর নির্ভরশীল বিশেষতঃ খাদ্যের জন্য। আবার এই উদ্ভিদ ও প্রাণীকনাই হল মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যাহা প্রাথমিকভাবে মাছের দৈহিক বৃদ্ধি, প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। অতএব উদ্ভিদ কণাকেই আমরা জলাশয়ের মুখ্য উৎপাদক হিসাবে উল্লেখ করতে পারি।

জলাশয়ে ভাল মাছ উৎপাদন করতে হলে উপরের উল্লিখিত খাদ্য কণাগুলির সঠিক বংশবিস্তারের দিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ রাখতে হবে। বিশেষ করে উদ্ভিদ কণার পরিমান প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করা জরুরী। এই কনাগুলি অতীব ক্ষুদ্র, জলে খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু জলের রঙবিশ্লেষণ করে, কিছু ধারনা পাওয়া যেতে পারে। জলের রঙ হালকা সবুজ বা ঈষৎ সবুজ বাদামী আভা হলে বুঝতে হবে উদ্ভিদ কণার উৎপাদন হয়েছে আবার এই রঙ ধীরে ধীরে খয়েরি বা হরিদ্রাভ বর্ণের দিকে পরিবর্তন হতে থাকলে আমরা ধারণা করতে পারি প্রাণীকণার আধিক্য ঘটছে। অতএব জলের বর্ণ নির্ভর করে জলাশয়ে উৎপাদিত উদ্ভিদ বা প্রাণীকণার বর্ণের উপর।

মাটি প্রয়োজন মত উদ্ভিদ খাদ্য মৌল জলে সরবরাহ করছে এবং এই মৌলগুলি খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করে জলাশয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীকণার উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনা সুষ্ঠু সম্পাদনার ভার যার উপর সে কিন্তু মাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব ব্যাকটেরিয়া যে উদ্ভিদ খাদ্য মৌল গুলি মাটি থেকে জলে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় সরবরাহ করার মুখ্য

অভিনয় করে, অতএব বিজ্ঞান সম্মত মাছচাষী হতে হলে নিচের দেওয়া ছকের চারটি বিষয়বস্তুকে মাথায় ধরে রাখতে হবে।

মাটি ——→ ব্যাকটেরিয়া ——→ উদ্ভিদ খাদ্য মৌল ——→ উদ্ভিদ কণা

প্রথম আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক সার বা ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ক্যালসিয়াম ফার্টিলাইজার বা চুন — মাছ চাষে চুনের প্রভাব অপরিসীম কিন্তু আমরা সঠিক নির্বাচন, প্রয়োগপ্রণালী ও পরিমান এই তিনটি বিষয়ে নিজেদের ভুল করে বসি। সঠিক চুন নির্বাচন করলেও প্রয়োগ পদ্ধতি যদি ঠিক না হয় আবার প্রয়োগ ঠিকমত হলেও পরিমানের ব্যাপারে মোটামুটি তথ্য পাইনা। তবে একটি ব্যাপার বলে রাখা ভাল নির্বাচন ও প্রয়োগ পদ্ধতি যদি ঠিক থাকে তবে পরিমানের সামান্য হেরফেরে খুব বেশী অসুবিধে হয় না।

(১) চুনের কার্যকারিতা কি? — খুব সাধারণভাবে বলা যায় চুন মাটি বা জলের আম্লিক পরিবেশকে দূর করে প্রশম অবস্থা বা অল্প ক্ষারীয় পরিবেশ তৈরী করে যেখানে জলাশয়ে উপকারী ব্যাকটেরিয়া তাদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখে। অর্থাৎ জলের বা মাটির গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য যে ব্যাকটেরিয়াগুলি কাজ করে তাদের ঈষৎ ক্ষারীয় পরিবেশ দরকার হয়।

জলের ঘোলা ঘোলা ভাবও চুন প্রয়োগের মধ্যদিয়ে আমরা দূর করতে পারি এবং উদ্ভিদ খাদ্য মৌলগুলিকেও মাটি থেকে জলে ছড়ান চুন যেমন বিভিন্ন ক্ষতিকারক রোগের জীবানু ধ্বংশ করে তেমনি চুন অবস্থিত ক্যালশিয়াম জলাশয়ে অবস্থিত সমগ্র জীবকুলের খাদ্য মৌল হিসাবে ব্যাবহৃত হয়।

চুনের পরিমান — মাটি ও জলের অম্লের পরিমান বা পি. এইচ্. এর সঠিক পরীক্ষা করার পর চুনের পরিমান ঠিক করব। অম্লমাটিতে জল ঢোকানোর পূর্বে চুন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মাটির আম্লিক অবস্থা কাটিয়ে নেওয়া জরুরী। মাটির অম্লের পরিমাণের উপর কতটা চুন প্রয়োগ করত হবে তার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ—

মাটির পি. এইচ্ (P^H.)	চুনের পরিমান (কেজি/হেঃ)
৪ — ৫.৫	২০০০
৫.৫ — ৬.৫	১০০০
৬.৫ — ৭.৫	৫০০
৭.৫ — ৮.৫	২০০
৮.৫ — ৯.৫	*NIL*

ফসফরাস জাতীয় সার ঃ—

মাছ চাষে ফসফরাসের গুরুত্বও খুব কম কিছু নয় যদিও গ্রহনীয় অবস্থায় ফসফরাসকে খুব কম পরিমানে পাওয়া যায়। তবে ফসফরাস জাতীয় সার যদি চুনপ্রয়োগের পরে পরে করি তাহলে আমরা ভাল ফল পাব। ফসফরাস উদ্ভিদ কণার বংশবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই বাহির থেকে ফসফরাস সার প্রয়োগ করব উদ্ভিদ কণার পরিমান দেখে। অর্থাৎ উদ্ভিদ কণার পরিমান কম হলে ফসফরাস প্রয়োগ করলে দ্রুত ফল পাওয়া যায়। সাধারণভাবে প্রয়োগের পরিমান ৫০ কেজি/হেঃ হল উপযুক্ত।

ফসফেট সারের প্রয়োগ

ফসফেটের পরিমান (প্রতি ১০০গ্রাঃ মাটিতে)	ফসফেট দরকার (কেজি/হেঃ/বছর)	সিঙ্গল সুপার ফসফেট (কেজি/হেঃ/বছর)	ট্রিপিল সুপার ফসফেট (কেজি/হেঃ/বছর)
৬ এর বেশী	৭৫	৩৭৫ - ৪৭০	১৬৫ - ১৯০
৩ -৬	১০০	৫০০ - ৬২৫	২২০ - ২৫০
৩ এর বেশী	১৫০	৭৫০ - ৯৪০	৩৩০ - ৩৭৫

নাইট্রোজেন জাতীয় সার ঃ—

নাইট্রোজেনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আগেই বলা হয়ে গেছে। জলাশয়ে নাইট্রোজেন নাইট্রেট থেকেই প্রাপ্ত হয়। এই নাইট্রেট আবার তৈরী হয় অ্যামোনিয়া থেকে এবং এই বিক্রিয়াকে তরান্বিত করতে অক্সিজেনের স্বভাবিক উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী, তাই জলাশয়ে নাইট্রোজেনের মাত্রা ঠিক থাকে যদি ওই জলাশয়ে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপস্থিতির পরিমান সঠিক হয়। নাইট্রোজেনের পরিমান কম হলে জলাশয়ে বাহির থেকে ওই জাতীয় সার প্রয়োগের দরকার হয়। এবং প্রয়োগ করার দরকার আছে কিনা তৎসহ পরিমান কত হতে পারে সে ব্যাপারে জলাশয়ে উদ্ভিদকণার উপস্থিতির পরিমানকে নির্নয়ক হিসাবে গন্য করা হয়। ফসফরাস এর মত নাইট্রোজেন ঘটিত সার ও বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ইউরিয়া (৪৬% নাইট্রোজেন), ক্যান (CAN) (২৭% নাইট্রোজেন), অ্যামোনিয়াম সালফেট (২০ নাইট্রোজেন) আমরা ব্যবহার করে থাকি। জলাশয়ে নাইট্রোজেন সার এর প্রয়োজন হলে পরিমানটা নিম্নরূপ হওয়া উচিত।

ইউরিয়া - ৩৬ কেজি/হে. বা ক্যান ৬০কেজি/হে. বা অ্যামোনিয়াম সালফেট ৭২ কেজি/হে.

নাইট্রোজেন সারও ফসফরাসের মত জলাশয়ে মাছচাষের পূর্বে মাটিতে প্রয়োগ করলেও ভাল হয় এবং পরিমান অনুরূপভাবে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমান পরীক্ষাগার থেকে নির্নয় করে দেওয়া সঙ্গত।

নাইট্রোজেনের পরিমান (প্রতি ১০০গ্রাঃ মাটিতে)	নাইট্রোজেন দরকার (কেজি/হেঃ/বছর)	ক্যান (কেজি/হেঃ/বছর)	অ্যামোনিয়াম সালফেট (কেজি/হেঃ/বছর)	ইউরিয়া (কেজি/হেঃ/বছর)
৫০ এর বেশী	১৫০	৭৫০	৭৫০	৩৩৫
২৫ - ৫০	২০০	১০০০	১০০০	৪৪৫
২৫ এর কম	৩০০	১৫০০	১৫০০	৬৭০

পটাসিয়াম জাতীয় সার ঃ—

জলাশয়ে পটাসিয়ামের সঠিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে এখনো কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পটাসিয়াম এর উপস্থিতি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। মাটিতে পটাসিয়ামের পরিমান স্বাভাবিক ভাবে ভাল থাকার বাহির থেকে এর প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে কিছু পরিমান পটাসিয়াম জৈব সার থেকেও পাওয়া যায়। তবে পটাসিয়াম সরবরাহের জরুরী মনে করলে মাত্রা ৩০ - ৪৫ কেজি/হে./বছর হলেই চলবে।

জৈব সার ঃ—

মাছচাষে জৈব সারের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু ঠিক কোন জৈবসার এবং কতটা পরিমান প্রয়োগ করলে আমরা জলাশয়কে উপযুক্ত করে তুলতে পারব তা একটা ধারনা থাকা প্রয়োজন। খুব সাধারনভাবে উল্লেখ করা যায় যে জৈবসার এর বাজারমূল্য কম, বিভিন্ন দিক থেকে তুলনামূলকভাবে জলাশয়ে তার কার্যকারিতা কম। আরও একটু পরিষ্কারভাবে বললে নিম্নমানের জৈবসার উপযোগী উদ্ভিদখাদ্য উপাদান সরবরাহের ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করতে পারে না এবং ওই উপাদান এর পরিমানও ওই জৈবসারে কম থাকে। আবার এই সার প্রয়োগে জলাশয়ের তলদেশে পচনের পর গৌন

উৎপাদক হিসাবে বেশী পরিমান অপ্রয়োজনীয় গ্যাস উৎপন্ন করে যাহা আশতারণ আকারে মাটির উপর অবস্থান করে। অতএব জৈবসার নির্বাচনের পূর্বে এইরূপ একটি সাধারণ ধারনা থাকলে আমরা আমাদের সামর্থবিশেষ সঠিক নির্বাচনে সক্ষম হব। তবে মনে রাখবেন সঠিক ও সময় অনুযায়ী পরিচর্যা করতে পারলে সাধারনমানের জৈবসার প্রয়োগে কোন অসুবিধা হয় না।

যেহেতু প্রকৃতির সংগে জলাশয়ের আদান প্রদানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, তাই মাছ চাষের ক্ষেত্রে কোন তথ্যই নির্দিষ্ট নয়, সময় বিশেষে ও পরিবেশের গুনে পরিবর্তনশীল। তার জন্য প্রয়োজন একশভাগ মাছ চাষের মধ্যে পড়ে থাকা যেখান থেকে নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হব এবং আপন যুক্তি গত বিশ্লেষন কিংবা বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে সঠিক সমাধান অবশ্যই পাব। তাই সঠিক মৎসবিজ্ঞানী তাকেই বলা যায় যিনি প্রত্যক্ষভাবে মাছকে ভালবাসেন এবং মাছচাষের মধ্যে আছেন। মাছকে ভালবাসুন তাদের সুস্থ্য সবল করে রাখুন। দেখবেন মাছই আপনাকে ও আপনার পরিবারকে আনন্দমুখি করে রাখবে।

Scientific application of Manure and lime in pond preparation for fish farming

Sri Aloke Praharaj
Fishery Dept. Contai, Govt. of West Bengal,

মাছ চাষে অনুখাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

ডঃ বিপ্লব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশ এন্ড ফিশারীজ ডিপার্টমেন্ট, বেহালা কলেজ, কলিকাতা

চীন দেশে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে। "তুমি যদি একজনকে একটি মাছ দাও, সে একদিন খেয়ে বাঁচবে, কিন্তু লোকটিকে যদি তুমি মাছ চাষের প্রযুক্তি দাও, সে সারা জীবন খেয়ে বাঁচবে"।

কেবলমাত্র, চীন নয়, ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের জন্যই এই প্রবাদ বাক্যটি যথার্থ। আমরা জানি প্রত্যেক মানুষেরই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন প্রোটিন। ইউনাইটেড নেশনের নিউট্রিশন এ্যাডভাইসারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের শরীরের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন দৈনিক ন্যূনতম ৮০ গ্রাম মাছ। এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সস্তা প্রয়োজনীয় প্রাণীজ প্রোটিন আমরা কেমলমাত্র মাছ থেকেই পেয়ে থাকি। প্রোটিন ছাড়া আমরা মাছের মধ্যে পাই কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এ, ডি এবং ই, লৌহ, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য অনুখাদ্য।

পশ্চিমবঙ্গে অর্ন্তদেশীয় মৎস্যচাষ হয়ে থাকে মিঠা (*fresh*) এবং নোনা (*brackish*) জলে।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষোপযোগী মিঠা জলের মোট পরিমান হলো প্রায় ২,৭৬,২০২ হেক্টর কিন্তু এখনও পর্যন্ত চাষ চালু আছে মাত্র ১ লক্ষ ৭ হাজার ৮১৪.৩ হেক্টর জলে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মোট নোনাজল প্লাবিত এলাকা হলো আনুমানিক ৪লক্ষ ৫ হাজার হেক্টর যার মধ্যে চযোপযোগী আদর্শ জায়গা প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর। কিন্তু এই জলে এখন পর্যন্ত মৎস্যচাষ চালু আছে মাত্র ৩৩ হাজার ৯১৮ হেক্টর এলাকায়।

উপরের তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে প্রভুত উন্নতির সম্ভাবনা এখনও আমাদের রাজ্যে বর্তমান আছে। যদি অধিক সংখ্যায় আমরা মৎস্যচাষে আধুনিক বর্ত্তমান প্রজন্মকে আকৃষ্ট এবং শিক্ষিত করে তুলতে পারি তবে কেবলমাত্র যে পুষ্টির জন্য খাদ্য উৎপাদন হবে তাই নয় এর সাথে সাথে প্রভুত কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে।

ফিশারীর সংজ্ঞা ঃ

ফিশারী শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করাযায় এই ভাবে, "অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আহরণ, চাষ ও সংরক্ষণ"। "এ্যাকোয়া কালচার" শব্দটি ফিশারীর

একটি শাখা এবং কোন জলীয় পরিবেশে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদের চাষকেই এ্যাকোয়াকালচার নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে এ্যাকোয়াকালচার মাত্রই বর্তমান একটি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে এবং একটি "ঝুঁকিময় জৈবশিল্প" ও (*High risk bio industry*) বটে।

মৎস্য চাষে জল ও মাটির ভূমিকা ঃ

মাছ জলে বসবাস করে। জলের গুনাগুনের উপর নির্ভর করে মাছের জৈবিক ক্রিয়া, স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি উৎপাদন। জলের গুনাগুন নির্ভর করে অনেকাংশেই জলের নীচের মাটীর গুনাগুনের উপর। বস্তুতপক্ষে, মাটী হলো জলের রাসায়নাগার। জল ও মাটীর গুনাগুন বলতে আমরা বুঝি এদের ভৌত রাসায়নিক এবং জৈবিক গুনাগুন। জল এবং মাটির মধ্যস্থলে (*Soil water interphase*) নানবিধ ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে আলো, তাপমাত্রার প্রভাবে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের (*minerals*) বিশ্লেষন এবং সংমিশ্রন ঘটে (*mineralization*)। এই খনিজ পদার্থগুলি সবুজ কনা (*Phytoplankton*), প্রাণী কনা (*Zooplankton*) এবং মাটীর সঙ্গে থাকা উদ্ভিদ এবং প্রাণী (*Phyto and Zoobenthos*) ইত্যাদির দ্বারা গঠিত খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে মাছের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং পুষ্টির মাধ্যমে মাছের শরীরকে সুস্থ, স্বাভাবিক রাখে।

মৎস্যচাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্যাসার (*Fertilizer*) ঃ

কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে রকম আমরা জৈব এবং রাসায়নিক খাদ্যসার ব্যবহৃত করে থাকি, মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও বর্ত্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন খাদ্যসার ব্যবহারের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় খাদ্যসার প্রধানতঃ দুই প্রকারের।

(১) জৈব সার এবং (২) রাসায়নিক সার।

জৈব সার ঃ মৎস্যচাষে জলের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন জৈবসারের ব্যবহার দেখা যায়। এগুলি হলো প্রধানতঃ (ক) গোবর, (খ) মুরগীর বিষ্ঠা এবং (গ) বিভিন্ন খৈল, যেমন মহুয়া খৈল, নারকেল খৈল, সরষে, বাদাম খৈল ইত্যাদি।

এই সমস্ত জৈবসারের রাসায়নিক পরীক্ষা এবং মৎস্যচাষের পুকুরে এদের ব্যবহারের পর জলের পরীক্ষা করে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এদের ব্যবহারের ফলে জলের ভেতর নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ইত্যাদি যে সমস্ত খাদ্যসার আছে তার পরিমান বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত খাদ্যসার জলের ভেতর উদ্ভিদ কনা এবং প্রাণীকণার বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

রাসায়নিক সার ঃ ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট, মিউরেট অফ পটাশ যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের জন্যই প্রধানতঃ জমি চাষে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রায়েছে যৌগ সার বা মিশ্র সার যেমন ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট বা 'ডি এ পি'। এই সার নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস এর এক মিশ্রন, তাই একে মিশ্র সার বলা হয়। এই সব রাসায়নিক সার মৎস্যচাষের বহুল ব্যবহৃত তবে পরিমানে জমি চাষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। দেখা গেছে যে সমস্ত পুকুরে এই রাসায়নিক সার সরাসরি ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত পুকুরে প্ল্যাঙ্কটন বা সবুজ ও প্রাণী কনার আধিক্য ঘটে, ফলে জলের ভৌত রাসায়নিক গুনাবলী অচিরেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এবং মাছের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা যায়। সুতরাং যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেই এই সমস্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার করা উচিৎ।

অনুখাদ্যসার ঃ

অনুখাদ্যসার বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট মিনারেল ফার্টিলাইজার আলোচনার আগে সার্বিক ভাবে উদ্ভিদকনা, প্রাণীকনা বা মাছেদের প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

প্রত্যেকটি প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিস্তার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন নির্ভর করে খনিজ পদার্থ গুলির লভ্যতা, গ্রহণ ক্ষমতা এবং পুষ্টির উপর। প্রকৃতিতে শতাধিক খাদ্যসার (*nutrient*) পাওয়া যায় যার মধ্যে দেখা গেছে কেবলমাত্র ১৬টি খাদ্যসার আবশ্যিক (*essential*)। জীবের পরিমানগত প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে এই আবশ্যিক খাদ্যসার গুলিকে দুভাগ বিভক্ত করা যায়। যে সমস্ত খাদ্যসার গুলি বেশি পরিমানকে প্রয়োজনীয়তা আছে তাকে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টবলা হয় যেমন — কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, সিলিকন এবং সালফার বা গন্ধক। অন্যদিকে যে সমস্ত খাদ্যসার গুলির খুব সামান্য পরিমানে প্রয়োজনীয়তা আছে অথচ যার কোনও একটির অভাবে জীবের গঠন, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যাহত হয় এগুলিকে অনুখাদ্যাসার বা মাইক্রোনিউট্রিয়েট বা ট্রেস এলিমেন্ট বলা হয়। যেমন — লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন, দস্তা বা জিঙ্ক, তামা, মলিবডেনাম, কোবাল্টএবং ক্লোরিন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে জীবের দৈহিক গঠনের জন্য ম্যাক্রোনিউট্রয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা হলো প্রতি গ্রাম কলায় (*tissue*) ১০০০ *mg.* এবং অপর দিকে অনুখাদ্যসার বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের প্রয়োজন মাত্র ১০০ *mg.* প্রতি গ্রাম কলা (*tissue*)। এই কলা (*tissue*) শুষ্ক অবস্থায় (*dry matter*)। জীবদেহে (উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) প্রতিটি বর্নিত খনিজ পদার্থের আবশ্যকীয়তা ইতি মধ্যেই প্রমানিত। এই সমস্ত খনিজ পদার্থ জীবদেহের অস্থি এবং বহিঃঙ্কাল, প্রতিটি কোষ এবং কলাকে তৈরী করতে সাহায্য করে। অস্মোটিক প্রেসার

ঠিক রাখে, স্নায়ুতন্ত্রকে সচল রাখে এবং পেশী সংকোচন এবং প্রসারনে সাহায্য করে। খাদ্যসার এবং পেশী সংকোচন এবং প্রসারনে সাহায্য করে। খাদ্যসার হরমোন, রং তৈরীতে সাহায্য করে এবং এটাও দেখাগেছে স্বাভাবিক পুষ্টি এবং এন্‌জাইমের কার্যকারীতাকে সচল এবং অনেকাংশে দ্রুত করতে সাহায্য করে।

চিংড়ি মাছের কথা বিশেষ করে বলা ভালো, আমরা প্রত্যেকেই জানি চিংড়ি গোত্রীয় প্রাণী গুলির বৃদ্ধি নির্ভর করে খোলস পরিবর্তনের উপর। প্রতিবার খোলস পরিবর্ত্তনের সময় এদের শরীর থেকে প্রভুত পরিমান খাদ্যসারের (*essential elements*) ঘাটতি হয়।

পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে জলের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ছাড়াও যদি অনুখাদ্যসারের ঘাটতি থাকে তবে এদের বহিঃকঙ্কাল (*Exp-skeleton*) পুনরায় আশানুরূপ ভাবে গঠিত হয় না। পরীক্ষায় এও প্রমাণিত হয়েছে বোরন এবং ম্যাঙ্গানীজ নামক দুটি অনুখাদ্যাসার কিছু মৎস্য প্রজাতির বৃদ্ধিকে যথাক্রমে ২১% এবং ৩৫.১১% শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। পরীক্ষায় এও দেখা গেছে ম্যাঙ্গানীজের প্রভাবে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকনার ঘনত্ব আনুমানিক ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪ সালের এক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে সাইপ্রিনাস কার্প বা কমন কার্পের বেঁচে থাকার এবং বৃদ্ধির হার কোবাল্টএর প্রভাবে যথাক্রমে ৩.২৭ শতাংশ এবং ১০১.৮৬ শতাংশ। ম্যাগনেশিয়ামের প্রভাবে ১০০ শতাংশ এবং ১০২.১৯ শতাংশ কোবাল্ট নামক অনুখাদ্যসার প্রয়োগে প্রমানিত হয়েছে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন বি১২ কে বিশ্লেষন করে তাদের সাহায্য করে ফলে মাছ এই ভিটামিন গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

মাছ এবং চিংড়ির বহু রোগ সনাক্ত হয়েছে যা ব্যাকটেরিয়া, প্রোটজোয়া বা ছত্রাকঘটিত। বিভিন্ন অনুখাদ্যসারের সঠিক প্রয়োগ এই সমস্ত রোগ থেকে মাছকে রোগমুক্ত হতেও সাহয্য করে।

মাছ চাষযোগ্য জলাশয়ের সুস্থ পরিবেশ ও তা রক্ষার উপায়

ডঃ বিপুল কুমার দাস
পশ্চিমবঙ্গ পশুপালন ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

মাছ চাষের জন্য আমরা বিশেষ চিন্তা ভাবনা করি না। মনে রাখতে হবে যে জলই মাছের বাসস্থান, জল থেকেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করে, আবার জলেই তারা তাদের দূষিত বজ্য বা রেচন পদার্থ ত্যাগ করে। কাজেই মাছের স্বাস্থ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি তখনই সম্ভব যদি জলের সামগ্রিক পরিবেশ ভাল থাকে। সুতরাং মাছ চাষ যোগ্য জলাশয়ের সুস্থ পরিবেশ রক্ষা করার উপরই মাছ চাষের সাফল্য বা অসাফল্য নির্ভর করছে। সহজ পন্থায়, অল্প সময়ে ও যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে জলের গুণাগুণের সম্যক ধারণা ও তার যথাযথ গুণাগুণ বজায় রাখার বিধানের কিছু কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(ক) জলাশয়ের রং ঃ

১। লালচে বা হালকা বাদামী ঃ

কারণ ঃ— প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রকার প্রাণীকণার আধিক্য।

কি হতে পারে ঃ—

মাছ বা চিংড়ি চাষের উপযুক্ত।

জলের দ্রবিভূত অক্সিজেন, পি. এইচ্. সহ অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ মাছ চাষের পক্ষে অনুকুল।

কি করতে হবে ঃ—

মাঝে মাঝে পুকুরে জাল টানতে হবে ও মাছের বৃদ্ধি দেখতে হবে।

সঠিক মাত্রায় সার ও খাবার সঠিক সময়ে দিতে হবে।

২। হালকা সবুজ ঃ

কারণ ঃ— শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদকণার আধিক্য।

কি হতে পারে ঃ—

চাষের পক্ষে উপযুক্ত তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদকণার আর বৃদ্ধি না হয়।

দিনে ও রাতে অক্সিজেনের পরিমাণ বিশেষ তারতম্য দেখা দিতে পারে।

কি করতে হবে ঃ—

জৈব ও অজৈব সার কম প্রয়োগ করতে হবে।

পরিপুরক খাবারও কম পরিমানে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগ করতে হবে বিঘা প্রতি ৪০ - ৫০ কেজি।

৩। **গাঢ় সবুজ বা সবুজাভ নীল ঃ**

কারণ ঃ— শ্যাওলা, প্রধানতঃ নীলাভ সবুজ শ্যাওলার আধিক্য বা বিস্ফোরণ।

কি হতে পারে ঃ—

গভীর রাতে বা ভোরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাবে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাবে।

মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে।

জলে দূর্গন্ধও হতে পারে।

বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে।

কি করতে হবে ঃ—

জল পরিবর্তন করতে পারলে ভাল হয়।

সার প্রয়োগ বা খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

জাল টেনে মাছ হালকা করতে হবে।

বিঘা প্রতি ১ কেজি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ভালভাবে জলে মিশিয়ে দিতে হবে।

চুন দিতে হবে বিঘা প্রতি ৪০ - ৫০ কেজি।

৪। **গাঢ় বাদামী ঃ**

কারণ ঃ— বাদামী শ্যাওলার আধিক্য।

কি হতে পারে ঃ—

জলের অবস্থা খুবই খারাপ হতে চলেছে।

মাছ চাষের একেবারে অনুপযুক্ত।

পি. এইচ্. ও স্বচ্ছতা কমে যাবে।

রাতে অক্সিজেন কমে যাবে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাবে।

জলে দূর্গন্ধ হবে।

মাছের অস্বাভাবিক মৃত্যু হবে।

সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

কি করতে হবে ঃ—

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাল টেনে মাছ তুলে ফেলতে হবে।

জল পরিবর্তন করতে হবে।

সার বা খাবার প্রয়োগ একে বারে বন্ধ করে দিতে হবে।

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জলে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে বিঘা প্রতি ১ কেজি।

চুন প্রয়োগ করতে হবে বিঘা প্রতি ৪০ - ৫০ কেজি।

৫। **হলুদ বর্ণের জল ঃ**

কারণ ঃ— বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক শ্যাওলার আধিক্য।

কি হতে পারে ঃ—

জলের অবস্থা ভীষণ খারাপ। মাছ বা চিংড়ির ব্যাপক মরণ হতে পারে।

আগের মতোই জলের গুণাগুণ খারাপ হতে পারে।

কি করতে হবে ঃ—

আগের মতোই ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬। অস্বচ্ছ বা ঘোলা জল ঃ

কারণ ঃ— কাদা, পচা জিনিসপত্র বা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীকণার আধিক্য।

কি হতে পারে ঃ—

বেশী পরিমাণ কাদা, পচা বা গলিত পদার্থ ও মৃত বা জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণী কণার আধিক্যে মাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

সূর্যের আলো ঠিকমতো পুকুরের জলের তলদেশে প্রবেশ করতে পারে না।

কি করতে হবে ঃ—

জল পরিবর্তন করা যেতে পারে।

অন্যথায় চুন সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করে জল পরিষ্কার করতে হবে।

৭। টলটলে পরিস্কার জল ঃ

কারণ ঃ— জলজ পুষ্টিকর খাদ্যকণার (উদ্ভিদ ও প্রাণীকণা) অভাব।

কি হতে পারে ঃ—

চাষের পক্ষে মোটেই-উপযুক্ত নয়।

পি. এইচ্. বা অক্সিজেনের অভাব না হলেও মাছের বৃদ্ধি হবে না।

মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণী খাবারের খোঁজে পুকুরের পাড়ের দিকে ঘোরাফেরা করতে পারে।

কি করতে হবে ঃ—

জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

পরিপূরক খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) জলের রং-এর পরিবর্তন ঃ

১। জল ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ঃ

কারণ ঃ— প্রাণী ও উদ্ভিদ কণার মৃত্যু।

কি হতে পারে ঃ—

হঠাৎ অক্সিজেনের পরিমান কমে যেতে পারে।

পি. এইচ্. ও কমে যাবে।

জলে খাদ্যের অভাব হবে।

মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

কি করতে হবে ঃ—

পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে বিঘা প্রতি ৩০ - ৪০ কেজি।

১০ দিন পর সার প্রয়োগ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীকণার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। গোবর বিঘা প্রতি ১০০ কেজি, ইউরিয়া বিঘা প্রতি ১০ কেজি।

২। হঠাৎ জলের রং দুধের মতো সাদা হয়ে যাওয়া ঃ

কারণ ঃ— উদ্ভিদ কণার মৃত্যু ও তাদের দ্রুত পচন।

কি হতে পারে ঃ—

আগের মতো জলে অক্সিজেন বা পি. এইচ্. কমে যেতে পারে।

মাছের খাবারের ঘাটতি, বৃদ্ধি ব্যহত ও মৃত্যুও হতে পারে।

কি করতে হবে ঃ—

জল শোধন করতে হবে চুন বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে।

৩। জল হঠাৎ সবুজ থেকে লালচে হয়ে যাওয়া ঃ

কারণ ঃ— জলের উদ্ভিদকণার বিযাক্ত পদার্থ উৎপাদন বা বিযাক্ত উদ্ভিদ কণার আধিক্য।

কি হতে পারে ঃ—

জলের পি. এইচ্. ও অক্সিজেন কমে যেতে পারে।

মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বিষক্রিয়ার ফলে মারা যেতে পারে।

মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

কি করতে হবে ঃ—

মাছকে জলাশয় থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে ফেলতে হবে।

পরিমানমত চুন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে জল ঠিকমত শোধন করতে হবে।

কিছুদিন জলাশয় ফেলে রাখতে হবে।

নতুন করে পুকুর তৈরী করে আবার মাছের চারাপোনা ছাড়া যেতে পারে।

(গ) মাছও অন্যান্য জলজ প্রাণীর চলাফেরা গতি-প্রকৃতি ঃ

লক্ষণ ঃ— ১

অসামঞ্জস্য ভাবে সাঁতার কাটা।

জলের উপরিভাগে সাঁতার কাটা।

ভোরের দিকে মাছের খাবি খাওয়া।

পুকুর পাড়ে বিভিন্ন জিয়ল মাছের অবস্থান ও জল ছেড়ে শামুক বা গুগলী জাতীয় প্রাণীর পুকুর পাড়ে উঠে আসার প্রবণতা।

কারণ ঃ— জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব।

প্রতিকার ঃ—

জল পরিবর্তন করলে ভাল হয়।

প্যাডেল হুইল বা এরেটরের অথবা অন্য উপায়ে জল সঞ্চালনের মাধ্যমে অক্সিজেন বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রয়োজনে জলাশয়ে মাছের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।

কিছুদিন সার প্রয়োগ ও খাবার বন্ধ রাখতে হবে।

প্রয়োজনে জলে চুন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

লক্ষণ ঃ— ২

দিনের বেলায় সক্রিয়ভাবে মাছ পুকুরের উপর স্তরে সাঁতার কাটা।

কারণ ঃ— দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব অথবা অধিক তাপমাত্রা।

প্রতিকার ঃ—

অক্সিজেনের অভাব মিটাতে আগের মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

অধিক তাপমাত্রার হাত থেকে রক্ষার জন্য কৃত্রিম উপায়ে (লতা-পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি) পুকুরে ছায়ার সৃষ্টি করতে হবে।

পুকুরের জল সঞ্চালন করলেও তাপমাত্রা কমে যাবে।

লক্ষণ ঃ— ৩

মাছের সক্রিয় সাঁতার কাটা পুকুরের পাড়ের দিকে। পুকুরপাড়ে লোকসমাগম হলে মাছের সাঁতার কাটার প্রবণতা বেড়ে যায়।

কারণ ঃ— খাদ্যের অভাব।

প্রতিকার ঃ—

পরিপূরক খাবার দিতে হবে অথবা পরিমান বাড়াতে হবে।

জলে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব।

প্রয়োজনে পুকুরে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের উপস্থিতি ঃ

১। জলজ উদ্ভিদের আধিক্য ঃ

কারণ ঃ—

পুকুরে পাঁক ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না।

পুকুরে ঠিকমতো জাল টানা হয় না।

জল শুকিয়ে পুকুরের মাটি চুন বা ঐ জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঠিকমতো শোধন করা হয় না।

মাঝে মাঝে আগাছা (জলজ) পরিষ্কার করা হয় না।

কি হতে পারে ঃ—

দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান দিনে বৃদ্ধি ও রাতে অস্বাভাবিক কম হতে পারে।

মাছের চলাফেরার অসুবিধা হবে।

জলের পুষ্টিজাত পদার্থের ঘাটতি দেখা দেবে।

মাছের সামগ্রীক বৃদ্ধির হার কমে যাবে ও মাঝে মাঝে মাছ মারাও যেতে পারে।

কি করতে হবে ঃ—

আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

পুকুরে মাঝে মাঝে জাল টানতে হবে।

চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রতিবার মাছ চাষের পর পুকুরের জল তুলে ফেলে পুকুরের তলদেশের মাটি শোধন করা যায়।

রাসয়নিক বা জৈব সার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

এছাড়াও অনেক গুনাগুনের উপর মাছ চাষ নির্ভর করে। তবে সেগুলি মূলতঃ উপরি উক্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই মাছ চাষীর পক্ষে নিজস্ব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এইসব দিক গুলোর দিকে নজর দিলে অতি সহজেই লাভজনক মাছ চাষ করতে পারে। মাছ চাষে আগ্রহ ব্যক্তিদের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকার জল ও মাটির গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে জৈব ও অজৈব সারের মাত্রা, চুনের প্রয়োগ-মাত্রা ইত্যাদি দেওয়া হল।

১। মাটির পি. এইচ্. অনুসারে বিভিন্ন প্রকার চুনের মাত্রা।

মাটির পি. এইচ্.	চুনাপাথর ($CaCo_3$)	কলিচুন ($Ca(OH)_2$)	পোড়াচুন (CaO)
৭.৫—৬.৫	৬০-৩০ কেজি/বিঘা	৫০-৩০০ কেজি/বিঘা	৪০-২৫০ কেজি/বিঘা
৬.৫—৫.৫	৩৫০-৬০০ কেজি/বিঘা	৩০০-৫০০ কেজি/বিঘা	২৫০-৪০০ কেজি/বিঘা

২। রাসায়নিক সারের প্রয়োগমাত্রা ঃ

ক. নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের মাত্রা,

উর্বরতা	ইউরিয়া (কিগ্রা/বিঘা/বৎসর)	অ্যামোনিয়াম সালফেট (কেজি/বিঘা/বৎসর)	প্রয়োজনীয় পরিমাণ (কিগ্রা/বিঘা/বৎসর)
১। অধিকউর্বর(>৫০মিগ্রা/১০০গ্রা. মাটি)	৪৪.৫	১০০	২০
২। স্বাভাবিক(২৫-৫০ মিগ্রা/১০০গ্রা. মাটি)	৬০.০	১৩০	২৫
৩। কম উর্বর(<২৫ মিগ্রা/১০০ গ্রা. মাটি)	৯০.০	২০০	৪০

খ. ফসফেট সারের প্রয়োগ মাত্রা ঃ

উর্বরতা	এস. এস. পি. (কিগ্রা/বিঘা/ বৎসর)	ট্রিপিল সুপার ফসফেট (কেজি/বিঘা /বৎসর)	প্রয়োজনীয় পরিমাণ (কিগ্রা/বিঘা/ বৎসর)
১। অধিক উর্বর (>৬ মিগ্রা/১০০ গ্রা. মাটি)	৫০-৬০	২০-২৫	১০.০
২। স্বাভাবিক (৩-৬ মিগ্রা/১০০ গ্রা. মাটি)	৬০-৮০	২৫-৩৫	২৫.০
৩। কম উর্বর (<৩ মিগ্রা/১০০ গ্রা. মাটি)	৮০-১২৫	৩৫-৫০	২০.০

২। পুকুর পাড়ে ছোটবড় উদ্ভিদের আধিক্য ঃ—

কারণ ঃ—

যেখানে সেখানে ছোট বড় গাছ লাগানো।

পুকুর পাড়ে ঠিকমতো পরিষ্কার না করা।

আলো-বাতাসের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবনের অভাব।

কি হতে পারে ঃ—

গাছের পাতা-ডাল ইত্যাদি জলে পড়ে পচনের ফলে জল দূষিত হতে পারে।

জলে প্রয়োজনীয় তাপ ও আলোর অভাব হতে পারে।

অবাঞ্ছিত প্রাণী যারা মাছের শত্রু তাদের আনাগোনা' বেড়ে যেতে পারে।

মাছ-চাষ সংক্রান্ত কাজকর্মের অসুবিধা হতে পারে।

কি করতে হবে ঃ—

বড় বড় ঝোপ গাছ পুকুর পাড় থেকে কেটে ফেলতে হবে।

পুকুর পাড়ের চারিদিকে ছোটছোট আগাছাও পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

ময়লা আবর্জনা পাতা-ফল ফুল ইত্যাদি যাতে পুকুরে জলে বেশী পড়তে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

মাছের মিশ্র চাষ

ডঃ অনিলাভ কবিরাজ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়

মিশ্র চাষ কি?

একাধিক প্রজাতির মাছ একসাথে চাষ করলেই তাকে মাছের মিশ্র চাষ বলা হয়। মাত্র একটা প্রজাতির মাছ চাষ করলে লাভ হয়না। কারণ পুকুরে মাছের বাসযোগ্য অনেক জায়গা খালি থেকে যায়। পুকুর অনেকটা ফ্ল্যাট বাড়ীর মত। একতলা, দোতলা, তিনতলা — বিভিন্ন তলায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বাস। কোন মাছ থাকে পুকুরের তলদেশে, কোন মাছ থাকে জলের ওপর তলে, আবার কেউ থাকে মাঝামাঝি অঞ্চলে। এইরকম বিভিন্ন প্রজাতির মাছ একসাথে চাষ করলে অনেক বেশী মাছ চাষ করা যায়। এমন কি একই তলে বাস করে কিন্তু ভিন্ন খাদ্যাভাস এমন দুটো প্রজাতিও একসাথে চাষ করা যায়। ভিন্ন খাদ্যাভাস থাকলে এক জায়গায় থাকলেও কেউ কারও সাথে প্রতিযোগিতা করে না। ফলে মাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় না। প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে দেশী মাছ রুই, কাতলা, মৃগেলের সাথে বিদেশী মাছ সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প এবং সাইপ্রিনাস কার্প মিশিয়ে মাছের মিশ্র চাষ করা। তবে এটাই যে আদর্শ মিশ্রন তা কিন্তু নয়। অন্যান্য প্রজাতির মাছ অথবা মাছ ও চিংড়ি একসাথে মিলিয়েও চাষ করা হয়ে থাকে।

মূল উদ্দেশ্য ঃ

পুরো পুকুরকে কাজে লাগানো এবং একাধিক প্রজাতির মাছ অনেক বেশী পরিমান উৎপাদন।

কি করে করবেন?

পুকুর তৈরী করুন ঃ— নূতন পুকুর তৈরী করবেন? বছরের শুরুতেই হাত দিন। পুকুর কাটতে অনেক সময় লাগবে। একটু লম্বাটে আয়তকার করে কাটুন পুকুর। লম্বা দিকটা উত্তর দক্ষিণ হলে ভাল। পুকুরের জলে হাওয়া খেলবে। জলে বেশী পরিমানে অক্সিজেন জমা হবে। পুকুরের পাড়ে এমন ভাবে গাছ লাগান যাতে সকালের রোদ সরাসরি জলে পড়তে বাধা না পায়। ভর দুপুরে গাছের ছায়া জলে পড়লে জল গরম কালে ঠান্ডা থাকে। পরিকল্পনা করে নিন কোন দিকে কি গাছ লাগাবেন। তবে লক্ষ রাখবেন ছায়াতে সব সময় পুকুর ঢেকে না থাকে।

গভীরতা ঃ

আদর্শ পুকুরে গভীরতা পাড় থাকে মাঝ পুকুর পর্যন্ত আস্তে আস্তে বাড়ে। এই ঢালটি বজায়

রাখুন। মাঝ পুকুরে সর্বোচ্চ গভীরতা ২ - ২.৫ মিটার বা ৬ থেকে ৮ ফুটের বেশী হওয়া উচিৎ নয়। ৫ - ৬ ফুটের মধ্যে গভীরতা রাখার চেষ্টা করুন।

সতর্কতা ঃ

● বর্ষার আগে পুকুরের পাড় বাঁধিয়ে নিন। না বাঁধতে পারলে ঘন করে খাগের বীজ ছড়িয়ে দিন।

● পুকুরে বর্ষার বেশি জল জমলে তা বার করে দেবার জন্য নালা রাখুন। নালার মুখে অবশ্যই জাল লাগিয়ে রাখবেন। না হলে মাছ বেরিয়ে যাবে।

● জল ছাড়ার আগে মটর জাতীয় গাছের চাষ করে নিতে পারেন। মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফসল উঠে গেলে গাছের গোঁড়া মাটিতে রেখেই জল ছেড়ে দিন।

পুরোনো পুকুরেই চাষ করবেন?

কোন অসুবিধা নেই। চাষ শুরুর আগে একটু সংস্কার করে নিন। সব আগাছা তুলে ফেলুন। আগাছা গুলো পুকুরের পাড়ে জমা করুন। অথবা গর্ত করে গোবর মিশিয়ে পুঁতে দিন। ২$\frac{১}{২}$ মাস পর ভাল কম্পোস্ট সার তৈরি হয়ে যাবে। পুকুরে কি খুব পাঁক আছে? পাঁক তুলে ফেলুন। পুকুরে কি শোল, ল্যাটা, মাগুর, তেলাপিয়া এসব মাছ আছে? রুই কাতলা চাষ করতে হলে এদের তুলে ফেলতে হবে। তুলে ফেলার সবচেয়ে সহজ উপায় মহুয়া খোল দিয়ে এদের মেরে ফেলা। মরা মাছ তুলে বিক্রি করে দিন। এবার মহুয়া খোল আপনার পুকুরে সারের কাজ করবে।

মহুয়া কতটা দেবেন ঃ— মাঝ পুকুরে গভীরতা কত? পাঁচ ফুট? তাহলে বিঘা প্রতি৩০০ কেজি মহুয়া খোল দিন। গভীরতা কম বেশী হলে সেই মত মহুয়ার মাত্রা ঠিক করে নিন। সাত দিন পর চুন দিন বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি।

কখন করবেন এই কাজ? পুরোনো পুকুর সংস্কারের কাজ বর্ষার আগেই সেরে নিন। মার্চ মাসেই এই কাজে হাত দেওয়া উচিৎ।

এবার পুকুরে প্রথম দফার সার দিন ঃ

মহুয়া খোল দিলে প্রথম দফার সার দেবার দরকার নেই। মহুয়া খোলই প্রথম দফার সার হিসাবে কাজ করবে। মহুয়া না দিলে প্রথমে চুন দিন বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি। দশদিন পর কাঁচা গোবর দিন বিঘা প্রতি ৩০০ কেজি। সাথে কিছু রাসায়নিক সার দিন — যেমন এমনিয়াম সালফেট বিঘাপ্রতি ১০ কেজি ও সিঙ্গল সুপার ফসফেট বিঘাপ্রতি ৫ কেজি। এদের বদলে ইউরিয়াও দিতে পারেন বিঘা প্রতি ৫ কেজি। সব সারই গোটা পুকুরে ছড়িয়ে দিন।

সার কেন দেবেন? সার দিলে পুকুরের জলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মায়। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য বলতে বোঝায় নানা প্রজাতির উদ্ভিদকনা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী। এদের বলা হয় প্ল্যাঙ্কটন। ধানি পোনা প্ল্যাঙ্কটন খেয়েই বড় হয়। একটু বড় হলে তখন কৃত্রিম খাদ্য গ্রহন করে। পুকুরে পর্যাপ্ত উদ্ভিদ কনা থাকলে জলে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে। মাছের শ্বাসকার্যে সুবিধা হয়। ধানি পোনা ছাড়ার আগে দেখেনিন জলে প্ল্যাঙ্কটন হয়েছে কিনা। এরজন্য চাই বিশেষ ধরনের তৈরি সিল্কের জাল। পর্যাপ্ত প্ল্যাঙ্কটন না হলে আরও কিছু গোবর দিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করুন। তারপর পোনা ছাড়ুন পুকুরে।

এবার পোনা ছাড়তে হবে ঃ

পোনা ছাড়ার আগে ঠিককরে নিন কিরকম চাষ করতে চান। ৩-৪ মাস পর পর চারা পোনা তুলে বিক্রি করতে চান? না কি একটানা বারোমাস চাষ করতে চান?

মাঝে মাঝে চারাপোনা তুলে বিক্রি করতে চাইলে ১২ - ১৫ দিন বয়েসের ধানি পোনা ছাড়ুন বিঘা প্রতি ১৫০০। রুই, কাতলা, মৃগেল আর সাইপ্রিনাসের মিশ্রন করুন যথাক্রমে ৬০০, ৬০০, ১০০ আর ২০০ করে। ৩-৪ মাস পর এরা ৪-৫ ইঞ্চি সাইজের চারাপোনা তুলে বিক্রি করে দিন। আরও তিন মাস পর ২০০ - ২৫০ রুই কাতলা বিক্রি করে দিন। বাকি মাছ এক বছর পর তুলে নিন।

একটানা একবছর চাষ করতে চাইলে ৪-৫ ইঞ্চি সাইজের চারাপোনা ছাড়ুন বিঘাপ্রতি হাজার খানেক। রুই, কাতলা, মৃগেল, সাইপ্রিনাসের সাথে গ্রাস কার্প ও সিলভার কার্প ছাড়ুন। মিশ্রন এই ভাবে করুন ঃ রুই ২০০, মৃগেল ১০০, কাতলা ১৫০, সিলভার কার্প ২৫০, গ্রাসকার্প ১০০ ও সাইপ্রিনাস ২০০ ছাড়তে হবে। সিলভার কার্প ছাড়তে না চাইলে কাতলার সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

পোনা কখন ছাড়বেন?

প্রথম দফার সার প্রয়োগের ১৫ - ২০ দিন পর পোনা ছাড়ুন পুকুরে। হাঁড়িতে পোনা আনলে সরাসরি পুকুরে ছেড়ে দেবেন না। হাঁড়ি পুকুরে ঘন্টা দুয়েক ডুবিয়ে রাখুন। হাঁড়ির জল আর পুকুরের জলের তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে। এরপর আস্তে আস্তে হাঁড়ি কাত করে পোনা মিশিয়ে দিন পুকুরের জলে।

দ্বিতীয় দফার সার ঃ

পুকুরে চারাপোনা ছাড়ার দশ দিন পর আবার সার দিন। কারণ প্রাকৃতিক খাদ্য পোনারা ইতিমধ্যে খেয়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছে। ধানি পোনা ছাড়লে দুতিন দিন পরই সার দিতে হবে। গোবর দিন বিঘা প্রতি ৮০ থেকে ১০০ কেজি, এমনিয়াম সালফেট ৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৫ কেজি। শেষের অজৈব সার দুটির পরিবর্তে ইউরিয়াও দিতে পারেন

বিঘা প্রতি ৫ কেজি। এই হারে সার দিয়ে যান প্রতি মাসে। সাথে চুন দিন বিঘা প্রতি ১০ কেজি।

সতর্কতা ঃ

সার দিতে দিতে জল সবুজ বা নীলাভ হলেই সার দেওয়া বন্ধ রাখুন।

সার দেবার মাত্রা নির্ভর করে পুকুরের উর্বরতার ওপর। পর্যাপ্ত প্রকৃতিক খাদ্য না তৈরী হলে সারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারেন।

পরিপুরক খাদ্য ঃ

প্রাকৃতিক খাদ্য পুকুরে যথেষ্ট থাকলেও তা মাছের বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। মাছের দ্রুত বৃদ্ধি পেতে হলে চাই সুষম পরিপুরক খাদ্য। সুষম পরিপুরক খাদ্য হলো সেই খাদ্য যার মধ্যে সঠিক অনুপাতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ লবন বর্তমান। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রোটিন। বৃদ্ধির জন্য চাই প্রোটিনের শক্তি। কৃত্রিম খাদ্যে নূনতম ৩০ - ৩৫ ভাগ প্রোটিন থাকা দরকার। এই প্রোটিন আবার অন্তত ৫০ - ৬০ ভাগ হওয়া উচিৎ প্রাণী জাত। প্রাণীজাত প্রোটিনের উৎস হচ্ছে শুটকি মাছ, ফিস মিল, মুরগির নাড়ীভূঁড়ি, রেশম মথের গুটি ইত্যাদি।

অনেকেই শর্ষের খোল আর চালের কুড়ো সমান ভাবে মিশিয়ে মাছের পরিপুরক খাদ্য তৈরী করেন। এতে কার্বোহাইড্রেট ও চর্বির অভাব হয় না। কিন্তু প্রোটিনের মাত্রা থাকে মাত্র ৫ -৬ শতাংশ। তাই এর সাথে কিছু প্রাণীজাত প্রোটিন মেশানো দরকার।

নিজেই তৈরী করুন মাছের খাবার ঃ— বাজার থেকে কিনে আনুন শুটকি মাছ অথবা ফিসমিল। ভাল করে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিন। শর্ষের খোল, চালের কুড়ো ইত্যাদিও গুড়ো করে নিন। এক ফাইল ভিটামিন মিশ্রন — এম্বিপ্লেক্স ফোর্ট ও এক ফাইল খনিজ লবন মিশ্রন এগ্রিমিন কিনে আনুন। এবার এদের মেশান। দুটো নমুনা দেওয়া হলো ঃ

নমুনা - ১ (ধানি পোনার জন্য)

ফিসমিল — ৭১ ভাগ
চালের কুড়ো — ৫ ভাগ
ময়দা — ১০ ভাগ
শর্ষের খোল — ১০ ভাগ
ভিটামিন মিশ্রন — ২ ভাগ
খনিজ লবন মিশ্রন — ২ ভাগ

নমুনা - ২ (চারা পোনার জন্য)

শুটকিমাছের গুঁড়ো — ২৬ ভাগ
চালের কুড়ো — ২৫ ভাগ
ময়দা — ২৫ ভাগ
শর্ষের খোল — ২০ ভাগ
ভিটামিন মিশ্রন — ২ ভাগ
খনিজ লবন মিশ্রন — ২ ভাগ

উপাদান গুলো মিশিয়ে জল দিয়ে মন্ড করুন। পরে দানা করে রোদে শুকিয়ে নিন। এরপর ভাল করে প্যাকেটে মুড়ে রাখুন অথবা সাথে সাথে পুকুরে দিয়ে দিন। নমুনা — ১ এ প্রোটিনের পরিমান একটু বেশী — শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ। ধানি পোনার প্রোটিন চাহিদা একটু বেশি। তাই নমুনা — ১ ধানি পোনার জন্য ব্যবহার করুন। নমুনা — ২ এ প্রোটিনের মাত্রা — শতকরা ২৮ - ৩০ ভাগ। এই খাবার চারা পোনা বা বড় মাছেদের দিন।

কতটা খাবার দেবেন ঃ

প্রথম মাসে মাছের দেহের ওজনের শতকরা দশ ভাগ খাবার দিন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাস থেকে এই পরিমান কমিয়ে শতকরা ৫ ভাগ করে দিন। নিজেই হিসাব করে নিন মোট কত খাবার দেবেন।

$$\text{খাবারের পরিমান (কেজি/প্রতিদিন)} = \frac{\text{মাছের সংখ্যা} \times \text{একটি মাছের ওজন} \times \text{খাবারের অনুপাত}}{১০০ \times ১০০০}$$

উদাহরণ ঃ

ধরুন পুকুরে মোট ১০০০০ মাছ আছে। এক একটি মাছের গড় ওজন ২ গ্রাম। খাবার দিতে চান মাছের দেহের ওজনের শতকরা ১০ ভাগ।

$$\text{খাবার দিতে হবে} = \frac{১০০০ \times ২ \times ১০}{১০০ \times ১০০০} = \text{২ কেজি প্রতিদিন}$$

কিভাবে খাবার দেবেন ঃ

খাবার পুকুরের চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়াই ভাল। অনেকে বস্তায় খাবার বেঁধে বস্তা ফুটো করে বাঁশে করে ঝুলিয়ে রাখে। এতে কিন্তু সব মাছ খাবার পায়না। বিশেষ করে মৃগেল, সাইপ্রিনাস ইত্যাদি পুকুরের তলদেশের মাছ। মোট খাবার একবারে না দিয়ে ভাগকরে সারাদিন তিন চার বারে দিন।

গ্রাস কার্পের খাবার ঃ

পুকুরের গ্রাসকার্প থাকলে এদের জন্য আলাদা খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানি পোনাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না করলেও চলে। কিন্তু চারা পোনাদের জন্য জলজ পানা কুচো করে কেটে ছড়িয়ে দিন পুকুরে। বাঁশের ফ্রেম করে তার মধ্যে পানাকুচি দিন। তাহলে মাছের খেতে সুবিধে হবে। গ্রাস কার্পের প্রিয় পানা হচ্ছে খুদি পানা, তেপাতি পানা, সুজি পানা, ঝাউছাজি ইত্যাদি। পুকুরের পাড়ে শাক শবজি চাষ করলে তার ডালপালাও কুচো করে

জলে দেওয়া যেতে পারে গ্রাস কার্পের খাদ্য হিসাবে।

সতর্কতা ঃ

- লক্ষ রাখুন জল যেন গাঢ় সবুজ বা নীল না হয়ে যায়। এরকম হলে সার ও কৃত্রিম খাবার দেওয়া বন্ধ রাখুন।
- মাঝে মাঝেই পুকুরে জাল দিন।
- সম্ভব হলে এয়ারেটর দিয়ে জলে হাওয়া দিন। জলে অক্সিজেন বাড়বে। সম্ভব না হলে পাম্পকরে কিছু জল বার করে দিন ও নূতন জল ঢোকান ফোয়ারা করে। ধানি পোনা ছাড়লে অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতেই হবে।
- মেঘলা দিনে খাবার বন্ধ রাখুন।
- জাল দিয়ে দেখুন মাছের গায়ে বা ফুলকায় ঘা হয়েছে কিনা। এমন হলে মাছধরে এক বালিতি জলে এক চিমটে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ফেলে তার মধ্যে মাছ একমিনিট চুবিয়ে আবার পুকুরে ছেড়ে দিন।
- ১৫ দিন পর আবার দেখুন ঘা সেরেছে কিনা। না সারলে আবার একই রকম ভাবে মাছের পরিচর্যা করুন। আর পুকুরে কিছু পরিমাণ (বিঘা প্রতি ১০ কেজি) চুন ছড়িয়ে দিন।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ

জৈব সার	প্রথম দফা	মাসিক কিস্তি
কাঁচা গোবর	বিঘা প্রতি ৩০০ কেজি	বিঘা প্রতি ৮০-১০০ কেজি
অথবা		
মুরগীর মল	বিঘা প্রতি ৩০ কেজি	বিঘা প্রতি ৫ কেজি

অজৈব সার	প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	বিঘা প্রতি ৫ কেজি প্রতি মাসে
এমনিয়াম সালফেট	প্রথমে বিঘা প্রতি ১০ কেজি তারপর প্রতি মাসে বিঘা প্রতি ৫ কেজি
সিঙ্গল সুপার ফসফেট অথবা ট্রিপল সুপার ফসফেট	বিঘা প্রতি ৫ কেজি
ক্যালসিয়াম এমনিয়াম	বিঘা প্রতি ৫ কেজি

● ইউরিয়া, এমনিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের যেকোন একটি দিন।

জলের নমুনা পরীক্ষা ঃ

পি. এইচ্. ঃ পি. এইচ্. পরীক্ষার জন্য পি. এইচ্. কাগজ পাওয়া যায়। এই কাগজ জলে চোবালেই এর রঙ বদলে যায়। কাগজের সাথে রঙের তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকা দেখে পি. এইচ্. নির্নয় করুন।

কোথায় পাবেন ? সেন্ট্রাল এভিনিউতে (কোলকাতা) ট্রপিকাল মেডিসিনের উল্টোদিকে বেশ কয়েকটি দোকান আছে। এখানেই পি. এইচ্. পেপার (কাগজ) ও মাছ চাষের অন্যান্য জিনিষ পাবেন।

প্ল্যাঙ্কটন ঃ প্ল্যাঙ্কটন হয়েছে কিনা জলে দেখতে হলে ওপরের দোকানগুলো থেকে কিনে আনুন প্ল্যাঙ্কটন জাল।

তাপমাত্রা ঃ তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার কিনুন ঐ দোকান থেকে। ওযুধের দোকানের থার্মোমিটার কিন্তু কোন কাজে লাগবে না।

জিওল মাছের চাষ

মিলন সিন্‌হা ও দেবব্রত দাস

মৎস্যচাষ কেন্দ্র, জয়নগর

আমাদের দেশে চাষযোগ্য এমন কিছু মাছ আছে যাদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রয়োজন তেমনি বায়ুর অক্সিজেনও দরকার। আর এই কারণে এই সমস্ত মাছের ফুলকা ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। এদেরই আমরা সাধারণভাবে বলি 'জিওল মাছ'। যেমন, মাগুর, শিঙ্গি, কৈ, শাল, শোল, চিতল, ফলুই ইত্যাদি। এইসব মাছ জলের বাইরেও অনেকক্ষণ বাঁচতে পারে।

চাষযোগ্য জিওল মাছ ঃ— জিওল মাছ অনেক থাকলেও দ্রুত বৃদ্ধি, চাষের সুবিধা, ক্রেতার পছন্দ, পুষ্টিগুণ, বাজারদর ইত্যাদি বিচার করলে দেখা যায় মাগুর মাছই অন্যান্য জিওল মাছের তুলনায় চাষ করা অনেক বেশী সুবিধাজনক।

মাগুর মাছের চাষ সম্প্রসারিত করার প্রধান কারণসমূহ ঃ—

১) **উচ্চ পুষ্টিগুণ ও বাজার দর ঃ-** অনেক মাছের তুলনায় মাগুর মাছে প্রোটীনের শতকরা পরিমান বেশী এবং আয়রণের পরিমান বেশী। অথচ, ফ্যাট কম তাই সহজ পাচ্য। সেজন্য রোগীর খাদ্য এবং শিশুখাদ্য হিসাবে এর উপযোগিতা প্রচণ্ড। তাছাড়া, এ মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু ও কাঁটাবিহীন। ফলতঃ, ক্রেতার অত্যন্ত পছন্দের। স্বাভাবিক কারণে অন্যান্য মাছের তুলনায় এর বাজারদর বেশী। সুতরাং, এ মাছ চাষ করলে চাষীর তুলনামূলক লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

২) **অব্যবহৃত মরসুমী জলাশয় এবং অনিয়ন্ত্রিত জলাশয়ের ব্যবহার ঃ-** পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় পরিমান জলাশয়-এ সারা বৎসর জল থাকে না। বর্ষার সময় ভর্ত্তি হওয়া এই অগভীর জলাশয়গুলিতে সাধারণতঃ ৬-৭ মাস জল থাকে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে বহু বড় বড় খাল-বিল ইত্যাদি জলাশয় রয়েছে। অগভীর জলাশয়ে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান কম থাকায় সাধারণভাবে পোনামাছ চাষের অযোগ্য। পক্ষান্তরে, মাগুর মাছ *Air breathing* হওয়ায় অত্যন্ত সহজে এই জলাশয়গুলিতে চাষ সম্ভব এবং এই স্বল্পকালীন চাষে যা বৃদ্ধি হবে তাতে তা বাজারীকরণ যোগ্য। ফলতঃ, মাগুর মাছ চাষের মাধ্যমে এভাবে এক ব্যাপক পরিমান প্রায় অব্যবহৃত জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভবপর। ঠিক একইভাবে অব্যবহৃত অনিয়ন্ত্রিত জলাশয় (খাল-বিল)-এ বাঁশের আয়তঘনাকার অর্ধনিমজ্জিত খাঁচার মধ্যে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যাপকভাবে মাগুর চাষের মাধ্যমে জলাশয়ের কার্যকরী ব্যবহার সম্ভব।

৩) **ধানচাষের সাথে সমন্বিত চাষের সুবিধা ঃ-** পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে (বিশেষতঃ দঃ ২৪ পরগণা, উঃ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর) প্রচুর পরিমানে নীচু ধানজমি আছে যাতে প্রায় পাঁচ-ছমাস গড়ে ৩ ফুট উচ্চতায় জল থাকে। এই সমস্ত জমিতে ধান চাষের সাথে মাছের সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে মাগুর মাছকে পছন্দের প্রজাতি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই খানের জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে কিন্তু, মাগুর *Air breathing* হওয়ায় তাদের এতে সমস্যা হয় না। উপরন্তু, ধান জমিতে থাকা প্রাণীকণা এবং পোকামাকড় মাগুরের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ থাকে। পাশাপাশি, মাগুরের ঠুকরানো স্বভাবের জন্য ধানগাছের গোড়ায় জন্মানো শ্যাওলার (যাকে গ্রাম্য চাষীরা 'রুমনে' বলে) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ধানগাছ মুক্ত থাকে। আর, চাষী ধানের সাথে সাথে মাছ থেকেও কিছু পরিমান পয়সা অতিরিক্ত আয় করে।

৪) **কম রোগপ্রবণ এবং পোনামাছের রোগজীবানু দ্বারা আক্রান্ত না হওয়ার সম্ভাবনা ঃ-** সাধারণতঃ পোনামাছ অত্যন্ত রোগপ্রবণ কিন্তু, আঁশযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও মাগুর মাছের রোগপ্রবণতা অনেক কম। তাছাড়া, সাধারণতঃ পোনামাছের রোগজীবানু দ্বারা মাগুর মাছ আক্রান্ত হয় না। ফলতঃ কোনও জলাশয়ে কোনও কারণে পোনামাছ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে সেই জলাশয়ে পোনামাছের পরিবর্তে মাগুর চাষ সম্ভবপর।

৫) **বাজারীকরণের জন্য বেশী সময় ধরে পরিবহনের সুবিধা ঃ-** প্রত্যন্ত গ্রামে পোনামাছের চাষ করলে যথোপযুক্ত বাজারদর পাওয়ার জন্য তাকে দূরবর্তী শহরের বাজারে পাঠাতে হয়। পোনামাছ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পচে যেতে শুরু করে। কিন্তু, মাগুর মাছ জলছাড়া অবস্থায় বহুক্ষণ বাঁচতে সক্ষম হওয়ায় দূরবর্তী বাজারে তাকে বিক্রি করতে অসুবিধা হয় না।

মাগুর মাছের চারার প্রাপ্তিস্থান ও সময় ঃ—

কয়েক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিং, হেলডাঙ্গা, ইটিণ্ডাঘাট, বসিরহাট, মালঞ্চ, ধামাখালি ইত্যাদি অঞ্চলে মাগুর মাছের বীজ প্রচুর পরিমানে পাওয়া যেত। কিন্তু, ব্যাপক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার জন্য বর্তমানে প্রাকৃতিক বীজই প্রধান ভরসা। এব্যাপারে, আমাদের হ্যাচারী 'মৈনাক ফিস ব্রিডিং সেন্টার' অন্যতম অগ্রণী। তাছাড়া, পঃ বঃ মৎস্য দপ্তরের অধীন 'কুলিয়া মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র' এবং 'নীমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে' মাগুর মাছের চারা পাওয়া যায়। এই চারা পাওয়ার সময় সাধারণতঃ জুন থেকে অক্টোবর মাস।

পুকুরে মাগুর মাছের চাষ ঃ— সাধারণতঃ মাগুর মাছের চাষ দুভাবে করা যেতে পারে - (১) মিশ্রচাষের পুকুরে পোনামাছের সাথে, (২) এককভাবে মাগুর চাষ।

এককভাবে মাগুর মাছ চাষ ঃ- সাধারণতঃ এককভাবে মাগুর মাছের চাষ পাঁচ থেকে ছ মাসের। এক্ষেত্রে বিঘা প্রতি জলাশয়ে সর্বাধিক সাতহাজার (৭০০০) মাগুর মাছ চাষ করা যেতে পারে। এ ধরনের একক মাছ চাষে পর্যায়ক্রমিক করণীয় কাজগুলি হোল ঃ-

১) **পুকুর নির্বাচন ঃ-** ছোট অগভীর পুকুর, যেখানে জলের গভীরতা ২-৩ ফুট, তাদেরকেই মাগুর মাছ চাষের পক্ষে আদর্শ মনে করা যেতে পারে। পতিত বা হাজা-মজা পুকুরে মাগুর চাষ করা সম্ভব। পুকুরের আকার বিঘা খানেক মত হলে ভাল হয়। যে সমস্ত পুকুর পোনামাছের চাষের উপযুক্ত নয় কিন্তু বছরে অক্টোবর থেকে এপ্রিল-মে পর্যন্ত ৫/৬ মাস জল থাকে অথবা চারা তুলে নেবার পর পোনামাছের আঁতুর বা পালন পুকুরে এই মাছ চাষ করা যায়।

২) **পুকুর প্রস্তুতি ঃ-** বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষের ক্ষেত্রে প্রথমে পুকুর থেকে জলজ আগাছা অপসারণ করতে হবে। তারপর জাল দিয়ে বা প্রয়োজনমত মহুয়ার খইল প্রয়োগ করে (বিঘা প্রতি তিন ফুট বা দুহাত জলের গভীরতার জন্য ১৩০ কেজি) অবাঞ্ছিত মাছ তুলে ফেলতে হবে। মহুয়া খইল দেওয়ার ৭ দিন বাদে বিঘা প্রতি ৩০ থেকে ৪০ কেজি চুন গুলে সমভাবে পুকুরের জলে ছড়িয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগের পরের দিন তলার মাটি ঘেটে দিতে হবে। এতে জৈব পদার্থের দ্রুত বিয়োজনেও মাগুর মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। এই মাছের বাচ্চা মজুত করার আগেই প্রয়োজন হলে পুকুরের পাড় অবশ্যই মেরামত করতে হবে। এই চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

৩) **চারা মজুত পদ্ধতি ঃ-** আগষ্ট-অক্টোবর পর্যন্ত ৩-৪ ইঞ্চি মাছের চারা মজুত করতে হবে। মজুত করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারাগুলি সুস্থ, সবল ও শুঁড়যুক্ত হয়। বাচ্চাগুলি পুকুরে ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। শোধন করার জন্য লিটার প্রতি ০.৩ শতাংশ অ্যাক্রিফ্লাভিন মেশানো জলে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে ছাড়তে হবে। আর, চারামাছ যদি প্রাকৃতিক উৎসের হয় তাহলে ১০-১৫ গ্রাম ওজনের চারা মাছ ছাড়া উচিত। সাধারণতঃ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই চারাগুলি পাওয়া যায়।

৪) **পরিপূরক খাদ্যের পরিবেশন ঃ-** পুকুরে ছাড়ার পরের দিন থেকেই পরিপূরক খাবার দেওয়া দরকার। পরিপূরক খাদ্যে প্রোটীনের শতকরা পরিমান ৩০ শতাংশ হওয়া চাই। আমিষ জাতীয় খাবারই এই মাছের বেশী পছন্দ এবং সেই জাতীয় খাবারেই এই মাছের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। মাগুর মাছ সাধারণতঃ রাতের দিকে খেতে বেশী ভালোবাসে। তাই, দিনের মোট খাবারের ৩/৪ ভাগ সন্ধ্যাবেলায় পরিবেশন করে ১/৪ ভাগ সকাল ৮ টা নাগাদ, যখন জলের অক্সিজেনের পরিমাণ অন্তত ৫ পি পি এম তখন পরিবেশন করা উচিত।

পরিপূরক খাদ্যের কয়েকটা উপকরণ ও তাদের অনুপাত দেওয়া হোল, যাতে সকলেই তাদের অনুপাত দেওয়া হোল, যাতে সকলেই তাদের সুবিধামত খাদ্য মিশ্রণ ব্যবহার করতে পারেন ঃ-

ক) স্বল্প মূল্যের শুটকি মাছ/চিংড়ি/রেশম গুটি পোকার গুড়ো, চালের কুড়ো, বাদাম খইলের গুঁড়ো = ১:১:১ অনুপাতে

খ) সামুদ্রিক মাছের গুঁড়ো : বাদাম খইলের গুঁড়ো : গোবর গ্যাস স্লারি = ১:১:১

গ) ঝিনুক বা শামুকের মাংস : বাদাম খইলের গুঁড়ো : চালের কুঁড়ো = ১:১:১

ঘ) মুরগীর নাড়িভুড়ি সিদ্ধ : সয়াবিন খইলের গুঁড়ো : চালের কুঁড়ো = ১:১:১

ঙ) মাছের নাড়িভুড়ি : সয়াবিন খইলের গুঁড়ো : চালের কুঁড়ো = ১:১:১

চ) সামুদ্রিক মাছ সিদ্ধ : সয়াবিন খইলের গুঁড়ো : চালের কুঁড়ো = ১:১:১

মিশ্র খাবার ছোট ছোট ঝুড়িতে বা মাটির মালসাতে ভরে পুকুরের মধ্যে একাধিক স্থানে ডুবিয়ে রাখা উচিত। ইহার সুবিধা হোল এই যে মাছের খাদ্যগ্রহণ কম বেশী হচ্ছে কিনা বোঝা যায় এবং অতিরিক্ত খাদ্য প্রতিদিন কিছু থাকলে পরের দিন সেটা তুলে ফেলে দেওয়ার সুবিধা থাকে। ফলতঃ, অতিরিক্ত খাদ্য পচনে জলের গুণমান নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

মাগুর মাছের চারার সংখ্যা ও পরিপূরক খাদ্যের তালিকা : বিঘা প্রতি ৭০০০ চারার জন্য

চাষের সময়	মোট খাবার/দিন	শুকনো মাছ : চালের গুঁড়ো : সয়াবিন খইল
প্রথম মাস	১ কেজি ৩০০ গ্রাম	২ : ১ : ১
দ্বিতীয় মাস	২ কেজি ৮০০ গ্রাম	১ : ১ : ১
তৃতীয় মাস	৪ কেজি ৫০০ গ্রাম	১ : ১ : ১
চতুর্থ মাস	৯ কেজি ০০০ গ্রাম	১ : ১ : ১
পঞ্চম মাস	৮ কেজি ০০০ গ্রাম	১ : ১ : ১
ষষ্ঠ মাস	৭ কেজি ০০০ গ্রাম	১ : ১ : ১

৫) **পালিত মাছের যত্ন ও পরিচর্যা ঃ-** চাষের সময়কালীন প্রতি মাসে একবার খ্যাপলা জালের সাহায্যে ৪০-৫০টি মাছ ধরে নমুনা পরীক্ষা করা দরকার। সেই সঙ্গে মাছের স্বাস্থ্য ও তাদের বৃদ্ধির হারও মাপা দরকার। মাছের বৃদ্ধির হারের সাথে সমতা বজায় রেখে প্রয়োজনে পরিপূরক খাদ্যের পরিমাণও বাড়ানো যেতে পারে।

৬) **মাগুর মাছ চাষের সমস্যা ও তার প্রতিকার ঃ-** মাগুর মাছ চাষে পরিপূরক খাবার দেওয়ার ফলে গরমকালে যখন মাছের বৃদ্ধির হার খুব বেশী সেই সময় কতকগুলি

সমস্যা দেখা দেয়। যেমন —

ক) **জলের উষ্ণতা ঃ-** জলের গভীরতা কম থাকলে গরমের সময় চাষের পুকুরের জলের উষ্ণতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গরমকালে জলের গভীরতা অন্ততঃ ১ মিটার রাখলে এই সমস্যা থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। কোনওমতেই জলের উষ্ণতা ৩৫° সেন্টিগ্রেড এর উপরে ওঠা চলবে না।

খ) **শ্যাওলার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঃ-** গরমে অতিরিক্ত অ্যালগি জন্মালে জলের স্বচ্ছতা হ্রাস পায়। রাতে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান কমে। পরিপূরক খাদ্য ব্যবহার করলেও অতিরিক্ত পরিমানে অ্যালগি জন্মানোর প্রবণতা থাকে। অতিরিক্ত অ্যালগি জন্মালে পুকুরের জল আংশিক পাল্টাতে পারলে ভাল হয়। সেইসময় খাবার বন্ধ রাখতে হবে কয়েকদিন। এছাড়া, তুঁতের ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

মাগুর মাছের রোগ ও তার প্রতিকার ঃ—

ক) **মাগুরের ব্যাকটিরিয়াঘটিত রোগ ঃ-** নানা কারণে মাগুরের কখনো কখনোও গায়ে ঘা, ঠোঁট লালচে হওয়া এবং সেই সঙ্গে শুঁড় খসে পড়তে দেখা যায়। এটা সাধারণতঃ সিউডোমোনাস প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ঘটে থাকে। প্রতিকার হিসাবে প্রতি কেজি পরিপূরক খাদ্যের সাথে ১০০ মিলিগ্রাম টেরামাইসিন বা সালফাডাইযাজিন প্রয়োগ করলে রোগের উপশম হতে দেখা যায়।

খ) **মাগুরের পেটে জলজমা রোগ ঃ-** এই রোগের লক্ষণ হোল মাগুরের পেট ফুলে ওঠে। স্বাভাবিক গতি ব্যহত হয়। এই রোগে কেজি প্রতি পরিপূরক খাবারে ১০০ মি.গ্রা. অ্যান্টিবায়োটিক (টেরামাইসিন ইত্যাদি) ৭ দিন ধরে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

গ) **কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে পেট ফোলা রোগ ঃ-** এই রোগে আক্রান্ত মাছকে তৎপরতার সাথে পুকুর থেকে তুলে ফেলে দিতে হবে।

মাছের উৎপাদন ও মাছ ধরা ঃ— মাগুর মাছ ৫/৬ মাসে বিক্রয় উপযোগী হয়। এ মাছের বৃদ্ধি পুরোপুরি পরিপূরক খাদ্যের গুণাগুণ ও তা খাওয়ানোর উপর নির্ভরশীল। আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে (যেখানে মাছের ঘনত্ব ৭০০০/বিঘা) মাগুর মাছ সাধারণতঃ ৫/৬ মাসে ১২৫-২৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এ ধরনের চাষে মাছের বাঁচার হার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। ৫/৬ মাসে বিঘা প্রতি শুধু মাগুর চাষে ৫৫০ কেজি - ৭৫০ কেজির মত উৎপাদন পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মকালে যখন পুকুরের জল কমে যায় তখন ফলন তোলা সুবিধাজনক। তাছাড়া পুকুর

জলশূন্য করে হাত জাল/ছাকনী জাল বা শুধু হাত দিয়ে ফলন তুলে নেওয়া সহজ এবং পুকুরটি আবার বর্ষায় ডিম/ধানীপোনা চাষে কাজে লাগানো যেতে পারে।

মাগুর চাষের আয় ব্যয়ের হিসাব ঃ (১ বিঘার জন্য)

১)	মহুয়া খইল	১৩০ কেজি - ৬ টাকা/কেজি — ৭৮০ টাকা
২)	চুন (কলিচুন)	৪০ কেজি - ৫ টাকা/কেজি — ২০০ টাকা
৩)	মাগুর চারা	৭০০০ সংখ্যার - ১.৫০ টাকা/চারা — ১০৫০০ টাকা
৪)	পরিপূরক খাদ্য	
	ক) শুকনো মাছ-এর গুঁড়ো	৪০০ কেজি - ১৫.০০ টাকা/কেজি — ৬০০০ টাকা
	খ) চালের কুঁড়ো	৪০০ কেজি - ১.৫০ টাকা/কেজি — ৬০০ টাকা
	গ) সয়াবিন খইল	৪০০ কেজি - ৭.০০ টাকা/কেজি — ২৮০০ টাকা
৫)	পুকুরের ইজারা	১০০০ টাকা
৬)	মাছ ধরা ইত্যাদির খরচ	৭৫০ টাকা
৭)	আনুষঙ্গিক খরচ	৭৫০ টাকা
	মোট ব্যয় —	২৩,১৩০ টাকা

মোট আয় — ৬০০ x ৮০ = ৪৮,০০০ টাকা

মাছ বিক্রি থেকে আয় ৬০০ কেজি

প্রতি কেজি ৮০ টাকা

মোট লাভ —

৪৮,০০০ - ২৩,১০০ = ২৪,৯০০ টাকা

আনুমানিক মোট লাভ = ২৫,০০০ টাকা

পুকুরে গলদা চিংড়ী ও পোনা মাছের যৌথ চাষ

শ্রী বিমল সেনগুপ্ত
মৎস্য বিজ্ঞানী, প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা, মৎস্য বিভাগ, পঃ বঃ সরকার

আমরা পুকুরে মাছ চাষ করে থাকি। মাছের সাথে গলদা চিংড়ি ও চাষ করা যায়। গলদা চিংড়ি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। মাছের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে। এর বাজার দরও ভাল এবং বর্তমানে বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

গলদা চাষের পুকুরের জল ও মাটি এবং পরিবেশ কেমন হবে?

পুকুরের জল ও মাটি পরিষ্কার হলে ভাল হয়। পুকুরের তলদেশের মাটি সমতল ও পরিষ্কার হলে ভাল হয়। তলদেশে পাঁক কম থাকবে ও অল্প বালির ভাগ থাকলে ভাল হয়। অর্থাৎ বেলে দো-আঁশ। ১০০ ভাগের মধ্যে বালি ২৫ ভাগ, পলি ৩৫ ভাগ এবং কাদা ৪০ ভাগ থাকলেই গলদার বাড় ভাল হবে। পুকুরে মাছ ও চিংড়ির খাবার তাড়াতাড়ি হবে।

জল ঃ—

পুকুরের জল পরিষ্কার হলে ভাল হয়। জলে বেশী অক্সিজেন থাকতে হবে কারণ চিংড়ির অক্সিজেনের চাহিদা বেশী। জলের গভীরতা ৪' — ৫' থাকা দরকার। চিংড়ি প্রতিমাসে একবার করে খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়ার পর এরা খুব দুর্বল থাকে এবং নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সেইজন্য চাষের পুকুরে ঝাঁঝি, পাতা শ্যাওলা, বা কাঁটা ঝাঝি থাকলে ভাল। অন্যথায় পুকুরের তলায় কিছু ডাল, খেজুর বা নারকেল পাতা পুঁতে দিলে চিংড়িমাছ নিরাপদ আশ্রয় পাবে এবং এখানে তৈরী হওয়া খাবারও পাবে।

চিংড়ি পুকুরের তলদেশে খাবার খায়। তাই পুকুরের তলায় যে সব মাছ খাবার খায় যথা সাইপ্রিনাস ও মৃগেল চিংড়ির সাথে চাষ না করাই ভাল। জলের তলায় থাকে এমন পোকামাকড়, পাতা শ্যাওলা, পচা জৈব গুগলী, গেঁড়ি, শামুক সবই চিংড়ির খাবার।

পুকুরের আয়তন ঃ—

০.২ — ০.৬ হেক্টর আয়তনের পুকুর চাষের পক্ষে উপযোগী। পুকুরের পাড় উঁচু ও মজবুত হলে ভাল হয়।

পুকুর তৈরী করা ঃ—

চাষের পুকুর গরমের সময় শুকিয়ে গেলে তলাকার মাটি লাঙ্গল দিয়ে চষে প্রতি হেক্টর

জলায় ভাল চুন জলে ভিজিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হয়। তারপর ঐ মাটি ৭ - ১০ দিন ফেলে রাখতে হবে। পুকুর তৈরী করতে হয় গরমের শুরু থেকে।

এরপর পুকুরে ১ʹ গভীরে জল ঢুকিয়ে প্রতি হেক্টর পুকুরে ১০০০ কেজি গোবর এবং ৩৫ কেজি ইউরিয়া ও ৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট জলে মিশিয়ে পুকুরের জল ভাল করে ছিটিয়ে দিতে হবে।

জল ছিটিয়ে দেওয়ার ১০ - ১২ দিনের মধ্যেই চিংড়ির জন্য অনেক খাবার তৈরী হবে। তখন পুকুরে ৪ʹ - ৫ʹ পর্যন্ত জল ঢুকিয়ে চিংড়ির চারা ছাড়তে হবে।

পুকুরে সারা বৎসর জল থাকে এবং চিংড়ির ক্ষতিকরে এমন আগাছা, জিওল মাছ, আড়, বোয়াল, তুলে ফেলার জন্য মহুয়া খোল দিতে হবে। প্রতি হেক্টর জলায় ১ মিটার গভীরতার জন্য ২০০০ কেজি মহুয়া প্রয়োগ করতে হবে। মহুয়া খৈল দেওয়ার ৪ - ৫ ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত মাছ ভেসে উঠতে শুরু করবে। তখন মাছ গুলোকে ধরে ফেলতে হবে। জলের গভীরতা কম থাকলে মহুয়াখোলের পরিমানও কম লাগবে এবং চিংড়ির খাবারও তাড়াতাড়ি তৈরী হবে।

মহুয়া খৈল দেবার ৭দিন পরে ৩০০ কেজি চুন, ৩৫ কেজি ইউরিয়া ও সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৫০ কেজি দিয়ে ভালকরে ঘাটিয়ে দিতে হবে এবং ২১ দিন পরে চিংড়ির বীজ মজুত করতে হবে।

চিংড়ির চারা মজুত করা ঃ—

বর্ষার শুরুতে পুকুর তৈরী করে চিংড়ির চারা ছাড়তে হবে। চারা মজুত করার পূর্বে এদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ জলাশয়ের তাপমাত্রা বা লবনতার তারতম্য থাকতে পারে যাতে চারার মড়ক হওয়ার সম্ভব। বীজের মৃত্যুর হার কমাতে হলে ছোট চারা নার্শরীতে প্রতিপালন করা উচিত। আতুর পুকুরে বা পালন পুকুরে পোষ্টলার্ভা মজুতের হার ১০ - ২০ লক্ষ প্রতি হেক্টর। মজুত পুকুরে ৪ - ৬ সেমি. মাপের চারা ছাড়াই ভাল। চারা মজুত করার হার কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন চারার মাপ, জলাশয়ের রকম, একক চাষ বা মিশ্রচাষ, সহযোগী মাছের জাতি ও সংখ্যা, জল ও মাটির উর্বরতা, সারের রকম ও পরিমান, পরিপূরক খাদ্যের গুন ও পরিমান এবং জল সঞ্চালনে ইত্যাদি ব্যবস্থার সুবিধা গলদা চিংড়ির চাষ একক ভাবে করা যায়। তবে যেখানে কিছু উপরতলে বিচরনকারী প্ল্যাংটন ভোজী মাছ যেমন সিলভার কার্প, বিগহেড পার্শে, ভাঙ্গন *(bloom)* ইত্যাদি ছাড়া হয়। এরা অত্যধিক প্লাংটনের বৃদ্ধি রোধকরে আবার উৎপাদনও বাড়ায়।

মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে তলদেশে বিচরণকারী মৃগেল, গ্রাইপিনাস ইত্যাদি ছাড়া উচিৎ নয়। উপর ও মাঝের তলে বিচরনকারী মাছের মোট সংখ্যা ৩০০০ - ৫০০০ / হেক্টর হওয়া উচিত।

মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে গলদা চিংড়ির চারা (৪ - ৬ সেমি) সংখ্যায় ১০ - ১৫ হাজার প্রতি হেক্টরে ছাড়া চলে। আর একক চাষে ২৫ - ৩০,০০০ প্রতি হেক্টর ছাড়া যায়। তবে জলাশয়ে পরিপূরক খাদ্য, জল ও বায়ু সঞ্চালন যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকলে ৫০,০০০ পর্যন্ত চারা মজুত করা যেতে পারে।

চাষের পদ্ধতি ঃ—

এই চাষ দুইভাবে করা যায় — বিরামহীন চাষ এবং দলে দলে চাষ। প্রথম পদ্ধতিতে জলাশয়ে চারা ছাড়ার ৩-৪ মাস বাদে চিংড়ি বাজারজাত করার উপযুক্ত হয় অর্থাৎ ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের মাছ তুলে ফেলা হয়। আবার নূতন ভাবে কিছু চিংড়ির চারা ছাড়া হয়। এইভাবে প্রায় প্রতিমাসেই কিছু কিছু চিংড়ি ধরা হয় এবং নূতন কিছু চারা ছাড়া চলতে থাকে। বৎসর শেষে শীতের মুখে যথাসম্ভব চিংড়ি তুলে নেওয়া হয়। এইভাবে তিনবছর পর্য্যন্ত এ চাষ চলতে থাকে এবং তারপর পুকুর শুকিয়ে তলদেশে শোধন করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ৬-৮ মাসের মধ্যে মজুত করা সমস্ত চিংড়ি একেবারে তুলে নিয়ে পুকুর শুকানো হয়। এই পদ্ধতির চাষে পুকুরে বড় চারা মজুত করে বৎসরে ২টি ফসল তোলা যায় এবং হেক্টর প্রতি জলায় ২৫০০-৪০০০ কেজি পর্য্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে এক বৎসরে।

খাদ্য প্রয়োগ ও পরিচালন ব্যবস্থা ঃ—

চিংড়ির জন্য দৈনিক খাদ্যের পরিমান চারাগুলির মোট ওজনের ৫-১০%। নার্শারিতে মোট চারার জন্য খাদ্য গুঁড়ো আকারে দিতে হবে ২-৩ বার। মজুত পুকুরে বড় চারার জন্য খাদ্য দিতে হবে ১-২ বার এবং সন্ধ্যাতেই বেশী দিতে হবে। কারণ চিংড়ি রাত্রেই বেশী খায়। খাদ্যের উপাদান হিসাবে জৈব প্রোটিন জাতীয় এবং তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য মিশ্রিত করে প্রয়োগ করা হয়। ফিসমিল, কুড়ো চিংড়ির গুঁড়ো, ঝিনুকের মাংস, পচা চাল, ভাত, গমভূষি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। মজুত পুকুরে খাদ্য মণ্ড আকারে অথবা পেলেট আকারে ট্রেতে সাজিয়ে দেওয়া হয়। জলাশয়ে ১-২ ঝুড়ি গোবর দিয়ে রাখলেও চিংড়ি খায়। খাদ্য প্রয়োগ সাবধানে করতে হয় ও যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা যেন সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়। অন্যথায় জলদূষণের সম্ভাবনা থাকে।

পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে জলদূষণ যেন না হয় এবং জলে অক্সিজেনের ঘাটতি যেন না হয়

সেদিকে সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে। রাত্রিকালে ধীরে ধীরে জলস্রোত প্রবেশ করানো হলে জলদূষণ ও অক্সিজেন ঘাটতি রোধ করা যায়। জলে বায়ু সঞ্চালন করেও অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখা যায়।

শীতকালে কুয়াষাচ্ছন্ন ভোরে জলাশয়ে অক্সিজেনের ঘাটতিতে চিংড়িমাছ সব ভেসে ওঠে। তাই এসময় খুব সাবধান হওয়া দরকার এবং অগ্রাহায়ণ মাসেই চিংড়িমাছ তুলে ফেলা ভাল। চিংড়িগুলি যখন ৩০ গ্রাম এর উপর ওজনের হবে তখন তুলে বাজারজাত করাই লাভজনক।

চিংড়ির দেহে ও ফুলকা প্রকোষ্টে অনেক সময় কাল কাল ছোপ দেখা যায়। এই সব রোগ কয়েক ধরণের জীবাণুর কারণে হয়ে থাকে। আবার খোসা পাতলা রোগও হয়ে থাকে। এই সব রোগের প্রতিকার এখনও জানা যায়নি। তবে এসব রোগের প্রতিরোধ করতে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় যেমন- জলাশয়ে চিংড়ির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, চুন প্রয়োগ, জল বদল ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োগ করা।

ফসলতোলা ও উৎপাদন ঃ—

বৎসরে ২টি ফসলের কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার চারার সংখ্যা বেশী ছেড়ে তিনমাস বাদে আংশিক ফসল তোলাও হয়। যে সব চিংড়ি বড় হয়েছে সেইগুলি ধরে নিয়ে ছোটগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়। আংশিক ফসল তোলা সাধারণত খেফলা জাল দিয়ে বা বিশেষ ধরণের টানা জাল বা ঘুনিপেতেও করা হয়। সম্পূর্ণ ফসল তোলা হয় জলনিকাশ করেই।

৫-৬ সেমি মাপের চারা ছেড়ে তিনমাসেই ৩০-৫০ গ্রাম ওজনের মাছ পাওয়া যায়। গলদা চিংড়ির স্ত্রীর চেয়ে পুরুষের বাড় হয় বেশী। এই চাষে বাঁচার হার ৫০%, মিশ্র মাছ চাষে হেক্টরে ১৫০০০ চিংড়ি ছেড়ে বৎসরে ২টি ফসলে ৪০০-৫০০ কেজি চিংড়ি এবং ১৫০০-২০০০ কেজি পোনামাছ পাওয়া যায়।

Mixed carp and prawn culture in pond
Sri Bimal Sengupta
Fishery Scientist, West Bengal Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

নোনাজল ও মিষ্টিজলে চিংড়ী চাষ

ডঃ চিন্ময় চক্রবর্ত্তী

কেন্দ্রীয় অর্ন্তদেশীয় মৎস্য গবেষনা সংস্থা, বারাকপুর

চিংড়ী চাষ এখন ভারতে একটি লাভজনক ব্যবসা যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, চিংড়ীর রোগের প্রাদুর্ভাব এবং পরিবেশ ঘটিত সমস্যা এই শিল্পের প্রধান অন্তরায়। বর্তমানে চিংড়ী চাষ ভারত তথা অন্যান্য দেশে শিল্প হিসাবে গণ্য হচ্ছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিংড়ী চাষ বিশেষ করে গ্রামের অর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে বহুলাংশে বদলে দিয়েছে। বহুমানুষের কর্মসংস্থানের দিক খুলে গেছে এবং গ্রামীন অর্থনীতিতে এর প্রভাব এক কথায় অপরিসীম।

(১) **নোনাজলে বাগদা চিংড়ী চাষ ঃ**

নোনাজলের ফসল হিসাবে বাগদা চিংড়ী সমস্ত চিংড়ীর মধ্যে সবার উপরে স্থান করে নিয়েছে। বাজারে চাহিদা, চাষোপযোগী প্রকৃতি, দ্রুতবৃদ্ধি, বেশী বাঁচার হার এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও হ্যাচারী থেকে চারা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা প্রভৃতি কারণে বাগদা চিংড়ী চাষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

এই খামার সাধারণতঃ সমুদ্র উপকূলে কোন খাড়ী, নদী, মোহনার ধারে যেখানে জোয়াড়, ভাঁটার প্রভাব বর্তমান সেখানে নির্মান করা হয়। স্থান নির্বাচনের সময় দেখতে হবে যেন সেই খামার অন্য কোন চাষের জমির কোন ক্ষতি না করে।

ক) স্থান নির্বাচন ঃ

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য এর প্রতি নজর দিতে হবে। ১) পরিবেশের গড় তাপমাত্রা ২৬° - ৩২° সেঃ এর মধ্যে হবে; ২) বৃষ্টিপাত মধ্যম; ৩) সারা বছরের লবনতা ৫ - ২৫ পি.পি.টি. হওয়া চাই; ৪) প্রাকৃতিক খাদ্যযুক্ত উচ্চমানের খাড়ির জল; ৫) বন্যার সম্ভাবনা কম; ৬) কর্দমাক্ত মৃত্তিকা; ৭) মাটির পি.এইচ. ৬ এর উপরে হবে; ৮) রাস্তা ও পরিবহন ব্যবস্থা; ৯) জিনিষ পত্রের সহজ প্রাপ্তি; ১০) সহজলভ্য শ্রমিক।

খ) খামারের রূপরেখা নির্মান ঃ

খামার ঘিরে প্রান্তিক বাঁধ ও পুকুরের অন্তবর্তী বাঁধ সঠিক ঢাল রেখে নির্মান করতে হবে। সাধারণতঃ ২ : ১ হারে বাঁধের ঢাল করা হয়। পুকুরের আয়তন ০.২ - ১ হেঃ এর মধ্যে হবে। (৭.৫ বিঘা - ১ হেঃ)। প্রতি পুকুরে জল নিষ্কাশনের জন্য স্লুইস গেট/হিউম পাইপ বসাতে হয়। পুকুরের ঢাল এমনভাবে করতে হবে যে জল নিষ্কাশনের জন্য সময় সমস্ত জল বেড়িয়ে যায়। পুকুরে জলের গভীরতা

১৫০ সে.মি. পর্যন্ত রাখার ব্যবস্থা থাকা দরকার। পুকুরের মাঝখানে একটি কাঠের স্কেল এবং চারটি বাঁধের মাঝখানে মাচা/ক্যাটওয়াকে করে, প্রতিটিতে ১ টি করে খাদ্য ট্রে বসাতে হয়। এই খাদ্য ট্রের মাধ্যমে চাষের সময় বাগদার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাবার গ্রহণের পরিমান ও প্রকৃতি পরীক্ষা করা হয়।

গ) পুকুর প্রস্তুত ঃ

প্রথমেই অবাঞ্ছিত প্রাণীর নিধনের জন্য প্রতি পুকুরে ৫-১০ কেজি/হেঃ হারে টীসীড কেক দিতে হবে। এরপর পাম্পের সাহায্যে জলের তোড়ে পুকুরের তলদেশ ধুয়ে দিতে হবে। এরপর পুকুর ১৫-১৬ দিনের জন্য রৌদ্রে শুকাতে হবে। এরপর প্রতি হেঃ ১২০০ কেজি হারে চুন দিতে হবে। সাধারণতঃ, মাটির পি. এইচ্. এর পরিমানের উপর নির্ভর করে চূনের পরিমান নির্নয় করা হয়। এরপর নেটের মাধ্যমে ছেঁকে পুকুরে জল ঢোকাতে হয়। তারপর ইউরিয়া ৬ কেজি এবং সিঙ্গল সুপার ফসফেট ১ কেজি দিতে হবে। এর পর ৫-৬ দিন অপেক্ষা করতে হয়। যাতে জলের রঙ ঠিক হয়। চারামজুত করার সময় প্রতি পুকুরে জলের উচ্চতা হবে কমপক্ষে ৮০-৯০ সে.মি. এবং পরবর্তীকালে ১০০ -২০০ সে.মি. পর্যন্ত জল রাখতে হয়।

ঘ) বাগদা চারা মজুত করা ঃ

বাগদা চারা পুকুরে মজুত করার সময় প্রধানতঃ সকাল বা সন্ধ্যা। মজুত করার জন্য পি. এল. ১০ - পি. এল. ১৮ চারাই উপযুক্ত। চারা আসার পর যে জলে চারা এসেছে এবং পুকুরের জলের ভৌত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য দেখে নিতে হবে। সেই অনুযায়ী চারাকে মাটির বড় পাত্রে রেখে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দিতে হয়। চারা মজুতের হার সাধারণতঃ ৩ -১০ প্রতি বর্গ মিটারে। অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৩০,০০০ - ১,০০,০০০।

ঙ) জল পরিচালন ব্যবস্থা ও জলের গুণমান রফা ঃ

বাগদা চিংড়ী চাষের সময় জলের গুণগত রফায় ঘন ঘন জল বদল করা দরকার। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় চাষের সময় জলের ভৌত রাসায়নিক অবস্থা পরীক্ষা করা উচিত। প্রধানতঃ তাপমাত্রা (২৬° - ৩২° সেঃ), লবনত্ব (৫ - ২৫ পি.পি.টি.) , স্বচ্ছতা (২৫ - ৪০ সেমি), পি. এইচ্. (৬.৮ - ৭.৫), এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন (৩.৫ পি.পি.এম.) পরীক্ষা করা হয়। প্রতি ১৫ দিন অন্তর মাটির পি. এইচ্., হাইড্রজেন সালফাইড ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনের উপস্থিতির পরিমান পরীক্ষা করতে হয়। সপ্তাহে অন্ততঃ তিনবার জল পরিবর্তন করতে হয়। কারণ এই জল পরিবর্তন চিংড়ীর খোলস ছাড়াকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ফলস্বরূপ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। চারা মজুতের ৪ - ৫ সপ্তাহ পর থেকে এই জল পরিবর্তন করতে হয়।

চ) খাদ্য ও খাদ্য প্রদান ঃ

সার প্রয়োগ তৈরী পুকুরে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্য তৈরী হয়। বাগদা চিংড়ী প্রাথমিক অবস্থায় এই সব খাদ্য পুকুরের থেকে গ্রহণ করে। এছাড়া বাগদা চিংড়ীর অধিক ফলন ও বৃদ্ধির জন্য পরিপূরক পেলেটেড ফীড দেওয়া হয়। এই পরিপূরক খাদ্যে প্রয়োজনীয় হারে প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে যা বাগদা চিংড়ীর বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

খাদ্য প্রদান প্রথমবাবস্থায় দিনে ২ বার ও পরবর্তীকালে ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিনে ৫ বার করে দিতে হয়। খাদ্য প্রদানের সময় পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হয়। চেক ট্রেতে ও খাদ্য দিতে হবে এবং $১\frac{১}{২}$ - ২ ঘন্টা পর তা এসে দেখতে হয়। চিংড়ী যেমন বড় হতে থাকে, খাদ্যের পরিমান দেহের মোট ওজনের অনুপাতে কমতে থাকে। চিংড়ীর বয়স ও ওজন অনুপাতে খাদ্যের পরিমান ঠিক করা হয়।

ছ) জলাশয়ে চিংড়ীর সংখ্যা ও পরিমান নির্নয় ঃ

চিংড়ীর স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, খাদ্যাদি গ্রহণ ইত্যাদি নিয়মিত খ্যাপলা জালের সাহয্যে পরীক্ষা করা হয়। পুকুরের চারিপাশে ৮ বার ও মধ্যাঞ্চলে ২বার, এইভাবে জাল ফেলে ধরা চিংড়ীর সংখ্যা ও ওজন দেখে তাদের গড় নির্নয় করা হয়। প্রতিবার জালে কত সংখ্যক চিংড়ী পড়ছে, তার গড় নিয়ে জলাশয়ে মোট কত চিংড়ী আছে তা নির্নয় করা হয়।

জ) ফসল তোলা ঃ

ফসল তোলার সময় দেখতে হবে যাতে বাগদার খোলস শক্ত থাকে। স্লুইস গেটের দরজা খুলে, সেখানে ব্যাগ নেট আটকেদিয়ে এই ব্যাগ নেটের মাধ্যমে বাগদা ধরা হয়। স্লুইস গেট খুলে দিলে যখন সমস্ত জল বেড়িয়ে যায় - বাগদা তখন জলের মাধ্যমে বেড়িয়ে এসে ব্যাগ নেটে ধরা পড়ে। সাধারণতঃ ২৫ - ৪০ গ্রাম এর বাগদার বাজারদর ভাল পাওয়া যায়। ফসল তোলার পর তা ১:২ হারে বরফ দিয়ে প্রসেসিং প্লান্টে পাঠানো হয়। গড়ে ৩০০ - ৫০০ টাকা কেজি দাম হয় বাগদার ওজনের ওপর নির্ভর করে।

(২) মিষ্টি জলে গলদা চিংড়ী চাষ ঃ

মিষ্টি জলের চিংড়ীদের মধ্যে গলদা *(Macrobrachium rosenbergii)* সবচেয়ে দীর্ঘ হয়। বাণিজ্যিকভাবে একে স্ক্যাম্পি বলা হয়। এর দেহ লম্বাটে আকৃতির হয় বলে অনেকে একে মোচা চিংড়ী বলে।

ক) গলদা চাষের আদর্শ পুকুর, মাটি ও জলীয় পরিবেশ ঃ

সমস্ত মাছ চাষের পুকুরের মতই গলদা চাষের পুকুর দীর্ঘ আয়তাকার হলে ভাল হয়। স্থানীয় বাতাস যে দিকে বয় জলাশয়ের দৈর্ঘ্য সেইদিকে থাকলে আরও ভাল হয়। পুকুরের আয়তন ০.২-০.৬ হেঃ মধ্যে হলেই ভাল। কর্দমাক্ত মৃত্তিকাই এই চাষের পক্ষে ভাল। এতে জলধারণের ক্ষমতা বেশী থাকে। পুকুরে জলের গভীরতা ৯০-১৫০ সে.মি. হলেই চলে। পুকুরের ঢাল ও জল বদলের সুবিধা থাকলে গলদার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। অন্য মাছের সাথে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে ২-৩ মিটার পর্যন্ত গভীর পুকুরে এই চাষ করা যায়। মাটিতে অ্যাসিড সালফেট কম থাকা বাঞ্ছনীয়। জলের তাপমাত্রা (২৫°-৩২° সে); দ্রবীভূত অক্সিজেন (৪-৭ পি.পি.এম) ; স্বচ্ছতা (৪০ সে.মি.); পি.এইচ (৭-৮.৫) এবং জলের রঙ হাল্কা সবুজাভ হলেই ভাল।

খ) স্থান নির্বাচন ঃ

প্রথমে স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী মাটি ও জল পরীক্ষা করতে হবে। জলের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। নীচু জমি ও যেখানে জল প্রবেশের সুবিধা আছে, সেখানে পুকুর তৈরী করা যেতে পারে। জলের প্রয়োজন প্রধানতঃ পুকুর ভর্তি করা। সেই অবস্থা বজায় রাখা এবং বায়ু সঞ্চালন।

গ) পুকুর প্রস্তুতি ঃ

কম লবণতা জলের ভেড়ী বা মাঠের পুকুরে গলদা চাষ সম্ভব। জল নিকাশ, জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ ও জলাশয়ে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। প্রথমে টী সীড কেক দিয়ে ০.৫-১ পি.পি.এম হারে, অবাঞ্ছিত প্রাণী নিধন ও মাটির পি.এইচ. দেখে সেই অনুযায়ী ৭৫-১০০ কে.জি/হেঃ চূণ দিতে হবে। পুকুরের পি.এইচ ৮.৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। জৈব সার হিসাবে গোবর ১০-১৫ কে.জি/হেঃ এবং অজৈব সার হিসাবে ইউরিয়া ৬ কে.জি ও সিঙ্গল সুপার ফসফেট ১ কে.জি. প্রতি হেক্টরে দিতে হবে। পুকুরে সরু শুকনো ডাল-পালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে হয়। কারণ সেসময় তারা দুর্বল থাকে এবং সেসময় তারা খোলস ছাড়ে - সেখানে এসে বসে।

ঘ) চারা মজুত ঃ

গলদা চারা মজুতের হার সাধারণতঃ চারার মাপ, জলাশয়ের প্রকৃতি, আয়তন, মিশ্রচাষ বা একক চাষ। অন্য মাছের জাতি ও সংখ্যা, পরিপূরক খাদ্যের গুণ ও পরিমাণ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ৪-৫ সে.মি. আয়তনের চারা ছাড়া হয়। একক চাষের স্কেলে ৪০,০০০-৫০,০০০ প্রতি হেক্টর ও মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে ১০,০০০-১৫,০০০ প্রতি হেক্টরে চারা ছাড়া হয়।

ঙ) খাদ্য প্রয়োগ ঃ

এরা প্রাকৃতিক খাদ্য, পচনশীল বা টাটকা, প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করে বলে এদের ময়লা সাফাকারী *(Scavanger)* বলা হয়। খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে পুকুরে স্বাভাবিক খাদ্যের উপস্থিতি ও মজুত চারার সংখ্যা ও মাপের উপর। ৫০,০০০ চারার জন্য দৈনিক ৬.৫ কে.জি. খাদ্য দিতে হবে। পরবর্তীকালে চারা বড় হলে মোট ওজনের ৫-১০% খাদ্য দিলেই হয়।

চ) বৃদ্ধি ও উৎপাদন ঃ

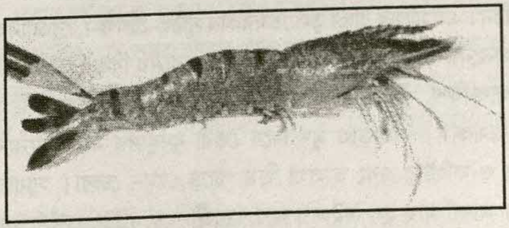
যখন ১-১.৫ সে.মি. চারা মজুত করে চাষ করা হয়। তখন ৬-৮ মাসের মধ্যে ওজন হয় ৩০-৫০ গ্রাম। আর ৮ মাসে ৫০-৭০ গ্রাম। গলদার ওজন ৫০ গ্রাম হলেই ভাল বাজারদর পাওয়া যায়। গলদার বাঁচার হার সাধারণতঃ ৫০-৭০% দেখা যায় ভাল ভাবে পরিচালিত পুকুরে।

ছ) ফসল তোলা ও বাজার জাত করা ঃ

গলদার স্ত্রী ও পুরুষ সমানভাবে বাড়ে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক ফসল তোলা হয়। যাদের ওজন বেশী, তাদের ধরে নিয়ে, বাকীদের পুকুরে রেখে দেওয়া হয়। ৫০ গ্রাম হলেই গলদা তুলে ফেলা উচিত। আংশিক ফসল তোলা, সাধারণতঃ খেপলা জাল দ্বারা বা ঘূর্ণি পেতে করা হয়।

জ) চৌবাচ্চায় গলদা চিংড়ীর চাষ ঃ

বড় বড় সিমেন্টের চৌবাচ্চায় পরিপূরক খাদ্য ও অল্প পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য দিয়ে গলদা চিংড়ী চাষ করা যায়। এক্ষেত্রে কৃত্রিম বায়ু সঞ্চালন, অধিক জল পরিবহণ ব্যবস্থা ও কৃত্রিম বাসস্থান বা মাচা তৈরী করতে হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে ৫০ বর্গমিটার কংক্রীটের চৌবাচ্চায় প্রতি বর্গমিটারে ৫ টি করে চিংড়ী চারা ১১৯ দিনে ৪৬৫-৮২০ কে.জি. পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া যায়।



রঙিন মাছের চাষ

শ্রী প্রশান্ত চ্যাটার্জী

প্রশিক্ষক, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

বহুকাল ধরেই বাহারী গুনের জন্য অনেক ধরনের মাছকে ঘর সাজানোর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশের জলাশয়েও নানান বৈচিত্র্যের মাছ পাওয়া যায় যার বিদেশের বাজারে যথেষ্ট কদর রয়েছে, যেমন খোলসে, মৌরলা, তেচোখো, চাঁদা, ঘুঁতে, ফলুই ইত্যাদি। তবে রঙিন মাছ বলতে আমরা সাধারণভাবে বিদেশী রঙিন মাছের কথাই ভাবি, যেমন -মলি, প্লাটি, সোর্ডটেল, অ্যানজেল, গোল্ডফিশ, টাইগার বার্ব ইত্যাদি।

রঙিন মাছের প্রজনন ও বাচ্চা তোলা

প্রজননের বৈশিষ্ট অনুযায়ী রঙিন মাছকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়- বাচ্চা পাড়া রঙিন মাছ এবং ডিম পাড়া রঙিন মাছ। প্রথম গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গাপ্পি, মলি, প্লাটি,সোর্ডটেল ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত মাছেদের মধ্যে রয়েছে গোল্ডফিশ, অ্যানজেল, ফাইটার, টেট্রা, টাইগার বার্ব, শার্ক ইত্যাদি। বাচ্চা পাড়া রঙিন মাছের প্রজনন এবং বাচ্চা তোলা খুবই সহজ। এদের পুরুষ ও স্ত্রী মাছ সহজেই চেনা যায়। পুরুষ মাছের পেটের কাছে ছুঁচালো পাখনা থাকে এবং স্ত্রী মাছের পাখনা গোল হয় ও ভারী পেটে কালো দাগ দেখা যায়। পুরুষ ও স্ত্রী মাছ একসঙ্গে রাখলে এদের মধ্যে প্রজনন হবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী মাছের পেট ভারী হয়ে আসবে। তখন স্ত্রী মাছকে তুলে আলাদা করে রাখলে উপযুক্ত সময়ে তারা বাচ্চা দেয়। পেট ভরা খাবার না পেলে এরা নিজেদের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে। তাই বাচ্চা দেওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী মাছকেও সরিয়ে ফেলতে হবে।

ডিমপাড়া রঙিন মাছের বাজার দর যেমন বেশী তেমনি আবার এদের বাচ্চা তোলাও অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই মাছের বাচ্চা তুলতে দরকার সঠিক প্রশিক্ষন, বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম এবং এদের প্রজননের স্বভাব বিশ্লেষণ করার। এই ধরনের কিছু কিছু মাছ আঠালো ডিম পাড়ে যেমন গোল্ডফিশ, পুঁটি, টেট্রা আবার কেউ যত্নসহকারে আঠালো ডিম পাড়ে যেমন অ্যানজেল ও ডিসকাস। এছাড়াও মুখ দিয়ে তৈরী বুদবুদের মধ্যে অনেকে ডিম পাড়ে যেমন খোলসে ও ফাইটার এবং আলগা ডিম পাড়ে যেমন জেব্রা। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের প্রজননের জন্য আদর্শ মাছ হল টাইগার বার্ব, রোজী বার্ব, টেট্রা, সোর্ডটেল, মলি, প্লাটি; বর্ষাকালের জন্য গোরামী, টেট্রা, টাইগার বার্ব, চিকলিড এবং শীতকালের জন্য গোল্ডফিস, কই, কার্প, ম্যানিলা কার্প ইত্যাদি।

রঙিন মাছ চাষের বিভিন্ন ধাপ

১) জলাধার তৈরী — ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে অথবা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে আয়তকার চৌবাচ্চা বানিয়ে রঙিন মাছের চাষ করা সম্ভব। এর জন্য চৌবাচ্চার মাপ লম্বায় ২ মিটার, চওড়ায় ১ মিটার এবং গভীরতায় ০.৫ মিটার হলে ভাল। এছাড়া মাটির ম্যাজলাও প্রজননের জন্য অথবা ছোট মাছের চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঁচের তৈরী জলাধারে বা অ্যাকোয়ারিয়ামেও এই মাছের চাষ করা যায়। তবে অ্যাকোয়ারিয়াম অন্যান্য জলাধারের চেয়ে বেশী ব্যয়সাপেক্ষ। সাধারণতঃ ১৬-১৮ ইঞ্চি গভীরতার জন্য দরকার ১/৪ ইঞ্চি, ১৯-২২ ইঞ্চি গভীরতার জন্য দরকার ৩/৮ ইঞ্চি ও ২৩-৩০ ইঞ্চি গভীরতার জন্য দরকার ১/২ ইঞ্চি পুরু প্লেট কাঁচ। সাধারণতঃ প্রতি সেন্টিমিটার (লেজ বাদ দিয়ে) মাছের জন্য ২০ বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা প্রয়োজন।

২) জলাধার প্রস্তুতি — জলাধার তৈরীর পর অন্তত ৩-৪ দিন তাতে জল ভর্ত্তি করে রাখতে হবে। এর জন্য পুকুরের, বৃষ্টির অথবা কলের জল ব্যবহার করা যেতে পারে। এর পরে মাছ ছাড়ার ২৪ ঘন্টা আগে জলাধারে প্রতি ৫ গ্যালন জলে ৫% মেথিলিন ব্লু এক ফোঁটা ও ২ চামচ লবন মিশিয়ে রাখতে হবে।

৩) মাছের চারা সংগ্রহ ও মুজত — জলাধার তৈরী হয়ে গেলে দেশী মাছের চারা যেমন জেব্রা, খলসে, পুঁটি ইত্যাদি খাল, বিল, পুকুর, ধানক্ষেত, নদী বা নালা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিদেশী মাছের চারা যেমন গোল্ডফিস, অ্যানজেল, প্লাটি, মলি ইত্যাদি হাওড়া, কলকাতা অথবা ডায়মণ্ড হারবারের আমতলা থেকে পাওয়া যাবে। যে সমস্ত মাছ সহবস্থান করবে সেই সমস্ত মাছই বেছে বেছে একত্রে চাষ করা উচিত। মাছের চারা জলাধারে ছাড়ার আগে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবনে (১০ লিটার জলে আঙ্গুলের এক টিপ) ৫-১০ মিনিট রেখে পরে পরিস্কার জলে ধুয়ে নিয়ে ছাড়তে হবে।

৪) মাছের খাবার প্রয়োগ — সঠিক খাদ্য প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে মাছের রং, বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও প্রজনন। রঙিন মাছের জন্য কৃত্তিম খাদ্যের চেয়ে জীবন্ত খাদ্যই বেশী প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত জীবন্ত খাদ্যকনা সহজেই সংগ্রহ করা যায় সেগুলি হল পুকুরের প্রাণীকনা, পাঁকের কেঁচো বা কৃমি, মাটির বা কম্পোস্টের কেঁচো। প্রতি দিন সকালে ও বিকালে অল্প পরিমানেই খাবার দেওয়া প্রয়োজন যা মাছ মিনিট দশেকের মধ্যেই খেয়ে নিতে পারে।

৫) জল পরিবর্তন — মাছের বর্জ্য পদার্থ, খাবারের অবশিষ্টাংশ অথবা শ্যাওলা জমে জলাধারের জল নষ্ট হয়। তখন অক্সিজেনের অভাবে মাছ উপরের দিকে ভেসে ওঠে। এই অবস্থায় তৎক্ষনাৎ জল পাল্টে দিতে হবে। তবে একসাথে পুরো জল না পাল্টে ধীরে ধীরে জল মিশিয়ে পাল্টালে ভাল।

৬) বায়ু সঞ্চালন — বৈদ্যুতিক মোটর ও পাম্পের সাহায্যে জলাধারে বায়ু সঞ্চালন বা হাওয়ার ব্যবস্থা করলে মাছ ভাল থাকে এবং তখন সাধারন মজুত সংখ্যার প্রায় চারগুণ মাছ একই জলাধারে রাখা যাবে।

৭) ছোট ও বড় মাছ আলাদা করা — চাষ চলাকালীন কিছু মাছের বৃদ্ধি অন্যান্য মাছের তুলনায় কম হয়। তাই বড় মাছ বেশী বেশী খাবার খেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ছোট মাছগুলি খাবারের অভাবে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া, বাচ্চা পাড়া রঙিন মাছ প্রজনন করার ফলেও কোন কোন সময়ে জলাধারে ছোট মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই মাঝে মধ্যেই জলাধার থেকে ছোট ও বড় মাছকে আলাদা করতে হবে।

রঙিন মাছের রোগ — রঙিন মাছ চাষে সচরাচর যে সমস্ত রোগ ও সমস্যা দেখা যায় তা টেবিলে বর্ননা করা হল।

রোগ/সমস্যা	আক্রান্ত মাছের নাম	প্রাদুর্ভাবের সময়	প্রতিকার
ক) গায়ে সাদা দাগ	ডিসকাস, টাইগার শার্ক ক্রোকোডাইল, পায়রাচাঁদা	ঋতু পরিবর্তন	১) জলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে ৩৫° সেঃ করতে হবে ২) মাছকে ম্যালাকাইট গ্রীন/তুঁতে/লবনজলে স্নান করাতে হবে
খ) ঠোঁট সাদা হওয়া	অ্যানজেল, মলি, প্লাটি, সোর্ডটেল	গ্রীষ্ম, বর্ষা	১) প্রতি লিটার জলে ১০,০০০ IU পেনিসিলিন প্রয়োগ
গ) লেজ ও পাখনা	অ্যানজেল, কিসিং গোরামী সোর্ডটেল	গ্রীষ্ম, বর্ষা	১) জলে অক্সিটেট্রা সাইক্লিন প্রয়োগ
ঘ) জলসরা বা শোথ	যে কোনো মাছ'	যে কোনো সময়	১) মাছ আলাদা করে রেখে সেই জলে ক্লোরোমাইসেটিন ক্যাপসুল গুলে দিতে হবে
ঙ) গায়ে তুলোর মত ছত্রাক হওয়া	যে কোনো মাছ	যে কোনো সময়	১) মাছ আলাদা করে রেখে সেই জলে ম্যালাকাইটগ্রীন বা লবন গুলে দিতে হবে

চ) হাইড্রা	মাছের বাচ্চা	—	১) ব্লু বা কমলী গোরামী জলাশয়ে ছাড়লে এরা খুঁটিখুঁটি সব হাইড্রা খেয়ে ফেলে

রোগ/সমস্যা	আক্রান্ত মাছের নাম	প্রাদুর্ভাবের সময়	প্রতিকার
ছ) কষা পায়খানা (পেট থেকে ঝুলতে থাকে)	যে কোনো মাছ	যে কোনো সময়	১) পর্যাপ্ত পরিমাণে ড্যাফনিয়া খেতে দিতে হবে

রঙিন মাছের বাজার — এই ধরনের মাছ চাষ ও তার চাহিদা বাড়ার সাথে সাথেই বিভিন্ন জায়গায় রঙিন মাছের দোকান এর সংখ্যাও বাড়ছে। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও এখন এই রকম দোকান চোখে পড়ে। এছাড়াও হাওড়া, কলকাতার শিয়ালদহ, হাতিবাগান ও গালিফ স্ট্রিটে রঙিন মাছের পাইকারী বাজার রয়েছে। এমনকি ডায়মণ্ড হারবারের কাছেও এই মাছের বাজার রয়েছে।

মাছের সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার

ডঃ অজয় কুমার ঘোষ
মৎস্য বিজ্ঞানী

আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সহায়তায় ব্যাপক মাছ চাষের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক মৎস্য চারা অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর বা ছোট জলাশয়ে এবং কৃত্রিম পরিবেশে চাষ করা হয়ে থাকে; ফলে মাছের নানারূপ অসুখ বিসুখ বা রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। উপরন্তু ব্যাপক মাছ চাষের নিমিত্ত প্রজননক্ষম বড় মাছ কিংবা মাছের ডিম ও চারা একস্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার সময় ও ভিন্নপ্রকার মৎস্য রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। পরিবেশগত অবস্থা, জলের প্রকৃতি ও নানা প্রকার দূষিত পদার্থ মৎস্য রোগ ঘটানোর জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। ইদানীংকালে জলাশয়গুলি নানা কৃত্রিম বা প্রকৃতিগত কারণে জৈবপদার্থের আধিক্যে দূষিত হয়ে পরে। ইহার ফলে মাছেদের স্বাভাবিক বসবাস সমস্যা সঙ্কুল হয়ে উঠে ও ভিন্ন প্রকার জীবাণু ঘটিত ও অন্যান্য নানা প্রকার রোগ লক্ষণ প্রকট আকার ধারণ করে। প্রকৃতির অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের মাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু তার অভিযোজন ক্ষমতা বা প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য জৈবিক ক্ষমতার অবশ্যই একটা সীমা আছে। বায়ুমণ্ডলের তুলনায় জলমাধ্যমে প্রাণীদের শ্বাসকার্যের উপযোগী অম্লজান বা অক্সিজেনের মাত্রা অনেক কম, ঐ শ্বাসবায়ু বা অক্সিজেনের ব্যাপক তারতম্য মাছেদের জীবনধারণের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। কোন অসুস্থ কিংবা রোগাক্রান্ত মাছকে তার নিজের পরিবেশে সচরাচর অস্থির অবস্থায় দেখা যায় ও অস্বাভাবিক অবস্থায় চলাফেরা করে থাকে।

অসুস্থ মাছ চঞ্চলতার সঙ্গে চলাফেরা করা ছাড়া ও পুকুরের পাড়ে তাদের দেহ ক্রমাগত ঘষতে দেখা যায়, জল ছিটিয়ে চলে; জলের উপর ভেসে উঠে, খাবি খায়, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পরে ও স্বাভাবিক গতি কমে যাওয়াই জলের উপর কাত হয়ে ভাসতে থাকে।

(ক) মাছের স্বাভাবিক রোগলক্ষণ ও তার শ্রেণীবিভাগ

মাছের নানারূপ প্রকৃতিগত কারণে রোগ ও তার লক্ষণ	রুগ্ন মাছের চেনার উপায়
১) জলমাধ্যমে অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটলে	মুখমণ্ডল খোলা অবস্থায় থাকে ও ফুল্‌কা ফ্যাকাসে হয়ে যায়।
২) জলে নাইট্রোজেন ঘটিত ভোজ্য বস্তুর ও এ্যামোনিয়ার সংযোজন ঘটলে	ফুল্‌কা গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে থাকে, কারণ মিথামোগ্লোবিন সৃষ্ট হয়।

মাছের নানারূপ প্রকৃতিগত কারণে রোগ ও তার লক্ষণ	রুগ্ন মাছের চেনার উপায়
৩) জলাশয়ে অত্যাধিক মাত্রায় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশে গেলে	ছোট মাছের গায়ে বা সারা শরীরে বুদ্‌বুদের ন্যায় সৃষ্ঠ হয় এবং মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে মাছ মরতে থাকে।
৪) জলে অধিকমাত্রায় অঙ্গার অম্ল যুক্ত হলে ও ক্ষারিতভাব বাড়লে	মাছের শরীর হতে অধিক মাত্রায় আঁঠাল এ্যাপিথেলিয়াল যুক্ত মিউকাস্ বাহির হয়।
৫) অতিরিক্ত হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইট পুকুরের মাটিতে জলে যুক্ত হলে	পুকুরের মাটির কাছাকাছি পচা ডিমের গন্ধযুক্ত দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং মাটির কাছাকাছি যে সমস্ত মাছ থাকে তাদের মৃত্যু ঘটে।
৬) আবর্জনা বা জৈবপদার্থের দ্বারা জলমাধ্যম দূষিত হয়ে পড়লে	জলাশয়ে নীলাভ সবুজ শ্যাওলার অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধিতে সহায়তা হয় ও মাছের স্বাভাবিক জীবন ধারণে ব্যাঘাত ঘটায়।
৭) অর্গানো ও ক্লোরিন যুক্ত কীট নাশক পুকুরের জলে মিশলে	মাছের রক্তবাহী নালিকাগুলি ছিঁড়ে যায় এবং চক্ষুসহ অন্যান্য অঙ্গ হতে রক্ত ঝরতে দেখা যায়।
৮) আবার অর্গানো ও ফসফরাস কীটনাশক জলাশয়কে দূষিত করলে	মাছের বক্ষ ও পৃষ্ঠ পাখনা খসে যায় ফলে মাছের দেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, স্বাভাবিক গতির হ্রাস ঘটে, ফলে মাছ ভেসে উঠে।

(খ) মাছের নানা প্রকার রোগজনক শক্তি ও রোগের কারণ ঃ

মাছ এবং তার নানা রোগ জীবাণু উভয়েই একই সাথে সমতা রক্ষা করে একই জলাশয়ের নির্দ্দিষ্ট পরিবেশে উপস্থিত থাকে। কিন্তু প্রকৃতির হঠাৎ কোন পরিবর্তন এই সমতা রক্ষায় আঘাত হানে। কখনো স্বয়ং মাছ অথবা তার জীবাণু অনুকুল পরিবেশে প্রকট হয়ে উঠে। যদি প্রাকৃতিক পরিবেশ মাছের বাঁচবার অনুকুল বা পরিপন্থী অবস্থায় থাকে তবে মাছের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়, কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটলে মাছের রোগ জীবাণুর অনুকুল পরিবেশ সৃষ্ট হয় এবং জীবাণু মাছকে আক্রান্ত করে। এই অবস্থায় প্রাথমিক বা গৌণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু এই রোগের ব্যাপকতা বাড়লে ধীরে ধীরে মাছ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক দিন ধরে গৌণ কারণে মাছ ভুগতে থাকলে সহজে তাকে প্রতিকার করা যায় না কিন্তু

সদ্য সদ্য রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে চিকিৎসা দ্বারা তাকে সারিয়ে তোলা সম্ভব।

সাধারণত মাছ তার পরিবেশে নিজেকে প্রতিরোধক্ষম করে রাখে বা সুস্বাস্থ্যযুক্ত মাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। মাছের শরীর আঁশ দ্বারা ঢাকা থাকায় এবং চর্ম হইতে নানা প্রকার মিউকাস নামক জেলীর মত হরহরে গাঢ় পদার্থ দ্বারা ঢাকা থাকে যাহা রোগ জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করে। মাছের গায়ের বিশেষ একপ্রকার কোষ বা ফেজ সেল রোগ জীবাণুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। ইহা সত্বেও মাছ সদানিয়ত নানা প্রকার রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল ঃ—

১। **ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সংগঠিত রোগ ঃ—**

মিসোব্যাকটেরিয়া মাছের লেজ ও পাখনাকে আক্রান্ত করে ও পচন ঘটায়, বিশেষতঃ যখন চারা মাছ বদ্ধ পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। **এরোমোনাস্** ও **সিওডোমোনাস্** গণের প্রজাতিরা নিম্নলিখিত মৎস্য রোগ ঘটায়। যথা ঃ- (ক) মাছের চোখে ছানী, (খ) পাখনা পচন ও আঁশবিহীন মাছের গায়ে ঘা সৃষ্টি করা, (গ) মাছের শরীরে ও আঁশের মধ্যে জল জমা, এবং (ঘ) মাছের মাংস পিণ্ডে ঘা সৃষ্টি করা।

এ্যাস্টোফাইলেকক্কাস গনের ব্যাকটেরিয়া শোলমাছকে অন্ধ করে দেয়। **ক্লস্টীডিয়াম** গণের ব্যাকটেরিয়া কৈ মাছের গায়ের আবের সৃষ্টি করে। **ভিভ্ডিয়ো** প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া বাগদা চিংড়ির গায়ে কাল কাল দাগ সৃষ্টি করে। ইদানীং কালে **মাইক্রোকক্কাস্** প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াকে **এপিজয়েটিক্ অ্যালসারেটিভ** সিন্ড্রোম রোগাক্রান্ত মাছ হতে পাওয়া গিয়েছে।

২। **ছত্রাক ঘটিত রোগ ঃ—**

ব্র্যাঙ্কিওমাইসিস মাছের কানকোয় পচন রোগ ঘটায়, **ইচ্থিয়োফথেরাস** প্রজাতি, **স্যাপ্রোলিগ্না** প্রজাতি এবং **এগ্লিয়া** প্রজাতির ছত্রাক পোনা মাছের মৃত ডিম ও প্রজনন কক্ষ হতে ও পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রজাতির ছত্রাকের উপস্থিতি খালি চোখে ও বুঝা যায়।

৩। **আদ্য প্রাণী ঘঠিত রোগ ঃ—**

মাছের কান্কোয় নানা প্রকার দাগ দেখা যায় এবং ইহার কারণ **মিক্সোবোলাস** প্রজাতি ও **থ্যালোহেনেলাস** প্রজাতির আদ্যপ্রাণী। এই রোগ সমূহ মাছের কানকোয় স্পষ্ট সাদা দাগ দেখে সহজেই বুঝা যায়। ইহা ব্যতীত ফ্যাকাসে কানকুয়া এবং অধিক মাত্রায় মিউকাস নির্গত হওয়া এই রোগের একটি লক্ষণ। এই রোগের ফলে মাছ অত্যধিক মাত্রায় শ্বাসকষ্টে ভোগে ও জলের উপরিপৃষ্ঠে খাবি খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায়; **ট্রাইকোডিনা** প্রজাতি আদ্যপ্রাণীও এই রোগ ঘটায়।

৪। **ক্রিমি বা হেলমিন্থ ঘঠিত রোগ ঃ—**

সাধারণভাবে **গাইরোডেক্টাইলাস** প্রজাতি এবং **ড্যাক্টটাইলো গাইরাস** প্রজাতির **মনোজেনেটিকট্রেমাটোস** মাছের ফুলকা ও শরীরে পরজীবি হয়ে আক্রমণ করে। ইহাছাড়া **ডাইজেনাটিকট্রেমাটেড্** গোষ্ঠীর **ডিপ্লোস্টোমাস** প্রজাতির পরজীবি মাছের গায়ে কালো পুঁজকোষ ও **ক্লীনোষ্টোমাস** প্রজাতির পরজীবি হলুদ পুঁজকোষ সৃষ্টি করে ক্ষত করে। **সিস্টোড্গোষ্ঠীর** লিগুলা-**ইন্টেস্টেনেলিস** নামক ফিতাকৃমির লার্ভা মাছের পেটকে ফুলিয়ে তোলে এবং ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। ইহা পরিণত হয়ে পাকস্থলী ভেদ করে শরীরের মাংস পেশী ভেদ করে বাহিরে বেরিয়ে আসে ও মাছের মৃত্যু ঘটায়।

৫। **ক্র্যাস্ট্যসিয়ান বা সন্ধিপদ বিশিষ্ট প্রাণী ঘটিত রোগ ঃ—**

ক) ল্যারনিওসিস্ — ল্যারসিয়া প্রজাতির সন্ধিপদ সহজেই চেনা যায় সাদা লম্বা সুতার মত আকৃতি দেখে। খালি চোখেও ইহাকে দেখা যায়। স্ত্রীপ্রজাতির প্রাণী টি স্পষ্ট সাদা ডিম্বথলি বহন করে বেড়ায়। যে পুকুরে জৈব বস্তুর আধিক্য বেশী সেখানেই এই প্রজাতি বেশী দেখা যায়।

খ) ইর্গাসিলোসিস্ — ইরগাসিলাস প্রজাতির পরজীবি এই রোগ ঘটায়। মিঠে জলের পোনামাছ ও নোনা জলের ভাঙর উভয় প্রকার মাছের এই পরজীবির আক্রমণ করে। ইহারা সাদা বর্ণের এবং মাছের ফুলকায় এদের দ্বিতীয় উপাঙ্গ দ্বারা আট্কে থাকে এবং মাছের রক্ত ও রস খেয়ে বেঁচে থাকে। এই পরজীবি দ্বারা ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত হয়ে মাছ জলের উপর ভেসে উঠে এবং এলোমেলো চলাফেরা করে এবং পরিণামে মৃত্যু ঘটে।

গ) অ্যারগুলোসিস — আরগুলাসগণের সন্ধিপদ পরজীবিদের খালি চোখে দেখা যায়। ইহাদের আকৃতি অনেকটা গোলাকার ও স্বচ্ছ দেহযুক্ত। তবে এদের দেহের পিছনের দিকের দুটি গোলাকার দাগ দেখা যায়। এই গোলাকার অংশ দু'টি দিয়ে এরা সেবক প্রাণীমাছের দেহে আটকে থাকে। স্ত্রী প্রজাতি তাদের দেহের অগ্রভাগে ডিম্বথলি বহন করে বেড়ায়। এই প্রজাতির পরজীবি যখন মাছের সারা শরীরে খুঁড়ে খুঁড়ে বেড়ায় তখন মাছ তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই সময় ইহারা মাছের শরীর থেকে খাদ্যগ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে কালো আকার ধারণ করে। এরা আক্রান্ত মাছকে বাঁচিয়েও রাখে।

মাছের রোগের প্রতিকার ঃ—

রোগ প্রতিকারের প্রথম পর্যায়ে নজর রাখতে হবে মাছের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে তোলা। জল শোধন ও শোধিত জলের যোগান দেওয়া। যখন নদী বা খাল থেকে জল নেওয়া হয়

তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাকে শোধন করা প্রয়োজন। হেক্টর প্রতি ১২০০ কেজি চুন প্রয়োগ করে জলকে শোধিত করতে হবে। আবার *2 ppm* হারে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটও জল শোধনের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। ধীরে ধীরে পলি জমে, খাবারের অবশিষ্টাংশ জমে, আবর্জ্জনা জমে, পুকুরের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠে। যার ফলে মাছের নানা রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সে বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। অনেক সময় অজৈব সার শেওলা মারার জন্য প্রয়োগ করা ঔষধ ও নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ও মাছের রোগ নিরাময় নিমিত্ত প্রয়োগ করা ঔষধ যদি না সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে মাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে। মাছের রোগ প্রতিকারের জন্য সাধারণত কিছু কিছু ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। এন্টিবায়োটিক বা সালফা শ্রেণীর ঔষধ ও মাছের প্রতিদিনের দেয় খাদ্যের সাথে ১০০ মিগ্রা প্রতি কেজিতে দিতে হবে এবং এই ঔষধ মিশ্রিত খাবার একাধিকক্রমে দশদিন প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। ম্যালাচিট্গ্রীণ *0.5 ppm* হারে প্রয়োগ করে মাছের ডিমে ছত্রাক রোগের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব এবং এই দ্রবণে ছত্রাক আক্রান্ত মাছকে ১ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলে রোগ মুক্ত করা সম্ভব। এক শতাংশ (.০১) সাধারণ লবণ দ্রবণে মাছকে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে মাছকে অনেক পরজীবি হতে রক্ষা করা সম্ভব। ২৫০ *ppm* হারে ফরমালিন দ্রবণ মাছের মনো জেনেটিক্ ট্রেমাটোড্ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। ইহার জন্য আক্রান্ত মাছকে ২/৩ মি: ফরমালিন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা প্রয়োজন। সন্ধিপদ গোষ্ঠির পরজীবিদের *W.D.P.* প্রয়োগ করে মাছকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। *0.2 ppm* হারে গ্যামাক্সিন জলে প্রয়োগ করে মাছের অনেক পরজীবিকে মেরে ফেলাও সম্ভব।

অত্যধিক সংখ্যায় মাছ ছাড়লে পুকুরের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখা ও সুষম মৎস্য খাদ্য নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সুষম খাদ্য মাছের উৎপাদন যেমন বাড়ায় তেমনি অসুষম খাদ্য মাছের নানাবিধ পুষ্টি অভাব জনিত রোগের কারণ হয়। সর্বোপরি বলা যায় যে নিয়মিতভাবে মাছের রোগ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ও তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা মাছের রোগ আক্রান্ত হওয়াকে সীমিত রাখা পরিবেশ রক্ষায় মাছ চাষের প্রধান হাতিয়ার।

Common Fish Diseases and Their Remedies
Dr. Ajay Kurnar Ghosh
Former Director, Central Inland Capture
Fisheries Research Institute

জলাভূমি সংরক্ষণ প্রয়াসে মৎস্য দপ্তর

ডঃ মধুমিতা মুখার্জী
উপ অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জলাভূমি সংরক্ষণ ঃ কেন!!

পৃথিবীর তিনভাগ জল আর মাত্র একভাগ জুড়ে রয়েছে সমগ্র মানব সভ্যতার গৌরবের বিস্তার। এই তিন চতুর্থাংশের অধিকাংশ স্থানই দখল করে আছে লবণের দ্রবণ - অর্থাৎ সমুদ্র। সামান্য ভগ্নাংশ জুড়ে রয়েছে আমাদের কাছের জলাভূমি - যা খাল, বিল, দহ, পুকুর, দীঘি, বাওড়, নদী ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত। প্রাণের উদ্ভব থেকে ক্রমান্বয়ে লয়প্রাপ্তি সব জড়িয়ে আছে এই মিঠে জলের জলাভূমির সঙ্গে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দনকে অব্যাহত রাখার কাজে জলাভূমি অনুঘটকরূপে কাজ করে চলেছে।

এই সেদিনও যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ছিল, নগর ও তার পাশে নির্মিত কলকারখানা, বনভূমির নিয়মিত বিনাশ, আবাসন নির্মান ও কৃষিক্ষেত্র তৈরীর ফলে বহু জলাভূমি নষ্ট হয়েছে। তারই পরিণতিতে বিশুদ্ধ বায়ু ও জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর দেশের কোন না কোন প্রান্তে দেখা দিচ্ছে বন্যা বা খরা।

তাই আজ ভাবতে হচ্ছে জলাভূমি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে। সংরক্ষণ তখনই জরুরী হয়ে পড়ে - যখন আসে আক্রমণ - যা ভয় দেখায় বিলোপ প্রাপ্তির। আজ যেন ডাঙ্গা আক্রমণ করেছে জলকে - বন্যার সময় জল যেমন আক্রমণ করে ডাঙ্গাকে। ভরাট হচ্ছে জলাভূমি - উঠছে নগর সভ্যতার গর্বোদ্ধত ইমারত। কিংবা হেজে-মজে যাওয়া জলাভূমি পরিণত হচ্ছে চাষের জমিতে। বাড়ছে পরিবেশ দূষণ - হ্যাঁ, সব অর্থেই। এই মুহূর্তে তাই জলাভূমির সংরক্ষণ কার্যসূচী বড় প্রয়োজনীয়, বড় জরুরী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তর তাই এগিয়ে এসেছেন এই কাজে ব্রতী হয়ে। শুধু 'মৎস্য উৎপাদনের জন্য নয় - সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতীতিতে, ব্রাত্য জনের রুদ্ধ সংগীতের বহমানতায়, জেলে, দুলে, বাগ্‌দী নামক সমাজের দুর্বলতর, অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠীর কল্যাণে জলাভূমি সংরক্ষণ আজ আমাদের সামনে অন্যতম প্রধান কর্মসূচী।

এ রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর পুকুর জাতীয় বদ্ধ জলাশয়, ১ লক্ষ ৭২ হাজার হেক্টর নদী, ৮০ হাজার হেক্টর খাল ৪২ হাজার হেক্টর বিল-বাওড়, ১৭ হাজার হেক্টর রিজারভয়ার, ৫ হাজার হেক্টর ময়লা জলের জলাভূমি রয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগর সভ্যতা, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে মজে যাওয়া খাল, বিল, নদী প্রভৃতি এলাকাকে কৃষিকাজের

জন্য পাট্টা দেওয়া, সর্বোপরি বিত্তশালীদের আগ্রাসী ভূমিকা - এই জলাভূমিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে চলেছে। নির্বিচারে চলছে জলাভূমি বোজানোর 'উৎসব'। এরদ্বারা শুধুমাত্র যে জলাভূমির আয়তন সঙ্কুচিত হচ্ছে তাইই নয়, অনেক ক্ষেত্রে জলাভূমি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। জলাভূমিকে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও পরিবেশগত পর্যটন *(Ecotourism)* হিসেবে গড়ে তোলা যায়। যেমন কলকাতার কাছে নলবনে মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় এরকম একটি প্রাকৃতিক পরিভ্রমনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

জলাভূমি বিপর্যয় অনুসন্ধানে ঃ

এ রাজ্যে জলাভূমির বিপর্যয় শুরু হয় স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। প্রগতির জোয়ারে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জোয়ার ভাটায় ভাসতে গিয়ে নির্মমভাবে জলাভূমির সর্বনাশ করে চলেছি আমরা। জনসংখ্যা বাড়ছে অতি দ্রুত হারে। আর বাড়ছে বেকারের মুখ। কলকারখানা তৈরী হচ্ছে - দিতে হচ্ছে মানুষের মাথা গোঁজার সংস্থান। দৃষ্টি পড়েছে অরণ্যের দিকে, দৃষ্টি পড়েছে জলাভূমির দিকে। অবাধে যথেচ্ছ অরণ্যকর্তনে পাওয়া যাচ্ছে আবাদ যোগ্য জমি আর বাস্তুর সংস্থান। জলাভূমি ভরাট করলেই মিলছে জমির আকাশছোঁয়া দাম। তাই নিমেষে বদলে যাচ্ছে জলাজমির চরিত্র।

জলাভূমি সংরক্ষণের লক্ষ্যে মৎস্য দপ্তর ঃ

জলাভূমি সংরক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর বেশ কয়েক বছর ধরেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। গত ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছরই উদ্দীপনার সঙ্গে ১৬ই জুন (১লা আষাঢ়) 'জলাভূমি দিবস' পালন করা হয়ে থাকে। এই কয়েক বছরেই এ ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কেবলমাত্র গণচেতনা বৃদ্ধির মারফৎ 'জলাভূমি সংরক্ষণ' সম্ভব নয়। 'মুনাফার লোভে বা অন্যকারণে' যারা জলাভূমির বিনাশে সচেষ্ট তাদের দৃঢ় হাতে দমন করতে মৎস্য দপ্তর তাই কয়েকটি বলিষ্ঠ আইন প্রণয়ণ করেছেন। সর্বসাধারণকে অবহিত করতে এখানে সেই আইনগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো —

১। ওয়েষ্টবেঙ্গল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ এ্যাক্ট, ১৯৮৪ ঃ

বহুমালিকাধীন জলাশয় যদি উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় এবং যথাযথভাবে "মাছ চাষ না করা হয় তবে এই আইনের ৭নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (মৎস্য দপ্তরের জেলার ভারপ্রাপ্ত সহ অধিকর্তা) জলাশয়টির নিয়ন্ত্রণ পরিচালন" কর্তৃত্ব ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের জন্য নিয়ে নিতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে জলাশয়টিকে উক্ত কর্তৃপক্ষ "মাছ চাষের জন্য" কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাকে / গোষ্ঠীকে কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদ কালের জন্য ইজারা দেবার ব্যবস্থা করবেন।

২। ওয়েষ্টবেঙ্গল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ (এ্যামেণ্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৯৩ ঃ

এই সংশোধিত আইনের বলে ১৯৮৪ সালের আইনের সঙ্গে ১৭(ক) ধারা সংযোজিত হয়েছে। এই সংশোধনিতে কোন পুকুরের মালিক/মালিকগণকে জলাশয় খণ্ডিতকরণ বা ভরাট করা থেকে নিবৃত করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) পুকুরপাড় সহ ৫ (পাঁচ) কাঠা অর্থাৎ ০.০০৩৫ হেক্টর অথবা তার বেশী মাপের কোন ''শ্রেণীভুক্ত পুকুর''/ডোবা/জলাশয় ভরাট করা যাবে না।

(২) 'রেকর্ডভুক্ত' পুকুর/ডোবা না হয়ে স্থানটি যদি কেবলমাত্র নিচু জমিও হয় এবং বৎসরের ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় 'জলধারণ' করে থাকে তবে সেই জমিও ভরাট করা যাবে না।

(৩) কোন ''বড় জলাশয়কে'' কৃত্রিমভাবে বাঁধ দিয়ে ৫ কাঠা বা তার চেয়ে ছোট মাপের জলায় পরিণত করাও নিষিদ্ধ।

(৪) জলাশয়টি কেবলমাত্র ''মাছ চাযের'' জন্য ব্যবহার করা যাবে - অন্য কোন ভাবে নয়।

কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যদি আইন লঙ্ঘন করে ''জলাশয়'' ভরাট করেন বা করার প্রয়াস পান তবে ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' এই আইনের ২ নং উপধারা অনুযায়ী আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯৮৪ সালের আইনের ২(১) ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত আধিকারিগণ তাদের নিজ নিজ এলাকার জন্য ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' *(Competent Authority)* হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন ঃ

(ক) পৌর এলাকা ঃ পৌরসভার নির্বাহী আধিকারিক

(খ) পঞ্চায়েত এলাকা ঃ সংশ্লিষ্ট ব্লকের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার।

(গ) কলকাতা পৌর নিগম এলাকা ঃ পৌর কমিশনার কলকাতা পৌর নিগম।

(ঘ) সমগ্র জেলার ক্ষেত্রে ঃ সহ-মৎস্য অধিকর্ত্তা। সংশ্লিষ্ট আইনের ১০নং প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ''উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ'' আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণিত দণ্ড বিধানের অধিকারীঃ

(১) আইনভঙ্গকারীকে নিজব্যয়ে জলাশয়টি আবার সংস্কার করে দিয়ে ভরাট করার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

(২) ''জলাশয়টিকে'' পূর্বাবস্থায় (সংস্কার করে) ফিরিয়ে না আনলে ''উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ'' জলাটির ''নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন'' দায়িত্ব নিয়ে নেবেন এবং সংস্কার সাধন করবেন। সংস্কারের সমুদয় ব্যয় ''জলাশয়'' মালিককেই বাধ্যতামূলকভাবে বহন করতে হবে।

(৩) ''জলাশয়''টি সংস্কারের পর ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' মাছ চাষের ''মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীকে'' দীর্ঘমেয়াদের (অন্যূন ১০ বৎসর) ইজারা দিতে পারবেন।

এই আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ দোষী প্রমাণিত হ'লে শাস্তি হিসাবে ২ (দুই) বৎসরের জন্য কারাবাস এবং/অথবা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা হইবে।

৩। ওয়েষ্টবেঙ্গল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ (এ্যামেণ্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৯৭ ঃ

এই সংশোধনী বলে ১৯৮৪ সালের আইনের ১৭ (ক) ধারার সঙ্গে ১২ নং উপধারা সংযোজিত হয়েছে। এই সংশোধনী অনুসারে ৫ (পাঁচ) কাঠা বা তার বেশী মাপের পুকুর/ডোবা/ জলাভূমি ''ভরাট করার অপরাধ'' কে ''জামিন অযোগ্য আদালতগ্রাহ্য অপরাধ'' *(Congnizable & nonbailable)* বলে গণ্য করা হবে।

মৎস্য দপ্তর আশা করেন সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষ সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে রাজ্য সরকারের এই প্রয়াসে সামিল হবেন এবং এই বলিষ্ঠ আইনের বলে বলীয়ান ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ''কে জলাভূমি সংরক্ষণের মহৎ প্রয়াসে সহায়তা দেবেন।

জলাভূমি মানব সভ্যতার বিশেষতঃ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য আমাদের বন্ধুর মতো, এর সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হবে। একে ধ্বংস করলে ফল হবে মারাত্মক। দেখা দেবে নানান বিপর্যয় — যার পরিনাম হবে সুদুরপ্রসারী। যেখানে জলাভূমি সংঙ্কোচনের প্রশ্ন আসবে সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। জলাশয়কে রক্ষা করা আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমাদের পরিবেশ উন্নত হবেনা যদিনা আমরা সচেতন হই এবং জলাভূমি সংকোচনের অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি।

পরিবেশকে নির্মল ও দূষণমুক্ত করার দায়িত্ব সকলেরই। মৎস্য দপ্তরের সাথে যারা যেখানে যেভাবে যুক্ত, দপ্তরের আধিকারিক হোন, বা সাধারণ নাগরিক হোন, জলাশয়কে ধ্বংস করার যে কোন উদ্যোগকে আসুন আমরা প্রতিহত করি।

সভ্যতার নামে প্রকৃতির এই নির্মম ধর্ষণ হাজার হাজার বছরের প্রকৃতি — মানুষের সম্পর্কের বুনিয়াদে মস্ত বড় এক ফাটল ধরিয়েছে। সামনে ভেসে উঠছে পৃথিবী ধ্বংসের এক ভয়ঙ্কর চিত্রকল্প। মানুষের অস্তিত্ব তথা আগামী প্রজন্মের অস্তিত্বকে বাঁচাতে রোগা শীর্ণ জলাভূমি আজ আপনার শুভ বুদ্ধির দারস্থ।

Role of State Fishery Department, in Conservation of Water bodies
Dr. Madhumita Mukherjee
Depty.Director, Bacteriology & Parasitology Unit, Fishery Dept.
Govt. of West Bengal

পশু পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী

অধ্যাপক রাহুল সিনহা
প্রাক্তন ডিন, পশ্চিমবঙ্গ পশুপালন ও মৎস্যবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়

অল্প কদিনের কথা। কেষ্টপুর স্বরোজগার ও স্বনির্ভরতার আলোচনা চক্রে যোগ দিয়েছিলাম। এ যুগের যুব সমাজের সদস্যরা যেভাবে উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছিল ঠিক তেমনিই হতাশায় ভুগছে এমন একজন বলে উঠল, জমি কোথায় যে চাষ করব? তখন বলেছিলাম চাষ জমিতো ভাই তোমার আছে। হতাশা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এসো। এখন টমেটোর দাম ১ থেকে ২ টাকা কিলো, একটা কড়াই আর উনুন থাকলেই তো তুমি সস্ বানিয়ে সারা বছর বিক্রি করতে পার। তার জন্য দরকার সামান্য প্রশিক্ষণ ও সামান্য পুঁজি। এর জন্য এখনই ব্যাঙ্ক এর দরজায় ছোটার দরকার নেই। এভাবে আমের আচার, পেয়ারার জেলি, জ্যাম, লঙ্কার সস্, ডালের বড়ি, আমসত্ব, লেবুর স্কোয়াস্ ইত্যাদি অনেক কিছুই করে কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ করা যেতে পারে। চাষ মানে জমি লাঙ্গল সার যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি চাষ বলতে মাছ, গবাদি পশু, হাঁস, মুরগী, ছত্রাক *(Mashroom)* ইত্যাদি সবই বোঝায়। এমন কি চিঁড়ে মুড়ি, মুরকি সবই কৃষির অন্তর্গত। যে দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষি পণ্যের উপর নির্ভরশীল সে দেশে কোনও মানুষের বেকার থাকার কথা নয়। চাই সাহস, মানসিকতা ও উৎসাহ। চাষের জমি আছে কি নেই বড় কথা নয়। গরুর গাড়ী তৈরী ও সারান; জলসেচের সরঞ্জাম তৈরী ও সারান এ সবই কৃষিকাজ। কৃষিপণ্য পৌঁছে দেওয়া সেই কৃষি কাজের অন্তর্গত।

এবার আসা যাক প্রাণীপালনের মাধ্যমে স্বরোজগার ও স্বনির্ভরতার কথায়।

গ্রামের মানুষের ঘরে কিছু হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গরু সবই থাকে। তার সঙ্গে থাকে কিছু চাষের জমি বা ঘরের উঠোন। যা আছে তার থেকে কিছু উপার্জন হয় যেমন হাঁস, মুরগীর ডিম, মাংস, ছাগল ভেড়ার মাংস, গরুর দুধ, বা লাঙ্গল গাড়ী বা সেচের কাজে বলদের ব্যবহার। সামান্য গ্রামীণ প্রযুক্তি এর সঙ্গে যোগ করতে পারলে উৎপাদন অনেক বাড়িয়ে ফেলা যায়। এই সব প্রযুক্তি এমনই যাতে খরচ প্রায় কিছু নাই বললেই চলে। সহজ প্রযুক্তিগুলি একে একে আলোচনা করা যাক।

১। একটি গ্রামে ১০০০ ডিম দেওয়ার উপযুক্ত দেশী মুরগী ও ৫০০ দেশী হাঁস আছে। সব দেশী মোরগ ও মুরগী, দেশী হাঁস বিক্রি করে ১০টি মুরগী ও হাঁস পিছু একটি

করে রেড আইল্যাণ্ড মোরগ ও খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস কেনা যেতে পারে। এর ফলে পরবর্ত্তি প্রজন্মে ঐ গ্রামে সব মুরগী ও হাঁসের যে শঙ্করায়ণ হবে তার ফলে প্রতিটি হাঁস মুরগী পিছু ১ বছর পরে অন্তত ৩০টি করে ডিম বেড়ে যাবে। এর জন্য আরও একটু কাজ আছে। সব হাঁস মুরগীকে রাণীক্ষেত, ফাউল পক্স ও ডাক প্লেগ ইত্যাদির টীকা দিতে হবে ও বছরে অন্তত ২ বার কৃমি নাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। খরচ হবে খুব বেশী হলে ১টি হাঁস বা মুরগীর জন্য ২ থেকে ৩ টাকা।

১০০০ মুরগী পরবর্ত্তি প্রজন্মে ৩০০০০ বেশী ডিম দেবে ও ৫০০ হাঁস পরবর্ত্তি প্রজন্মে ১৫০০০ বেশী ডিম দেবে। পরের প্রজন্ম থেকে শঙ্কর জাতীয় হাঁস মুরগী ছাড়া দেশী হাঁস মুরগী ঐ গ্রামে থাকবে না। অর্থাৎ এই যে বর্ধিত উৎপাদন তা থেকেই যাবে। এখনও কিছু কাজ আছে। পরের প্রজন্ম থেকে লক্ষ রাখতে হবে যেন শঙ্কর মোরগ বা হাঁস অন্য কোন গ্রামের মোরগ হাঁসের সঙ্গে বদল করে নেওয়া হয়। তার ফলে ভাই বোন, বাবা মেয়ে, মা ছেলের প্রজনন রোধ করা যাবে ও উৎপাদনের বৃদ্ধি সঠিকভাবে রক্ষণ করা সম্ভব হবে। এতক্ষণ যা বললাম তা কোনও গল্প কথা নয় অনেক গ্রামেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে হাতে নাতে ফল পাওয়া গেছে। প্রযুক্তি গ্রহণ করা ও তার উপযুক্ত প্রয়োগ করার দায়িত্ব গ্রামের মানুষের। তাই এগিয়ে আসুন নিখরচার প্রযুক্তি সমস্ত গ্রামের মানুষ একসঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে সফল করুন। ভাবুন তো একটি গ্রামে সকলের সহযোগিতায় যদি ৪৫০০০ ডিমের উৎপাদন বাড়ান যায়। তবে ১০টি গ্রামে এই প্রযুক্তির সফল রূপায়ণ হলে ৪,৫০,০০০ ডিমের উৎপাদন বাড়বে।

২। গ্রামে অনেক চাষির ঘরেই ছাগল বা (কোথাও কোথাও) ভেড়া আছে। অনেক সময় দেখবেন কোনও কোনও ছাগলের তিনটা বাচ্চা হচ্ছে। কারও বা চারটা পাঁচটা পর্যন্ত বাচ্চা হচ্ছে। সংখ্যায় কম হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে ছাগলের বেশী বাচ্চা হয় তার সবকটি বাচ্চাকেই গ্রামে সংরক্ষণ করুণ ও কম বাচ্চা দেওয়া ছাগল ও তার বাচ্চা বিক্রি করে দিন। এর ফলে ঐ গ্রামের ছাগলের ভেতর বেশী বাচ্চা দেবার প্রবণতা *(Facundity)* বেড়ে যাবে। আশেপাশের গ্রামেও একই প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য মানুষকে উৎসাহ দিন। পরবর্ত্তি প্রজন্মে পুরুষ ছাগল বা ভেড়া অন্য গ্রামের সঙ্গে বদল করে নিন যাতে নিকট আত্মীয়ের ভেতর প্রজনন রোধ করা সম্ভব হয়। এবার প্রতি বছর বর্ষার আগে ও পরে অন্তত দুবার সব ছাগল ভেড়াকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ান। গোট পক্স, পি পি আর ইত্যাদি রোগের টীকা দিন ও লক্ষ রাখুন যাতে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া জনিত রোগ না হয়। রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে

পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রযুক্তি এক বছর সঠিক রূপায়ণ করতে পারলে গ্রামে অন্তত ২৫% ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। ও প্রতি ছাগলের গড় ওজন অন্তত ১ কিলোগ্রাম বেড়ে যাবে। ধরা যাক গ্রামে ২০০ ছাগল ছিল - পরের প্রজন্মে বেড়ে হল - ২৫০ এবং ওজন ১ কেজি করে বাড়ল। অর্থাৎ ২৫০ কেজি বর্ধিত উৎপাদন। ১ কেজির দাম ধরা যাক ৮০ টাকা। তাহলে বর্ধিত উৎপাদন টাকার অঙ্কে ২৫০ x ৮০ = ২০,০০০ কুড়ি হাজার টাকা। যদি এই প্রকল্প দশটি গ্রামে সঠিক রূপায়ণ করা যায় তাহল আয় বাড়বে ২,০০,০০০ (২ লাখ) টাকা। উৎপাদন আরও বাড়ান যেতে পারে যদি উপযুক্ত পরিমান ঘাস ও গাছের পাতার যোগান দেওয়া যায়। পুকুরের পাড়ে, রাস্তার ধারে জমির বেড়ায় এমন গাছ লাগান যেতে পারে যার পাতা ছাগলের পক্ষে খুব উপকারি।

আগ্রহ, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার মাধ্যমে যে কোন বেকার যুবক-যুবতী পশু পালনের মাধ্যমে স্বউপার্জন ও স্বনির্ভরতার পথে নিজেকে সাবলম্বী করে তুলতে পারে। শুধু প্রয়োজন নিষ্ঠা ও নিজের পায়ে দাঁড়াবার মানসিকতা। আমাদের দেশে জৈব বৈচিত্রের কোন অভাব নেই। শুধু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের চেষ্টার সঙ্গে ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় পশুপালন সংক্রান্ত যে কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের ও নিজ পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামোটা সহজেই মজবুত করে তোলা যেতে পারে।

Self employment through animal rearing
Prof. Rahul Sinha
Former Dean, West Bengal University of Animal Sciences & Fisheries

স্বনির্ভরতার পথে ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে প্রাণী পালনের বিশেষ ভূমিকা

সভ্যতার আদি যুগ থেকে প্রাণী পালন মানুষের কৃষ্টি ও জীবিকার সাথে যুক্ত রয়েছে। কৃষি নির্ভর পশ্চিমবঙ্গে কৃষির সাথে পশুপালন এক চিরাচরিত প্রথা। লাল মাটির দেশ বীরভূম, যেখানে কোনো বড় শিল্প গড়ে ওঠেনি সেখানে সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাণীপালন শুধু গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থারই পরিবর্তন করতে পারে না, বেকারত্বের প্রখর জ্বালাও প্রশমন করতে পারে। আর পরিমাণ মত দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি পুষ্টির মাধ্যমে জন্ম দিতে পারে এক সুস্থ ভবিষ্যত।

যেখানে মানষের গড়ে দৈনিক ২৮০ গ্রাম দুধের প্রয়োজন সেখানে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক পান ১২০ গ্রাম, ভারতবর্ষের প্রতি নাগরিক পান ১৭৮ গ্রাম আর বীরভূমের নাগরিক পান মাত্র ৮৬ গ্রাম।

দুধের উৎপাদন বাড়াতে গেলে দেশী গাভীর বদলে সংকর জাতের গাভী পালন করতে হবে। কারণ দেশী গাভী যেখানে দৈনিক ১-১.৫ লি. দুধ দেয় সেখানে সংকর জাতের গাভী কমপক্ষে দৈনিক ৫-৬ লি. দুধ দেয়।

সংকর জাতের গাভী কিভাবে পাবেন ঃ

যদিও বাইরে থেকে সংকর জাতের গাভী কিনে আনা যায় কিন্তু তাতে দাম বেশী হয়, প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না এবং বাইরের গরু এই আবহওয়ায় সবসময় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। তাই সংকর জাতের গাভী পাওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় হল কৃত্রিম প্রজনন, যেখানে উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বীরভূম জেলায় ৯০টি কেন্দ্র থেকে হিমায়িত গোবীজ দ্বারা সংকরায়নের ব্যবস্থা আছে। খুব শীঘ্রই প্রতি পঞ্চায়েতে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে।

কৃত্রিম প্রজনন কেন করবেন ঃ

১) উন্নত জাতের বাচ্চা পাওয়া যায়।

২) বিভিন্ন যৌন রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৩) ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না।

৪) খরচ কম।

৫) উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ বহুদিন পরেও ব্যবহার করা যায়।

৬) গাভীকে ষাঁড়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

৭) বহুদূর থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও ষাঁড়ের বীজ আনা যায়।

৮) এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন বকনা ১৮ মাস বয়সেই প্রজননের উপযুক্ত হয়।

৯) সংকর জাতের গাভী প্রতি বছর বাচ্চা দেয়।

১০) সংকর জাতের বলদ হালের উপযুক্ত নয় - এ ধারণা ঠিক নয়।

১১) এই পদ্ধতিতে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রজনন কর্মসূচী নেওয়া যায়।

বাছুরের যত্ন কিভাবে করবেন ঃ

১) জন্মের আগেই গর্ভবতী গাভীকে ৬ মাসের গর্ভাবস্থার পরে অন্ততঃ ১ কেজি অতিরিক্ত সুষম খাদ্য দিতে হবে। সবুজ গোখাদ্য পরিমাণ মত দিতে হবে।

২) জন্মের পর নাড়িতে সুতো বেঁধে দিতে হবে এবং টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে।

৩) তিন চার দিন গাঁজলা দুধ অবশ্যই দিতে হবে। বাছুরের যা ওজন তার দশ ভাগের এক ভাগ দুধ অবশ্যই দিতে হবে। যদি ২০ কেজি ওজন হয় তবে ২ কেজি দুধ সারাদিনে খাবে।

৪) কোন কারণে বাছুরের জন্মের পর যদি মা মারা যায় তবে ঐ একই সময়ে অন্য কোন গাভীর বাচ্চা হলে সেই গাভীর গাঁজলা দুধ বাছুরকে দিতে হবে। সেটা সম্ভব না হলে কৃত্রিম উপায়ে গাঁজলা দুধ তৈরী করে ৩-৪ দিন খাওয়াতে হবে। কি করে তৈরী করবেন তা নীচে দেওয়া হল -

১টা ডিম + ২৭৫ মি.লি. উষ্ণ জল + $^{১}/_{২}$ চামচ ক্যাসটর অয়েল + ১০,০০০ আই.ইউ.ভিটামিন এ +৫২৫ মি.লি. উষ্ণ দুধ +৮০ মি.গ্রাম অরিওমাইসিন পাউডার।

এইভাবে তৈরী গাঁজলা দুধ দিনে ৩ বার খাওয়াতে হবে।

৫) ২-৩ মাস বয়স থেকে অল্প ঘাস ও সুষম খাদ্য দিতে হবে।

৬) জন্মের পরে প্রথম মাসে একবার কৃমির ঔষধ ও পরে ডাক্তারবাবুর পরামর্শে নিয়মিত কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।

৭) বিভিন্ন রোগ যেমন খুরাই, বজবজে, গলাফোলা ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে।

একটি পূর্ণ বয়স্ক গাভীকে কতখানি খাবার দেবেন ঃ

সাধারণতঃ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য প্রতি গাভীকে দৈনিক ২ কেজি করে সুষম খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন এবং প্রতি ২ কেজি দুধের জন্য ১ কেজি সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। গর্ভবস্থার ৬ মাস পরে অতিরিক্ত ১ কেজি সুষম খাদ্য প্রয়োজন। যদি কোন গাভী ৪ কেজি দুধ দেয়

তার প্রয়োজন ২ + ২ = মোট ৪ কেজি সুষম খাদ্য। ১০ কেজি সবুজ ঘাসের পরিবর্তে ১ কেজি সুষম খাদ্য কম দেওয়া যেতে পারে।

সুষম খাদ্য কিভাবে পাবেন ঃ

এপিক এবং অনেক সংস্থা সুষম খাদ্য তৈরী করে, কিনে নেওয়া যায় অথবা নিজেই তৈরী করে রাখতে পারেন —

শস্য জাতীয় খাদ্য যথা গম ভাঙা, ভুট্টা ভাঙা খুদ ইত্যাদি	৫০ ভাগ
খোল জাতীয় খাদ্য যথা সরষে, তিল, বাদাম খোল ইত্যাদি	৩০ ভাগ
ভূষি জাতীয় খাদ্য যথা গমের ভূষি, চালের কুঁড়ো ইত্যাদি	২০ ভাগ

এতে ১ শতাংশ খনিজ লবন মেশাতে হবে।

গোখাদ্য হিসেবে ইউরিয়া ঃ

সঠিক ও পরিমাণ মত ইউরিয়া গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে খাবারের খরচ অনেক কম পড়ে। ইউরিয়া দুভাবে খাওয়ানো যায়।

প্রথম পদ্ধতি — মাঝারি মাপের গরুর জন্য ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম চিটে গুড়, ভিটামিন ও পরিমাণ মত জল দিয়ে কাটা খড় মাখামাখি করে মিশিয়ে গাভীকে খাওয়ানো যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি — ৪ কেজি ইউরিয়া, ৩০ লিটার জলে গুলে ১০০ কেজি খড়ে গাদা দেওয়ার সময় অল্প অল্প করে ছিটাতে হবে। দেওয়া হয়ে গেলে দু একজন লোক খড়ের গাদার উপর উঠে একটু চাপ দেবে যাতে ভিতরের হাওয়া বেরিয়ে যায়। তারপরে পলিথিন দিয়ে চাপা দিয়ে দিতে হবে। ২১ দিন পর এই খড় খাওয়ানো যেতে পারে।

সাবধানতা — ৬ মাসের কম বয়সের বাছুরকে খাওয়ানো চলবে না। পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সবুজ ঘাস কেন চাষ করবেন ঃ

গোখাদ্য হিসেবে সবুজ ঘাসের কোনো বিকল্প নাই।

১) সস্তায় গোখাদ্য পাওয়া যায়।

২) ভিটামিন, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ থাকে।

৩) রাতকানা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি রোগের প্রকোপ কমায়।

৪) জমিকে উর্ব্বর করে।

৫) জমির ক্ষয় রোধ করে।
৬) বিভিন্ন জমি যা চাষের কাজে ব্যবহার করা যায় না সেই সব জমিতেও সবুজ ঘাসের চাষ করা সম্ভব। এমনকি বাগানেও সবুজ ঘাসের চাষ সম্ভব।
৭) দুটো শস্য ওঠার মধ্যিখানেও সবুজ ঘাস চাষ করা যায়।

সবুজ ঘাস কত রকম হয়?

হাইব্রীড নেপিয়ার, গিনি, থিননেপিয়ার, স্টাইলো, প্যারা প্রভৃতি বারো মাসের ঘাস। ওটস্, বারসীম, লুসার্ন প্রভৃতি শীতকালে হয়। আর গ্রীষ্মে জোয়ার, গামা, গাইমুগ, দীননাথ প্রভৃতি সবুজ ঘাসের চাষ করা সম্ভব।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

গবাদি পশুর বিভিন্ন রকম রোগ হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কৃমি — কৃমি বিভিন্ন রকম হতে পারে। কৃমি হলে গাভী শুকিয়ে যাবে। পাতলা পায়খানা হবে। গলা ফুলে যাবে। দুর্বল হয়ে যাবে এবং মারাও যেতে পারে। উপযুক্ত ঔষধ খাইয়ে এই রোগের প্রতিবিধান করা যায়। জলা জমির ঘাস কখনও খাওয়ানো উচিৎ নয় কারণ এর থেকে কৃমির উৎপত্তি হয়।

বজবজে (B.Q.) — সাধারণতঃ ছোট বয়সে বাছুরের এই রোগ হয়। খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পিছনের পা ফুলে যায় এবং টিপলে বজবজে করে আওয়াজ হয় এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। রক্ত পরীক্ষা করে এই রোগের জীবানু ধরা যায় এবং টীকা দিয়ে এই রোগের সংক্রমন প্রতিরোধ করা যায়।

গলাফোলা (H.S.) — সাধারণতঃ বর্ষার আগে এই রোগ হয়। গলা ফুলে যায়। খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং ২-৩ দিনের মধ্যে মারা যায়। এই রোগেরও টীকা পাওয়া যায়।

তড়কা (Anthrax) — খুব মারাত্মক অর্থাৎ গরু মারা যেতে পারে। পেট ফুলে যায়। নাক, মুখ, পায়খানার দ্বার থেকে রক্ত বেরোয়। এই রোগ মানুষেরও হতে পারে। এই রোগেরও প্রতিষেধক টীকা আছে।

খুরাই (F.M.D.)— এই রোগ হলে মুখে ও পায়ে ঘা হয়। খেতে পারে না, দুধ বন্ধ হয়ে যায়। গর্ভনাশ হতে পারে। ভর্তুকী মূল্যে এই রোগের টীকার ব্যবস্থা আছে।
খুরাই ব্যতীত অন্যান্য রোগের টীকা বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা আছে।

লাভজনক ভাবে গাভী পুষতে গেলে কয়েকটি ব্যাপারে অবশ্যই নজর দিতে হবে ঃ

১) সংকর জাতের গাভী পালন করতে হবে।

২) আমাদের দেশের জলবায়ুতে ৫০ ভাগ দেশী ও ৫০ ভাগ বিদেশী গরুর মিশ্রণই শ্রেয়।

৩) যাতে Inbreeding বা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে প্রজনন না হয় তা দেখতে হবে।

৪) নিয়মিত কৃমির ঔষধ ও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) পরিমান মত সুষম খাদ্য ও সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) ১৮ মাস বয়সেই যাতে বকনা গরু প্রজননক্ষম হয় তা দেখতে হবে।

৭) প্রতি বছর যেন একটা বাছুর পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।

৮) বাচ্চা দেবার পর তিন মাসের মাথায় যাতে গাভীটি পুনরায় গরম হয় তা দেখতে হবে। ফলে অল্প দিন বসিয়ে খাওয়াতে হবে।

৯) পশু চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। সবুজ ঘাসের বীজ, বিভিন্ন টীকা প্রভৃতি ব্লক প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পাওয়া যাবে। কোনো গরু, বাছুর মারা গেলে পশু চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্যান্য প্রাণীদের উপযুক্ত টীকার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাঁস পালন ঃ

উন্নত জাতের হাঁস বাড়িতে অল্প করে রেখে অথবা বড় খামার করেও রাখা যায়। দেশী হাঁস যেখানে মাসে ১০-১২ টা ডিম দেয়, উন্নত জাতের খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস সেখানে সঠিক খাদ্য ও যত্ন পেলে ২৪-২৫ টা ডিম দিতে পারে।

বীরভূমের বড়মহুলা ফার্মে একটা ছোট হাঁসের খামার আছে। সেখান থেকে অল্প বাচ্চা পাওয়া যায়। বাচ্চা ফোটানোর হাঁসের ডিম ২.৫০ টাকা মূল্যে প্রচুর পাওয়া যায়। কোনো কুঁকরি মুরগী বা হাঁস দিয়ে তা দিয়ে বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। যদি বাচ্চার প্রয়োজন অনেক বেশী হয় তবে ব্লক প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে অন্য জেলা থেকে বাচ্চা এনে সঠিক মূল্যে তা সরবরাহ করা হয়।

অনেক সময় দেখা যায় উন্নত জাতের হাঁস প্রতিপালন করা একটু কষ্টসাধ্য হয়। সেখানে উন্নত জাতের হাঁসের সঙ্গে দেশী হাঁসের মিলন ঘটিয়ে সংকর হাঁস পাওয়া যেতে পারে। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশী, অল্প যত্ন লাগে এবং মাসে ২০ টার মত ডিম দেয়।

হাঁসের খাবার ঃ

পরিষ্কার পাত্রে খাবারের সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে হাঁসকে খেতে দিতে হয়। বাসি খাবার দেওয়া চলবে না। ছোট বাচ্চা থেকে ৫ মাস বয়স অবধি হাঁসকে যে খাবার দেওয়া হয় তাকে স্টাটার ম্যাস বলে। আর ডিম দিতে শুরু করলে বা পাঁচ মাস বয়স হলে যে খাবার দেওয়া হয় তাকে লেয়ার ম্যাস বলে। খাবার দোকান থেকে কিনে নেওয়া যায় অথবা বাড়িতে তৈরী করে নিতে পারেন।

	স্টাটার ম্যাস	লেয়ার ম্যাস
গম বা মাইলো গুঁড়ো	৬০ ভাগ	৬৫ ভাগ
সয়াবিন খোল	১৮ ভাগ	১৫ ভাগ
মাছের গুঁড়ো	১০ ভাগ	৮ ভাগ
চালের কুঁড়ো	৬ ভাগ	৫ ভাগ
ঝিনুক কুচি	৪ ভাগ	৫ ভাগ
খনিজ লবন	২ ভাগ	২ ভাগ
	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

এর সাথে প্রতি ১০০ কেজি খাবারে এ, বি২, ডি৩ ১০ গ্রাম, লাইসিন ২০ গ্রাম ও মিথিওনিন ২০ গ্রাম মেশানো দরকার।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

হাঁসের রোগ মোটামুটি কম হয়। তবে রোগ হলে বা মারা গেলে পশু চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

১) **আফলাটক্সিকোসিস** — এক রকম ছত্রাক জনিত রোগ। বাসি বা পচা খাবার থেকে এই রোগ হয়। এতে হাঁস মারাও যেতে পারে। শব ব্যবচ্ছেদ করে মোটামুটি এই রোগের লক্ষণ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এই রোগ হলে খাবার পরিবর্তন করে দিতে হবে। খাবারের জায়গাও পরিষ্কার রাখতে হবে। নীচের ঔষধ অনেক সময় ভাল কাজ দেয়।
   ৫০ গ্রাম তুঁতে + ২০০ মিলি. ভিনিগার + ৮০০ মিলি. শুদ্ধ জল। এটা তৈরী করে রেখে দিতে হবে। এই ঔষধ ১০ মিলি. এক লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে ৭ দিন খেতে দিতে হবে।

২) **ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস** — ভাইরাস জনিত রোগ। কম বয়সের পাখি, সাধারণতঃ ২১ দিনের মধ্যে হয়। খাবারে অনীহা, সাদা পায়খানা, ঝিমুনি।

৩) **ইনফেকসাস সেরোসাইটিস এবং হাঁসের কলেরা** — ব্যাকটিরিয়া জনিত রোগ। সব বয়সের পাখিতেই হয়। তবে কলেরা সাধারণতঃ ১২-১৪ সপ্তাহের পর হয়। খাবারে অনীহা, সবুজ পায়খানা, নাক ও চোখ দিয়ে জল পড়া, অবসন্নতা, শ্বাসকষ্ট, ডিম কম দেওয়া - হল এই রোগের লক্ষণ। এর প্রতিরোধে উপযুক্ত টীকার ব্যবস্থা আছে।

৪) **ডাকপ্লেগ** — ভাইরাস জনিত রোগ। মাঝারি থেকে বড় বয়সের হাঁস এই ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়। নাক ও চোখ দিয়ে জল পড়া, পিচুটি জমা, শ্বাসকষ্ট, ঝিমুনি, অবসন্নতা, সাদা বা সবুজ পায়খানা - এই রোগের লক্ষণ এর প্রতিরোধে উপযুক্ত টীকার ব্যবস্থা আছে।

মুরগী পালন ঃ

বড় খামার করে যেমন মুরগী রাখা যায় তেমনই বাড়িতেও অল্প পরিমান উন্নত জাতের মুরগী রাখা যেতে পারে। সারাদিনে খুঁটে খুঁটে খাবে অল্প কিছু খাবার দিলেই চলে। দেশী মুরগী ১০-১২ টার বেশী ডিম দেয় না। সেখানে উন্নত জাতের মুরগী ২৫-২৬টা ডিম দিতে পারে।

	চিক ম্যাস	গ্রোয়ার ম্যাস
হলুদ ভুট্টার গুঁড়ো	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম বা মাইলো গুঁড়ো	১০ ভাগ	২০ ভাগ
বাদাম খোল	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
কালো তিলের খোল	৭ ভাগ	৫ ভাগ
মাছের গুঁড়ো	১০ ভাগ	৭ ভাগ
চালের গুঁড়ো	৫ ভাগ	৫ ভাগ
তেল ছাড়া কুঁড়ো	২২ ভাগ	২৬ ভাগ
ঝিনুক কুচি	৪ ভাগ	৫ ভাগ
খনিজ লবন	২ ভাগ	২ ভাগ
	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

প্রতি ১০০ কেজি খাবারের সঙ্গে মেশাতে হবে -

ভিটামিন এ, বি২, ডি৩	১০ গ্রাম
ককসিডিওস্ট্যাট	৫০ গ্রাম

লাইসিন	১০ গ্রাম
মিথিওনিন	৩০ গ্রাম

প্রধান রোগ ঃ

১) **রানীক্ষেত রোগ** — ভাইরাস জনিত রোগ। লক্ষণ - ঝিমুনি, সাদা পায়খানা। এর প্রতিরোধে উপযুক্ত টীকার ব্যবস্থা আছে।

২) **বসন্ত রোগ** — ভাইরাস জনিত রোগ। লক্ষণ - গুটি হয় মুখে, ঝুঁটিতে ও কানের লতিতে। এর প্রতিরোধে উপযুক্ত টীকার ব্যবস্থাও আছে।

৩) **ককসিডিওসিস** — পরজীবি বাহিত রোগ। রক্ত পায়খানা, ঝুঁটি ফ্যাকাসে ও পালক এলোমেলো হয়ে যায়। উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা আছে।

৪) **কৃমি** — বিভিন্ন রকম কৃমি হয়। উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা আছে।

ছাগল পালন ঃ

বাংলার কালো ছাগলই খুব ভালো। এদের রোগ বিশেষ হয় না এবং বছরে দুবার বাচ্চা দিতে পারে। একসঙ্গে ২-৩ টে বাচ্চাও হয়। এদের প্রধান রোগ -

১) ইমম্যাচিওর অ্যাম্ফিস্টোমিয়েসিস — জলা জমির ঘাস থেকে এই রোগ হতে পারে। খুব পাতলা পায়খানা করে - এরফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। শব ব্যবচ্ছেদ করে এই রোগ ধরা যায় এবং উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে এই রোগ ভাল করা যায়।

২) পি.পি.আর — এটা একটা ভাইরাস জনিত মারত্মক রোগ। প্রথমে জ্বর হয়, পাতলা পায়খানা, খাওয়া বন্ধ, নাক দিয়ে সর্দি পড়া এবং মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই রোগে ছাগল মারা গেলে না ফেলে দিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ করে রোগের লক্ষণ বোঝা যায়। ল্যাবরেটরিতে বরফের মধ্যে বিশেষ অংশ যথা স্পিলন, মেসেনটরিক গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদি পাঠাতে হবে এবং টীকার ব্যবস্থা করতে হবে।

শুয়োর পালন ঃ

বিদেশী শুয়োর বা সংকর শুয়োর পালন করা যায়। সুষম খাদ্য দিতে হবে। উচ্ছিষ্ট খাবার, তরিতরকারী ইত্যাদিও দেওয়া যায়। একসঙ্গে ৮-১০ টা বাচ্চা দিতে পারে। বছরে দুবার বাচ্চা পাওয়া যায়। শুয়োরের খাবার কিনতে পাওয়া যায় অথবা তৈরীও করে নিতে পারেন।

	বাচ্চা শুয়োরের খাবার	বড় শুয়োরের খাবার
বাদাম খোল	২০ ভাগ	১০ ভাগ
কালো তিল খোল	৫ ভাগ	৩ ভাগ
মাছের গুঁড়ো	৫ ভাগ	২ ভাগ
গম বা ভুট্টার গুঁড়ো	২০ ভাগ	২০ ভাগ
গমের ভূষি	১০ ভাগ	১০ ভাগ
চালের কুঁড়ো	১০ ভাগ	১৫ ভাগ
চালের খুদ	৩০ ভাগ	৪০ ভাগ
	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

প্রতি ১০০ কেজিতে ১ কেজি খনিজ লবন, ৫০০ গ্রাম খাবার লবন, ২৫ গ্রাম ভিটামিন এ ডি ৩ মেশানো দরকার।

১) এঁয়ো — পায়ে, মুখে ঘা হয়। উপযুক্ত টীকার ব্যবস্থা আছে।

২) সোয়াইন ফিভার — জ্বর, বমি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি এর লক্ষণ। তিন মাস বয়সে প্রথম টীকা দিতে হবে। এর পর প্রতি বছর এক বার করে টীকা দিতে হবে।

৩) কৃমি — বিভিন্ন রকম কৃমি রোগ হয়। পাতলা পায়খানা করে। উপযুক্ত ঔষধ দিতে হবে।

৪) রক্ত কমে যাওয়া অসুখ — ছোট বাচ্চাদের হয়। উপযুক্ত ঔষধে ঠিক করা যায়।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রাণী পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রকল্প

প্রাণী পালন করে স্বনির্ভর হতে গেলে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি জানানোর যেটা প্রয়োজন তাহল প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ। এই অর্থের যোগান আসে সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক বা ঐ ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে এই ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অন্যতম। এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও রয়েছে।

এখন যে কোন ব্যাঙ্কে এই ধরণের প্রকল্পের জন্যে আর্থিক সহায়তা (ঋণ হিসাবে) চাইতে হলে প্রয়োজন নির্দিষ্ট প্রকল্পের, যা সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। অনেক সময় তা পেতে গেলে অনেক ঘোরাঘুরি ও সময় নষ্ট করতে হয়। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি তৈরি প্রকল্প নিম্নে দেওয়া হল। আশা করি এগুলি স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষে এগিয়ে আসা মানুষকে সাহায্য করবে

বাছুরসহ ২০টি সংকর গরু পালন প্রকল্প

(প্রতিটি গাভীর প্রতিদিন গড়ে ৮ লিটার দুগ্ধ ক্ষমতা সম্পন্ন)

প্রযুক্তিগত পরিমাপ

১) বাছুরসহ প্রথম বা দ্বিতীয় বিয়ানের সংকর জার্সি বা হোলষ্টিন গরু রাখতে হবে।

২) গড়ে প্রতিদিন দুধ দেবে - ৮ লিটার।

৩) বছরে দুধ দোহন করা হবে - ২০ দিন।

৪) ২টি বিয়ানের মধ্যবর্তী ৩৯০ দিনের মধ্যে শুষ্ক পর্যায় *(Dry period)* ১১০ দিন।

৫) খাবার সংস্থান।

ক) দুধ দেবার সময় ঃ

সুষম খাবার, গরু প্রতি -	২ কেজি
সবুজ ঘাস, গরু প্রতি -	৩০ কেজি
খড়, গরু প্রতি -	৩ কেজি

খ) শুষ্ক অবস্থায় ঃ

সুষম খাবার, গরু প্রতি -	১ কেজি
সবুজ ঘাস, গরু প্রতি -	১০ কেজি
খড়, গরু প্রতি -	৪ কেজি

আর্থিক পরিমাপ

১) সবুজ ঘাস (প্রতি কেজি)	২০ পয়সা
২) খড় (প্রতি কেজি)	১ টাকা
৩) দানাজাতীয় সুষম খাদ্য *(")*	৬ টাকা
৪) লিটার প্রতি দুধ বিক্রয় মূল্য	১০ টাকা
৫) প্রতিটি বস্তা বিক্রি	১০ টাকা
৬) ঔষধ, টীকা ও প্রজনন (গরু প্রতি বছরে)	২০০ টাকা
৭) গরু প্রতি গোবর বিক্রি বছরে	৩৫০ টাকা
৮) গরু প্রতি বীমা বছরে - গরুর দামের	৫ %
৯) প্রতিটি মদ্দা বাছুর বিক্রি	৮০০ টাকা
১০) প্রতিটি গাভীর মূল্য	১০,৪০০ টাকা

প্রকল্প ব্যয়

ক) স্থায়ী মূলধন ঃ

	টাকা
১) সংকর গাভী ক্রয়	২,০৮.০০০
২) ঘর তৈরী (গ্রামীণ অবস্থায়)	৫০,০০০
৩) পরিবহন খরচ	১০.০০০
৪) দড়ি, বালতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫,০০০
মোট	২,৭৩,০০০

খ) কার্যকারী মূলধন ঃ

১) সুষম খাবার (২ কেজি x ১০টি x ৩০দিন x ৬টাকা)	৩,৬০০
২) বীমা (৫%)	১০,৪০০
৩) খড় ক্রয় (৩ কেজি x ১০টি x ৩০দিন x ১টাকা)	৯০০
মোট	১৪,৯০০

মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ *(ক+খ)*=(২,৭৩,০০০+১৪,৯০০)=২,৮৭,৯০০ বা ২,৮৮,০০০ টাকা

গ) প্রকল্প রুপায়নে বার্ষিক ব্যয় ঃ

১) সুষম খাবার বাবদ	৮০,৪০০
ক) দুধ দেবার সময় (২ x ২৮০ x ২০ x ৬) - ৬৭,২০০	
খ) শুষ্ক অবস্থায় (১ x ১১০ x ২০ x ৬) - ১৩,২০০	
২) সবুজ ঘাস ক্রয় বাবদ	৩৮,০০০
ক) দুধ দেবার সময় (৩০ x ২৮০ x ২০ x ০.২০) - ৩৩,৬০০	
খ) শুষ্ক অবস্থায় (১০ x ১১০ x ২০ x ০.২০) - ৪,৪০০	
৩) খড় ক্রয় বাবদ	২৫,৬০০
ক) দুধ দেবার সময় (৩ x ২৮০ x ২০ x ১টাঃ) - ১৬,৮০০	
খ) শুষ্ক অবস্থায় (৪ x ১১০ x ২০ x ১টাঃ) - ৮,৮০০	
৪) ঔষধ, টীকা ও প্রজনন বাবদ ঃ (২০০ x ২০)	৪,০০০
৫) বীমা বাবদ	১০,৪০০
৬) বিবিধ (বাছুর প্রতিপালন সহ)	১০,০০০
মোট	১,৬৮,৪০০

ঘ) বার্ষিক আয় ঃ

১) দুধ বিক্রি বাবদ (৮লি x ২৮০ x ২০ x ১০)	৪,৪৮,০০০
২) বস্তা বিক্রি বাবদ (২৮০ x ১০)	২,৮০০
৩) গোবর সার বিক্রি বাবদ (৩৫০ x ২০)	৭,০০০
৪) মদ্দা বাছুর বিক্রি বাবদ (মৃত্যুহার-১০%. (৮০০ x ৯)	৭,২০০
মোট	৪,৬৫,০০০

ঙ) প্রকল্প থেকে বার্ষিক লাভঃ (৪,৬৫,০০০ - ১,৬৮,৪০০) =২,৯৬,৬০০

প্রতিমাসে লাভ ঃ (২,৯৬,৬০০/১২) = ২৪,৭১৭ বা ২৪,৭০০ টাকা)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

১) ১০ টি গরু নিয়ে প্রকল্প শুরুর ৬ মাস পরে দ্বিতীয় লটের ১০টি গরু ক্রয় করিতে হইবে - যাহাতে সারা বৎসর দুধের উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

২) প্রকল্প ব্যয় স্থান, কাল ও সময়ের হিসাবে পরিবর্তনশীল।

ছাগপালন (১০টি মাদী ও ১ টি মদ্দা)

প্রকল্প ব্যয়

প্রযুক্তিগত পরিমাপ

১) ব্রীড ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল প্রজাতি
২) মাদী ছাগল ঃ ১০-১১ মাসের ১০ কেঃ ওজনের
৩) মদ্দা ছাগল ঃ ১ বৎসরের ১৫ কেঃ ওজনের
৪) সাপ্লিমেন্টারি খাবার ঃ
ক) মদ্দা - ২০০ গ্রাঃ/প্রতিদিন
খ) মাদি - ১৫০ গ্রাঃ/প্রতিদিন
গ) বাচ্চা - ১০০ গ্রাঃ/প্রতিদিন
৫) গর্ভকালীন সময় ঃ ১৫০ দিন
৬) ২ বার গর্ভাবস্থার মধ্যবর্তী সময় - ৮ মাস
৭) মৃত্যুহার ঃ বাচ্চা - ১০%
বড় - ৫%

আর্থিক পরিমাপ

১) দানা জাতীয় সুষম খাবার ঃ টা. ৭.৫০ (প্রতি কেঃ)
২) বাচ্চা বিক্রি ঃ প্রতিটি টা. ৭৫০.০০
৩) সার বিক্রির অর্থ আনুষঙ্গিক খরচের জন্য রাখা থাকবে।
৪) মাদি ছাগল ঃ টা. ৯০০.০০
৫) মদ্দা ছাগল ঃ টা.১৩৮০.০০
৬) রাত্রিতে থাকার জায়গা ঃ টা. ১০০০.০০

ক) স্থায়ী মূলধন

১) ১০টি মাদি ছাগলের দাম (৯০০.০০ x ১০)	টা. ৯,০০০.০০
২) পাঁঠার দাম	টা. ৯,৩০০.০০
৩) রাত্রিযাপনের জায়গা	টা. ১,০০০.০০
মোট	টা. ১১,৩০০.০০০

খ) কার্যকরী মূলধন

১) সাপ্লিমেন্টারি খাবারের দাম ঃ টা. ৪,৮৬৪.০০ (টা.৭.৫০/কেঃ)

ক) পাঁঠার জন্য প্রতিদিন ২০০ গ্রাঃ করে ১২ সপ্তাহের খাবার - ১৭ কেঃ

খ) মাদী ছাগলের জন্য ১৫০ গ্রাঃ করে ১২ সপ্তাহের খাবার - ২৩১ কেঃ

গ) প্রতিদিন ১০০ গ্রাঃ করে ১৫ টি বাচ্চার ৮ মাসের খাবার - ৩৬০ কেঃ

মোট ৬০৮ কেঃ

গ) ঔষধ, টীকা ও বিবিধ খরচ	টা. ৭৪২.০০
মোট	টা. ৫,৬০৬.০০

মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ (ক+খ+গ) = টা. ১১,৩০০.০০
+ টা. ৫,৬০৬.০০
টা. ১৬,৯০০.০০

আয় ব্যয়ের হিসাব (২য় বর্ষে)

ক) ব্যয় ঃ

১) মাদী ছাগলের খাবার বাবদ	টা. ১,৩৪৪.০০
২) মদ্দা ছাগলের খাবার বাবদ	টা. ১৩৬.০০
৩) বাচ্চা ছাগলের খাবার বাবদ	টা. ৪,৩৭৬.০০
৪) ঔষধ, টীকা বাবদ ঃ	
(ক) বড় ছাগল	টা. ৪৬২.০০
(খ) ছোট ছাগল	টা. ৬৩০.০০
	মোট টা. ৬,৯৪৮.০০

খ) আয় ঃ

বাচ্চা বিক্রি বাবদ আয় হবে - টা. ২৭,০০০.০০

৫৪ টি বাচ্চা (মৃত্যু বাবদ) x টা. ৫০০.০০ প্রতি বাচ্চা

অথাৎ, বার্ষিক লাভ ঃ টা. ২৭,০০০.০০ - টা. ২০,০৫২.০০

টা. ৬,৯৪৮.০০

অতএব, মাসিক আয় টা. ১,৬৭১.০০

বিঃদ্রঃ — সাপ্লিমেন্টারী খাবার মাদী ছাগলকে গর্ভাবস্থায়, পাঁঠাকে প্রজননের সময় এবং বাচ্চাকে বড় করার জন্য দিতে হয়। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘাস, পাতা সরবরাহ করতে হবে।

শূকর পালন

	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ
I. স্থায়ী মূলধন		
১) ৩টি দেশী মাদী শূকর, ২১০০ টাকা প্রতিটি	৬৩০০	
২) ১টি বিদেশী (লার্জ হোয়াইট ইয়র্কশায়ার) মদ্দা	২৮০০	
৩) বাসস্থান (মোটামুটি)	৩০০০	

II. কার্যকরী মূলধন

১) সাপ্লিমেন্টারী খাবার

ক) প্রতি মাদীর জন্য প্রতি মাসে ৮ কেজি খাবার, ১২ মাসের মোট খাবার (প্রথম বর্ষ) -২৮৮কেজি ও দ্বিতীয় বর্ষে ৩ মাসের জন্য ৭২ কেজি, মোট ৩৬০ কেজি

খ) প্রতি মদ্দার জন্য প্রতি মাসে ১০ কেজি খাবার, ১২ মাসের জন্য (প্রথম বর্ষ)-১২ x ১০ x ১=১২০ কেজি এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৩ মাস -৩ x ১০ x ১ =৩০ কেজি, মোট ১৫০ কেজি

গ) প্রতি শূকর বাচ্চার (উইলার্স) প্রতি মাসে ৭ কেজি, সুতরাং ১০টি শূকর বাচ্চার ২ মাসের জন্য খাবার প্রয়োজন - ২ x ১০ x ১৭ কেজি =১৪০ কেজি (প্রথম বর্ষ) ও ১০ টা শূকর বাচ্চা ২ মাসের জন্য ২ x ৭ x ১০=১৪০ কেজি খাবার লাগবে (২য় বর্ষ) মোট ২৮০ কেজি।

ঘ) প্রতি ফ্যাটনার শূকরের জন্য প্রতি মাসে ১৫ কেজি। সুতরাং ৮৪ ফ্যাটেনার শূকরের জন্য ৪ মাস (প্রথম

	বর্ষ) ১৫ x ৮ x ৪=৪৮০ কেজি খাবার ও ২য় বর্ষে ১৫ x ৮ x ৩=৩৬০ কেজি খাবার লাগবে। মোট খাবার ৮৪০ কেজি।	৮২২৪	৪৮১৬
২)	রান্নার উদ্বৃত্ত, উদ্বৃত্ত, উদ্বৃত্ত শাক-সব্জী ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত ইত্যাদি (৩০% সাপ্লিমেন্টারী খাবার খরচা)	২৪৬৭	১৪৪৫
৩)	ঔষধ, টীকা ও অন্যান্য খরচা, ২০ টাকা প্রাপ্ত বয়স্ক শূকর প্রতি (১০টা. প্রতি শূকর বাচ্চা উইনার্স) ও ফ্যাটেনার প্রতি মাসে		
ক)	৪টি প্রাপ্ত বয়স্ক ১২ মাসে (প্রথম বর্ষ) ও ৩ মাসে (২য় বর্ষ)	৯৬০	২৪০
খ)	১০টা শূকর বাচ্চা (উইনার্স) ২ মাসের জন্য (১ম বর্ষ) ও ৩ মাস (২য় বর্ষ)	২০০	২০০
গ)	৮টা ফ্যাটেনার ৪ মাসের জন্য (১ম বর্ষ) ও ৩ মাস ২য় বর্ষ)	৩২০	২৪০
৪)	বীমা (মোট প্রাপ্ত বয়স্ক শূকরের খরচার ৪ শতাংশ)	৩৬৪	৩৬৪
		১২,৫৩৫	৭,৩০৫
	(I+II)	২৪,৮৩৫	৭,৩০৫
	(মোট)	৩১,৯৪০ বা ৩১,৯০০	

III. **আয় ও ব্যয় (২য় বর্ষে)** **দ্বিতীয় বর্ষ**

ব্যয় ঃ

১)	সাপ্লেমেন্টারী খাবারের খরচা ঃ		
ক)	মদ্দা শূকরের জন্য		৯৬০
খ)	মাদী শূকরের জন্য		২৩০৪
গ)	শূকর বাচ্চা (উইনার্স)		২৫৭৬
ঘ)	ফ্যাটেনারের জন্য		১২৪৮০
২)	রান্নাঘরের উদ্বৃত্ত শাক-সব্জী ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত যোগান		৫৪৯৬
৩)	ঔষধ, টীকা ইত্যাদি		
ক)	মদ্দা শূকরের জন্য	২৪০	
খ)	মাদী শূকরের জন্য	৭২০	
গ)	শূকর বাচ্চা (উইনার্স)	৪৬০	
ঘ)	ফ্যাটেনার	১০৪০	
	মোট	২৪৬০	
৪)	বীমা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য		৩৬৪
		মোট	২৬,৬৪০

IV. আয় ঃ

১) ফ্যাটেনার শূকরের বিক্রি বাবদ আয় ৩৮,৪০০

মোট লাভ =*(IV-III)* = (৩৮,৪০০-২৬,৬৪০) = ১১,৭৬০ অর্থাৎ প্রতি মাসে - ৯৮০ টাকা

(স্থান, কাল ও সময় নিরিখে প্রকল্পটির আয়-ব্যয়, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যোগ্য)

ডিপলিটার পদ্ধতিতে ১০০টি ব্রয়লার মুরগী পালন
(১৫ দিনের ব্যাচ)

A. স্থায়ী মূলধন ঃ

ক) গ্রামীণ পরিবেশে ঘর তৈরী (১০০টি পাখির ৫টি ব্যাচের জন্য ৫০০ বঃফুঃ *x* ৫০/- প্রতি বঃফুঃ)	টা. ২৫,০০০.০০
খ) যন্ত্রপাতি বাবদ খরচ (১০/- পাখি পিছু *x* ৫০০)	টা. ৫,০০০.০০
	টা. ৩০,০০০.০০

B. কার্যকরী মূলধন ঃ

ক) বাচ্চা (একদিনের) ক্রয় (১০০ পাখির ৪টি ব্যাচ + ৫% অতিরিক্ত = ৪২০টি টা. ১৪.০০/পাখি)	টা. ৫,৮৮০.০০
খ) খাবার খরচ (৪০০ পাখি *x* ৩কেঃ *x* ১০.৫০/-)	টা. ১২,৬০০.০০
গ) ঔষধ, টীকা বাবদ ব্যয় (পাখি পিছু ৪.০০/- *x* ৪০০)	টা. ১,৬০০.০০
ঘ) বীমা খরচ (পাখি পিছু ১/- হারে)	টা. ৪০০.০০
	টা. ২০,৪৮০.০০

প্রকল্প ব্যয়ঃ *A+B* = ৩০,০০০.০০ + টা. ২০,৪৮০ = টা. ৫০,৪৮০.০০

C. ১০০ টি পাখির লটের আয় ও ব্যয় ঃ

ক) ব্যয় ঃ

i) বাচ্চা ক্রয় (১০৫টি)	টা. ১৪৭০.০০
ii) খাবার (১০০ *x* ৩ *x* ১০.৫০/-)	টা. ৩১৫০.০০
iii) ঔষধ টীকা (৪/- *x* ১০০)	টা. ৪০০.০০
iv) বীমার খরচ	টা. ১০০.০০
	টা. ৫,১২০.০০

খ) আয় ঃ

i) পাখি বিক্রী (১০০ x ১.৫ কে. প্রতি পাখির ওজন ৬ সপ্তাহে x ৪৪/-প্রতি পাখির ওজন)	টা. ৬,৬০০.০০
ii) বস্তা বিক্রি (৪টি x ২০ টা. দরে)	টা. ৮০.০০
iii) বীমা হতে (আনুমানিক)	টা. ৫০.০০
	টা. ৬,৭৩০.০০

১০০টি পাখি হতে লাভ ঃ

টা. ৬,৭৩০.০০ - টা. ৫,১২০.০০ = টা. ১৬১০.০০ বা টা. ১৬০০.০০

অর্থাৎ, বছরে ২৩টি লট থেকে লাভ = টা. ১৬.০০ x ২৩ = ৩৬,৮০০.০০

অতএব, প্রতি মাসে আয় = টা. ৩০৬৭.০০ বা টা. ৩০৭০.০০

বি.দ্র. — প্রকল্পটি স্থান, কাল অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনযোগ্য।

স্বউপার্জন ও স্বনির্ভরতায় পোলট্রি সংক্রান্ত কয়েকটি আদর্শ প্রকল্প

অধ্যাপক রাহুল সিনহা (প্রাক্তন)
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষে প্রাণী পালনে (পোলট্রি চাষের ক্ষেত্রে) ব্রয়লার এবং জাপানিজ কোয়েলের অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে। আমাদের মূলধনের বড় অভাব। কাজেই বড় আকারে পোলট্রি করার কথা না ভেবে ঘরে সামান্য টাকার মুরগী বা কোয়েল পালন করলে তাতে লাভ অনেক। আজকাল আমরা ক্রমশঃই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। তাই সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ফ্যাট যুক্ত খাবার বা বেশী কোলেস্টোরল বেশী থাকে বলে আমরা মাংস ও ডিম খাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু জাপানী কোয়েল পাখি আমাদের মাংস ও ডিম খাওয়ার নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। কারণ শুধু কোয়েল-এর ডিমই নয়, এর মাংস ও কোলেস্টোরল-এর মাত্রা বাড়ায় না এবং খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। উপাদেয় কোয়েল মাংস প্রতিরক্ষাদায়ী ও পুষ্টিকর প্রোটিন সমৃদ্ধ। ঘরে বসে আপনার প্রয়োজন মত অল্প খরচায় যাতে আপনি কোয়েল পাখির মাংস এবং ডিম উৎপাদন করতে পারেন তারজন্যে কিছু তথ্য ও ৭৫টি বয়লার এবং ৫০টি কোয়েল পালনের একটি প্রকল্প খরচ ও তার আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হল।

কোয়েল পাখি পালনের কিছু তথ্য ঃ—

১) ১ বর্গফুট জায়গায় ৪টি কোয়েল রাখা যায়।
২) কোয়েল ৬ সপ্তাহ পর থেকে ডিম দেওয়া শুরু করে।
৩) ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত একটি কোয়েল ৬০০ গ্রাম খাবার খায়।
৪) ৬ সপ্তাহ পর থেকে একটি কোয়েল প্রতিদিন ২০-২৫ গ্রাম খাবার খায়।
৫) মাসে একটি কোয়েল কমপক্ষে ১৮-২০টি ডিম দেয়।
৬) ডিমের ওজন প্রতিটি ১০-১২ গ্রাম হয়।
৭) ডিমের খোলের কালার স্পটেড *(Spotted)*।
৮) এক সপ্তাহে একটি কোয়েলের দেহের ওজন ১৮০ গ্রাম থেকে ২০০ গ্রাম পর্য্যন্ত হয়।
৯) কোয়েল পূর্ণ বয়স্কতা অর্জনের জন্য ৯০-৯৫ শতাংশ বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে।
১০) একটি মুরগীর ডিমের নিউট্রিসন ভ্যালু সমান ৩টি কোয়েলের ডিম।
১১) সাধারণত ভাবে কোয়েল ডিম পাড়া শুরু করা থেকে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত ডিম নেওয়া লাভজনক হবে।

১২) ৪২-৪৫ দিন বয়সী কোয়েল মাংস হিসাবে ব্যবহার এর যোগ্যতা অর্জন করে।
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কোয়েল ও ব্রয়লার প্রতিপালনের জন্য নিম্নলিখিত সংস্থা খাঁচা, বাচ্চা ও খাবার সরবরাহ করে।

সন্তোষী মাতা সমিতি
গ্রাম ঃ- কৃষ্ণনগর, পোঃ- জঙ্গিপাড়া
জেলা - হুগলী, পঃ বঃ
ফোন - (০৩২১২) ৫৯৪৭৬

৭৫টি ব্রয়লার ও ৫০টি কোয়েল পালনের প্রকল্প খরচ ও তার আয় ব্যয়ের হিসাব ঃ-

(ক) ৭৫টি ব্রয়লার মুরগী পালনের প্রকল্প খরচ ঃ-

(১)	কেজিং পদ্ধতিতে ৭ ৫টি বাচ্চা ৩ সপ্তাহ কাল প্রতিপালনের জন্য ১৫ বর্গফুট জায়গা প্রতি বর্গফুট ১৪০.০০ হিসাবে মোট খরচ	২১০০.০০
(২)	ডিপলিটার-কাম-কেজিং পদ্ধতিতে ৭৫টি বড় মুরগী প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ৪৯ বর্গফুট জায়গা প্রতিবর্গফুট ১১২.২৫ হিসাবে খরচ	৫৫০০.০০
(৩)	প্রতিটি ১৪.৫০ হিসাবে ৭৫টি বাচ্চার খরচ	১০৮৭.৫০
(৪)	৭৫টি ব্রয়লারের ৪৫ দিন অবধি প্রতিপালন বাবদ প্রয়োজনীয় ২৬২.৫ কেজি খাবার প্রতি কেজি ১০.০০ হিসাবে খরচ	২৬২৫.০০
(৫)	৭৫টি ব্রয়লারের ঔষধবাবদ গড় খরচ	৮৭.৫০
	মোট খরচ	১১,৪০০.০০

(খ) ৫০টি কোয়েল পালনের প্রকল্প খরচ ঃ-

(১)	ডিপলিটার পদ্ধতিতে ৫০টি কোয়েল পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ১২.৫ বর্গফুট জায়গা প্রতিবর্গফুট ১৭৬.০০ হিসাবে খরচ	২২০০.০০
(২)	প্রতিটি ৪.০০ হিসাবে ৫০টি বাচ্চা কোয়েল এর মূল্য বাবদ	২০০.০০
(৩)	৫০টি কোয়েল ৪২ দিন অবধি প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় ৩০ কেজি খাবার প্রতি কেজি ১০টা. ৫০ প. হিসাবে খরচ	৩১৫.০০
৪)	৫০টি কোয়েলের জন্য গড় ঔষুধ বাবদ খরচ	৩৫.০০
	মোট খরচ	২৭৫০.০০

(গ) ৭৫টি ব্রয়লার এবং ৫০টি কোয়েল পালনের জন্য একটি প্যাকেজ প্রকল্পের মোট খরচ (ক+খ) ১৪,১৫০.০০

(ঘ) ব্রয়লার মাংস উৎপাদন এবং ব্যয় ঃ-

৭৫টি ব্রয়লার মুরগী থেকে ৫ শতাংশ মরতে পারে ধরে নিয়ে ৪২-৪৫ দিন পর্যন্ত ২৬২.৫ কেজি খাবার খেয়ে মোট দেহের ওজন দাড়াবে ১২৩.৫ কেজি। এর জন্য মোট খরচ হবে ৩৮০০.০০

(যা প্রকল্প খরচে কলমে দেখান আছে)

(ঙ) কোয়েল পাখির মাংস উৎপাদন এবং ব্যয় ঃ-

৫০টি কোয়েল পাখি থেকে ৫ শতাংশ মরতে পারে ধরে নিয়ে ৪২ দিন পর্যন্ত মোট ৩০ কেজি খাবার খেয়ে দেহের ওজন হবে, (২০০ গ্রাম করে প্রতি পাখির দেহের ওজন হিসাবে বিক্রয় যোগ্য মোট ৪৭টি পাখির ওজন) ৯.৪ কেজি। এর জন্য মোট খরচ হবে (প্রকল্পে খরচের কলমে দেখান আছে) ৫৫০.০০

মোট ১২৩.৫ কেজি ব্রয়লার মাংস এবং ৪৭টি (৯.৪ কেজি) কোয়েল এর উৎপাদন খরচ ৪৩৫০.০০

(চ) মাংস বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় ঃ-

(১) ব্রয়লার মাংস বিক্রয়ের মাধ্যমে চাষির আয় হবে, ৩৮.৫০ টাকা কেজি দরে মোট ১২৩. কেজি মাংস থেকে ৪৭৫৪.৭৫

(২) কোয়েলের মাংস বিক্রয়ের মাধ্যমে চাষির আয় হবে, (১৬.০০ টাকা প্রতি কোয়েল দরে মোট ৪৭টি কোয়েল থেকে ....) ৭৫২.০০

(৩) লিটার বিক্রি এবং খাবারের খালি বস্তা বিক্রি করে গড়ে আসবে ৩৯.২০

মোট ৭৫টি ব্রয়লার এবং ৫০টি কোয়েল চাষ থেকে প্রতি ৪৫ দিন অন্তর অন্তর আয় হবে ৫৫৪৬.০০

(ছ) প্রতি ৪৫ দিন অন্তর অন্তর ৭৫টি ব্রয়লার এবং ৫০টি কোয়েল পালন প্রকল্পের মাধ্যমে লাভ হবে ১১৩৮.০০

(১) মোট মাংস উৎপাদন খরচ ৪৩৫০.০০

(২) ব্যাঙ্ক সুদ দেওয়ার জন্য খরচ হবে ৫৮.০০

(৩৭৫০.০০ টাকার উপরে বাৎসরিক ১২.৫ শতাংশ হারে মোট ৪৫ দিনের জন্য)

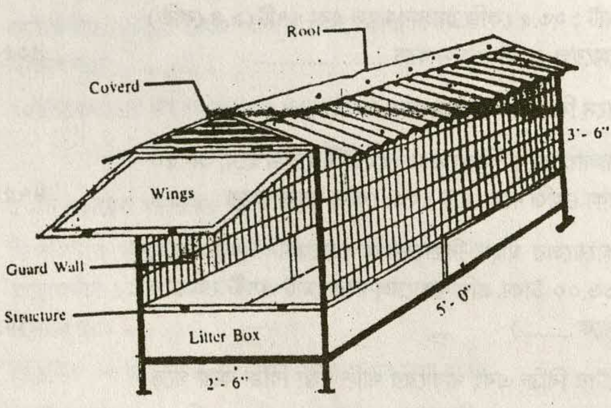
মোট খরচ ৪৪০৮.৫০

(৩) মোট মাংস বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় ৫৫৪৬.০০

মোট লাভ ১১৩৮.৫০

(জ) গ্রুপের ৩ জন সদস্যের পরিচর্য্যার মাধ্যমে একটি প্যাকেজ প্রকল্প গড়ে তুলতে পারলে প্রত্যেক সদস্যের প্রতি মাসে গড়ে লাভ হবে .... ২৫২.৪৯ টাকা

বহনযোগ্য ধাতু নির্মিত স্বল্পমূল্যের কোয়েলের খাঁচা



লাভের হাঁস খাঁকী ক্যাম্পবেল

ডি. এন্ সামন্ত

আর.সি.সি.টাস্ক ফোর্স কোঅর্ডিনেটর, দমদম রোটারি ক্লাব

খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁস ৪ মাস বয়স থেকে ডিম দিতে শুরু করে। বছরে আনুমানিক ৩০০টি ডিম দেয়। তিন বছর পর্য্যন্ত লাভজনক ভাবে ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৬৫ থেকে ৭৫ গ্রাম। ৮০ গ্রাম পর্য্যন্তও হতে পারে। রোগ ও লোকসানের ঝুঁকি কম। কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াতে ব্যাপক ভাবে খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁস পালনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

কিভাবে হাঁস পালন শুরু করবেন ঃ

খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁস তাড়াতাড়ি ডিম দেয় ও বেশী ডিম দেয়। লাভজনকভাবে এই হাঁস পালন করতে হবে খাবার, বাসস্থান, পরিচর্য্যা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। পারিবারিক উদ্যোগ হিসাবে প্রথমে ১০/১২টি একদিনের মাদী বাচ্চা হাঁস নিয়ে শুরু করাই ভাল। ৮/১০ মাস বাদে অভিজ্ঞতা বাড়লে, সামর্থ ও সুবিধা অনুযায়ী হাঁসের সংখ্যা বাড়ান। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হলে ৫০-১০০টি মাদী হাঁস নিয়ে শুরু করাই ভাল।

কোথায় হাঁস পালন করতে পারবেন ঃ

পুকুর, ডোবা ও জলা জায়গায় খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁস পালন সবচেয়ে লাভজনক। এতে কেনা খাবারের পরিমাণ কমানো যাবে এবং ডিম তৈরীর খরচ কম হবে। সেই সঙ্গে মাছের উৎপাদনও বাড়বে। পুকুর বা ডোবা না থাকলে পাকা নালা তৈরী করে অথবা পোড়া মাটির গামলা বসিয়ে, তাতে জল দিয়ে ভালোভাবে খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করতে পারেন।

কোথা থেকে বাচ্চা পাবেন ঃ

একদিনের খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁসের বাচ্চার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

ডাইরেক্টর, সেন্ট্রাল ডাক ব্রীডিং ফার্ম
হিসার ঘাটা ৫৬০০৮৮
বাঙ্গালোর নর্থ
কর্নাটক

Director
Central Duck Breeding Farm
Hessarghata 560088
Bangalore North, Karnatak

খাওয়ার জন্যে ডিম বিক্রী করতে হলে শুধু মাদী বাচ্চা আনুন কারণ এগুলো সব খাওয়া ডিম হবে। বাচ্চা তৈরী করার জন্যে ডিম পেতে হলে প্রতি ৫ টি মাদী হাঁসের সঙ্গে একটি করে পুরুষ হাঁস রাখতে হবে।

বর্তমানে হিসারঘাটায় এই প্রজাতির একদিন বয়সের একটি মাদী হাঁসের বাচ্চার দাম ৪ (চার) টাকা এবং একটি পুরুষ বাচ্চার দাম ০.৫০ পয়সা। দমদম পর্য্যন্ত প্যাকিং ও অন্যান্য খরচ নিয়ে প্রতিটি হাঁসের জন্যে বিমান মাশুল পড়বে আরও প্রায় ২ (দুই) টাকা। হিসারঘাটা থেকে সাধারণতঃ একসঙ্গে ৬০টির কম বাচ্চা সরবরাহ করা যায় না। আলাদা করে এক এক জনের জন্যে অল্প কয়েকটি বাচ্চার দরকার হ'লে, কয়েকজন মিলে এক সঙ্গে বেশী বাচ্চা আনানো সুবিধাজনক। হিসারঘাটায় শুধু মাদী বাচ্চাও পাবেন।

বাচ্চা হাঁসের জন্যে গোবরডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর এবং রাণাঘাটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাঁস পালন খামারেও যোগাযোগ করতে পারেন।

হাঁসের ঘর কিভাবে তৈরী করবেন ঃ

রাত্রিবেলা হাঁস ঘরে রাখুন। খামারবাড়ীর একটি সুবিধাজনক অংশ আলাদা করে, হাঁস রাখতে পারলে ভাল। নাহলে কাছাকাছি, স্থানীয়ভাবে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে ঘর তৈরী করুন। প্রতিটি হাঁসের জন্যে গড় ২১/২ থেকে ৩ বর্গফুট জায়গা দরকার। কাঠ বা বাঁশের কাঠামোর ওপর খড়, টিন, টালি বা অ্যাসবেস্টাস দিয়ে একচালা বা দো-চালা ঘর তৈরী করা যেতে পারে। ঘরের মেঝে পাকা না হলে, মাটি থেকে এক হাত উঁচুতে কাঠের পাটাতন অথবা বাঁশের ফালি দিয়ে মেঝে তৈরী করুন। ঘরের মেঝে একদিকে ঢালু রাখুন, যাতে মাঝে মাঝে ভালোভাবে ধুয়ে দেওয়া যায়।

ঘরের দেওয়ালে নিচের দিকে এক বা দেড়হাত উঁচু পর্যন্ত কাঠ বা টিন দিয়ে ঘিরে দিন। পাকা মেঝে হলে, ঐ অংশটা পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিন। এতে ইঁদুর, সাপ, বেজি এবং অন্যান্য জীব জন্তুর উপদ্রবও কম হবে। দেওয়ালের বাকী অংশ চালা পর্য্যন্ত আধ ইঞ্চি ফোকরযুক্ত তারের জাল বা চেরা বাঁশের বুনট দিয়ে ঘিরে দিন। এতে আলো বাতাস ঢুকবে। তবে বর্ষা বা শীতের সময় চট বা পলিথিন চাদর দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। হাঁসেদের ঘরে ওঠার জন্যে একটা কাঠ দিয়ে তৈরী একটা সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘরের মেঝেতে লিটার (যেমন- কুচোন খড়, ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি ২ (দুই) ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিন। লিটার মাঝে উল্টে পাল্টে দিন এবং রোদে শুকিয়ে নিন। পুরোনো হয়ে গেলে সার গাদায় ফেলে দিয়ে নুতন লিটার বিছিয়ে দিন।

বাচ্চা হাঁসের কিভাবে পরিচর্য্যা করবেন ঃ

বাচ্চা হাঁসের প্রথম চার সপ্তাহ বিশেষ যত্ন নেওয়া ও নজর দেওয়া দরকার। ঘরে ছাড়ার আগে প্রতিটি একদিনের বাচ্চাকে ইলেকট্রাল সলিউশন যেমন — স্টেরেকসিয়া, ইলেকট্রাল, ইলেকট্রাজ ইত্যাদি মেশানো জল খাইয়ে দিন। এতে বাচ্চা চাঙ্গা হবে। এরপর প্রতি লিটার জলে ৫ মিলিলিটার হিসাবে ভিটামিন, যেমন ভাইমেরাল অথবা রডিসল এবং আধগ্রাম হিসেবে হস্টাসাইক্লন বা অরিওমাইসিন মিশিয়ে প্রথম ৫/৭ দিন খাওয়ালেই যথেষ্ট। এসবই ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

ওষুধ মেশানো জল খাওয়ানোর এক ঘন্টা পর চওড়া থালায় অল্প জল মিশিয়ে ভেজা খাবার খেতে দিন। এই সঙ্গে আলাদা পাত্রে খাওয়ার জল দিন।

চার সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ঠাণ্ডার সময় ঘরের ঠিক মাঝখানে ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ অথবা হারিকেন জ্বালিয়ে ঘরে তাপ দেওয়া দরকার। হারিকেন থেকে ঘরে যাতে কোনমতেই গ্যাস না জমে তার দিকে নজর রাখুন। না হলে সব বাচ্চা মরে যেতে পারে। বাচ্চার সংখ্যা বেশী হলে আলোর সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। তবে গরমের সময় এক বা দুসপ্তাহ তাপ দিলেই চলবে।

দিনের বেলায় বাচ্চাগুলোকে রোদ এবং ছায়া পাওয়া যায় এমন জায়গায় লিটার পেতে দুহাত উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখুন। বেড়ার ওপর একটি জাল বিছিয়ে ঢাকা দিতে হবে, যাতে কাক, চিল, বিড়াল ইত্যাদি বাচ্চা হাঁসের কোন ক্ষতি না করতে পারে। এই জায়গাতেও সমান দূরত্বে খাবার এবং জলের পাত্র সাজিয়ে দিন। সেই সঙ্গে খাবার ও জলের পাত্র বাড়ান। চার সপ্তাহ বয়স না হওয়া পর্যন্ত হাঁস জলে ছাড়বেন না। তবে খুব গরম পড়লে ২/৩ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চাকে অল্পজলে স্নান করিয়ে দিন।

প্রতিটি হাঁসের দিনের বেলা চরবার জন্য অন্তত ১০ বর্গফুট হিসাবে ঘেরা দেওয়া

খোলা জায়গার ব্যবস্থা করুন। এই জায়গা যাতে ভালোভাবে রোদ পায় এবং বেশী ছায়ার জন্য বাঁশ বা খড় দিয়ে ওপরে চালা করে দিতে পারেন। খাওয়ার জল এবং খাবার সমেত পাত্র এই চালার নিচে রাখুন। পুকুর, ডোবা অথবা জলা থাকলে চরবার জায়গা কম হলেও চলবে। পুকুর, ডোবা বড় হলে, খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁসের জন্য জলের ওপর কিছুটা জায়গা ঘিরে দিন। জলে বেশী সাঁতার কাটলে ডিমের পরিধি কমে যেতে পারে।

স্নানের জলের ব্যবস্থা রাখুন ঃ

পুকুর, ডোবা বা জলা জায়গা না থাকলে হাঁসের চরবার জায়গায় জল ধরে এমন পাকা নালা করে দিন। একশতটি হাঁসের জন্য ১০ ফুট লম্বা, ১ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮ ইঞ্চি গভীর নালাই যথেষ্ট। নালার জল ময়লা হয়ে গেলে, জল বের করে দিয়ে পরিস্কার করার ব্যবস্থা রাখুন। পাকা নালা করা সম্ভব না হলে, হাঁসের সংখ্যা অনুযায়ী পোড়া মাটির গামলা মাটিতে বসিয়ে তাতে জল ভর্ত্তি করে দিন। প্রতি পাঁচটি হাঁসের জন্য একটি বড় গামলা হলে ভালো হয়।

পাকা নালা এমন ভাবে তৈরী করুন অথবা পোড়া মাটির গামলা এমনভাবে বসান যাতে এগুলির ওপরের অংশ মাটির দুই তিন ইঞ্চি নিচে থাকে। এগুলির চারধার খোয়া, ইটের টুকরো এবং বালি দিয়ে পিটিয়ে অথবা ইট বসিয়ে বা পাকা করে এমনভাবে ঢালু করে দিন যাতে চারধারে জল জমে কাদা না হয়ে যায়। নালা বা মাটির গামলা দিনে দুবার করে জল দিয়ে ধুয়ে, পরিস্কার জল ভরে দিন। খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁসের পক্ষে মাঝে মাঝে ঘাড় এবং মাথা জলে ডোবানো খুব দরকার। তা না হলে, হাঁস অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ার জল দিন ঃ

হাঁসের খাওয়ার জন্যে সব সময় পরিস্কার জলের ব্যবস্থা করুন। প্রতিবার খাবার দেওয়ার সময় অবশ্যই খাওয়ার জল দিন। অন্ততঃ পাঁচ ছয় ইঞ্চি গভীর কানাওয়ালা থালায় জল দিন। জলের পাত্র দিনে তিন থেকে চার বার ধুয়ে পরিস্কার করে ফেলুন।

খাবার কিভাবে তৈরী করবেন ঃ

হাঁসের জন্যে টাটকা খাবার, যতটা সম্ভব নিজের চাষের অথবা স্থানীয়ভাবে যা টাটকা

পাওয়া যায় তা খাওয়ান। পুরোন, ছাতাধরা খাবার হাঁসকে কখনও খাওয়াবেন না। ৭ দিনের বেশী খাবার একসাথে মেশাবেন না। খাবার শুকনো জায়গায় রাখতে হবে। বিভিন্ন উপাদানগুলি ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিন। কিন্তু ভিটামিন ও ওষুধ মেশাবার পর খাবার রোদে দেবেন না।

১০ কিলো খাবার তৈরী করার জন্যে হাঁসের বয়স অনুযায়ী কোন জিনিস কতটা মেশাবেন, তার পরিমাণ নীচে দেওয়া হল ঃ

খাদ্যের উপাদান	হাঁসের বয়স		
	৩ সপ্তাহ পর্যন্ত	৪ থেকে ১২ সপ্তাহ	৩ মাস বয়সের পর
১। গমভাঙ্গা	৩.৭৫০ কিলো	৪ কিলো	৩.৫০০ কিলো
২। চালের খুদ/হলুদ ভুট্টা ভাঙ্গা	২.০০০ কিলো	২ কিলো	১.৯০০ কিলো
৩। তেলছাড়া চালের কুঁড়ো	০.৫০০ কিলো	১ কিলো	১.৫০০ কিলো
৪। তেলছাড়া সয়াবীন খইল	২.৫০০ কিলো	১.৯৫০ কিলো	১.৭৫০ কিলো
৫। শুঁটকি মাছ	১.০০০ কিলো	০.৩৫০ কিলো	০.৮০০ কিলো
৬। মিনারেল মিক্শ্চার	—	০.২৫০ কিলো	০.২৫০ কিলো
৭। ঝিনুক ভাঙ্গা	—	—	০.৩০০ কিলো

প্রতি ১০ কেজি খাবারে সঙ্গে ৩১/২ গ্রাম রোভিমিক্স বা ভিটাব্লেণ্ড, আধগ্রাম নিয়াসিন এবং ৩১/২ গ্রাম কোলিন ক্লোরাইড্ মেশান। এ সবই ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। তিন মাস বয়স হয়ে যাওয়ার পর খাবারের ঝিনুকভাঙ্গা থাকলেও একটি আলাদা পাত্রে ঝিনুকভাঙ্গা দিন। অতিরিক্ত ঝিনুকভাঙ্গা খেয়ে ডিমের খোল শক্ত হবে।

কতটা খাদ্য কিভাবে দেবেন ঃ

হাঁসের বয়স অনুযায়ী, প্রথম সপ্তাহে দৈনিক ২০ গ্রাম, দ্বিতীয় সপ্তাহে দৈনিক ৪০ গ্রাম, তৃতীয় সপ্তাহে দৈনিক ৬০ গ্রাম এবং চতুর্থ সপ্তাহে দৈনিক ৯০ গ্রাম করে উক্ত সুষম খাদ্য খাওয়ান।

২ মাস থেকে ৫ মাস বয়স পর্য্যন্ত প্রতিটি হাঁসকে ১০০ থেকে ১১০ গ্রাম এবং হাঁসের বাড় অনুযায়ী ৬ মাস বয়স থেকে দৈনিক ১২০ গ্রাম থেকে ১৭০ গ্রাম খাদ্য দিন। চার সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দিনে ৪ বার, আট সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দিনে ৩ বার এবং এরপর দিনে দুবার — সকালে এবং বিকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাবার দিন। খাবার জল দিয়ে মেখে খেতে দিতে হবে। খাবার পাত্রের সংখ্যা যথেষ্ট না হলে খাওয়ার সময় ভীড় হয়ে যাবে এবং দুর্বল বাচ্চারা খেতে না পেয়ে মারা যাবে।

হাঁস কম খেলে অথবা বেশী খেয়ে চর্বি জমে গেলে ডিম কম দেবে। তাই পরিমাণমত সুষম খাবার খাওয়ান। গেঁড়ি, গুগলি থেতো করে এবং কুচো মাছ সস্তায় পাওয়া গেলে হাঁসকে খাওয়ালে প্রোটিনের প্রয়োজন মিটবে এবং শুঁটকি মাছ কম দিলেও চলবে। রোজ কিছুটা সবুজ খাদ্য অতিঅবশ্যই খাওয়ান।

রোগ দমনে সময়মত ব্যবস্থা নিন ঃ

এত অল্প পরিসরে হাঁসের যে সমস্ত রোগব্যাধি হয় তার বিশদ বিবরণ এবং প্রতিকারের ব্যাপার আলোচনা সম্ভব নয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে অতি অবশ্যই পালন করতে হবে। মারাত্মক রোগ, যেমন প্লেগ, কলেরা, পাতলা পায়খানা অথবা খাবারের দরুণ বিষক্রিয়া হলে অযথা সময় নষ্ট না করে কোন অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসকের সাহায্য নিন। সব সময় টাটকা খাবার খাওয়ান। স্যাঁতসেতে জায়গায় না রেখে খাবার শুকনো জায়গায় রাখুন।

Profitable Camble Duck Farming

Rtn. D. N. Samanta
R.C. C. Task Force Co-ordinator, Dum Dum

হাঁস পালনের কয়েকটি কথা

ডঃ মলয় কুমার চ্যাটার্জ্জী
পশু চিকিৎসক

আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে প্রাণীসম্পদের একটি বিশেষ স্থান আছে। ক্রমে ক্রমে প্রাণী সম্পদের গুরুত্বও আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। তাই প্রাণী সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন। প্রধানতঃ গৃহপালিত প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

মুরগী পালনের মত হাঁস পালনেও কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ মুরগী চাষ উন্নয়নের শাখা হিসাবে হাঁস রক্ষণও একটি জরুরী ব্যাপার। ফার্ম করার ইচ্ছে থাকলে মুরগীর বদলে হাঁস পালনও করা যেতে পারে। দেশী বিদেশী মিলিয়ে হরেক রকমের জাত থাকলেও এখানে বিশেষ কয়েকটি জাত ও তাদের বিষয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। রাণার, খাকি ক্যামবেল পাতি হাঁসের জনপ্রিয়তা অনেক বেশী। সারা বছরে গড়ে প্রায় ২০০টির কাছাকাছি ডিম পাড়ে। যদি খাকি ক্যামবেলের দেহ, পাখা, পিঠ ও বুকের দিক লক্ষ্য করে দেখি তাহলে দেখতে পাব মদ্দা হাঁসের ক্ষেত্রে সারা দেহের রংটি হবে খাকি। কেবল পেছনের নীচের দিকে রংটা তামাটে অথবা বাদামী। গায়ের রং একই। মাদী হাঁসের ক্ষেত্রে দেহের রং গাঢ় হবে।

হাঁসের থাকার ঘর বা বাসা ব্যবস্থা করাও বিশেষ জরুরী। খোলামেলা আলো, বাতাস এবং মজবুত ঘর দরকার। রাতভর হাঁস যে মলত্যাগ করে, মাটির মেঝে হলে সেটা পরিষ্কার করার খুবই অসুবিধা হয়। সিমেন্ট-এর মেঝে সেদিক থেকে আদর্শ। একটি পুর্ণবয়স্ক হাঁসের জন্য গড়ে ৪ বর্গফুটের জায়গার প্রয়োজন। ডিমপাড়ার জন্য ওদের ঘরের সঙ্গে খানিকটা জায়গা থাকলে ভাল হয় এবং সেই জায়গা বেড়া বা লোহার তারের জাল দিয়ে ঘেরা রাখা দরকার। দেড় ফুট থেকে দু ফুট উঁচু করলেই যথেষ্ট। বালি মেশানো মাটি হাঁসের পছন্দ।

গেঁড়ি, গুগলি ও শামুক হাঁসেদের প্রিয় খাদ্য। একটি পুর্ণবয়স্ক হাঁসের মোট ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম খাবারের প্রয়োজন। ভুষি, গেঁড়ি, শামুক সেদ্ধ, কুঁড়ো প্রভৃতি ছাড়াও মাছ ভাত, ধান, চাল সবই প্রায় ওদের খাদ্য হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি খাবারের সঙ্গে শতকরা ১/২ ভাগ খাবার লবন মিশিয়ে দিলে ওরা বেশ তৃপ্তি সহকারে খায়। যারা দু-চারটি হাঁস পালন করেন তাদের হাঁস জল থেকে যেটুকু পরিমাণ খাদ্য পায় তার সঙ্গে ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো খেতে দিলে আর কোন খাদ্য আলাদা ভাবে দিতে হয় না। রোগ প্রতিরোধ এর ক্ষেত্রে মুরগীদের নানা ধরনের টীকা দেওয়া হয়। কিন্তু হাঁসের ক্ষেত্রে সেরকম টীকার প্রয়োজন নাই, ওদের রোগ প্রতিরোধের সহজ উপায় হল খাদ্য, দ্রব্য ও পাণীয় জলের দিলে লক্ষ্য রাখা, হাঁস জলে থাকে বলে ভিজে আবহাওয়ার কোন মারাত্মক

ব্যাধি ওদের সহজে কাবু করতে পারেনা।

রোগ ঃ ক্ষয়রোগ — ভীষণ সংক্রামক রোগ, ক্ষয়রোগে হাঁস নরম খাবার খেতে চায় না। শক্ত ও কঠিন খাবার খেতে ভালবাসে। হাঁস দুর্বল ও রোগা হয়ে যায়। এই রোগের কোন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

যকৃতের রোগ — খাবার সহজে হজম হয় না এরকম খাবার খেলে এই ধরণের রোগ হয়। এতে হাঁসের মলের রং পাল্টে যায় এবং কালচে হয়ে যায়। কোন কিছু হজম করতে পারে না। দুর্বল হয়ে যায়। কিছুদিন রোগ ভোগ করার পর হাঁস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে। মাদী হাঁস ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয় ও মারা যায়।

প্রথম সাবধানতা হিসাবে হাঁসকে চরতে না দিলে হালকা খাবার খেতে দেওয়া দরকার। ধান চালের বদলে ভাত ও গেঁড়ি, গুগলি ভেঙে দিতে পারা যায়। শাকসবজি ও আনাজপাতার খোসা খেতে দিতে পারা যায়।

ওষুধ ঃ লিভ ৫২ রোজ ২ বার করে ৫/৬ ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়।

অজীর্ণ — এটিও যকৃতের রোগ। পাতলা পায়খানা ও কালচে রং। ক্রমশঃ হাঁস দুর্বল হয়ে পড়ে।

ওষুধ ঃ টেরামাইসিন ট্যাবলেট দিতে হয়। চায়ের চামচের এক চামচ এপসাম লবণ এককাপ জলে গুলে ৩/৪ বার সারাদিনে দিতে হবে।

উদরাময় — বারবার মলত্যাগ। কিছু খায়না ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

ওষুধ ঃ সালফা গুয়ানিডিন ট্যাবলেট বা গ্লোরামস লবণ দেওয়া হয়।

ক্র্যাম্প — হাঁটতে কষ্ট হয়। চলাফেরায় উৎসাহ কমে যায়। এক জায়গায় বসে ঝিমোতে থাকে। গরম সেঁক দেওয়া, আলাদা ঘরে রাখতে হয়।

ওষুধ ঃ সারা গা গরম জলে ধুয়ে তারপর তার্পিন তেল মালিশ করতে হবে। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ট্যাবলেট জলে মিশিয়ে দিতে হবে বা নিউরোবিয়ন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে দিতে হবে।

হাঁস পালনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এক এক সময়ে মুরগীর খামারে যেভাবে মড়ক লাগে এবং তার ফলে খামার শূণ্য হয়ে যায়, হাঁসেদের ক্ষেত্রে সেরকম দেখা যায় না অর্থাৎ মড়ক জাতীয় রোগ হাঁসেদের হয় না বললেই চলে। তাই হাঁস পালন করার সুবিধা আছে বিশেষ করে। তাছাড়া হাঁস পালনের ঝামেলা অনেক কম এবং হাতে কলমে মুরগী পালনের মতন অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলে।

Some aspects of Duck Culture related to diseases and Control

Dr. Malay Kumar Chatterjee
Veterenary Practioner

গবাদি পশুদের কয়েকটি রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এর উপায়

ড: মলয় কুমার চ্যাটার্জী
পশু চিকিৎসক

বর্তমানে চাকরির বাজারের পরিস্থিতিতে ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের দেশের বেকার যুবকদের সামনে কিছু স্ব-নিযুক্তির পথ প্রদর্শন ও উপযুক্তভাবে সাহায্য করার জন্য রোটারী ডিষ্ট্রিক্ট ঃ ৩২৯০ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে একটি হল এগ্রিরিসোর্স কমিটি। এই কমিটি গত কয়েক মাসে নানান গ্রামে গিয়ে ট্রেনিং কোর্স করেছে যা পশুপালনকারীদের প্রভূত উপকারে এসেছে। সাধারণতঃ পশুপালন ব্যবসার উদ্দেশ্যই করা হয়ে থাকে। গরু, মোষ, ছাগল, শুয়োর, ভেড়া প্রভৃতি পালন করার উদ্দেশ্যেই হল ব্যবসা করে লাভ করা তবে যে কোন পশুপালন ভিত্তিক ব্যবসার একটি সমস্যা হল পশুদের রোগ। পশুকে দেরীতে পশু-চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু সময় রোগ আরও জটিল হয়ে ওঠে। বহু সময়ে মৃত্যুও হতে পারে। ফলে পশুপালন ব্যবসা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পশুদের স্বাস্থরক্ষা ও চিকিৎসার সাধারণ বিধিগুলো না জানার জন্য বহু সময়ে পশুপালন ফার্মে মড়ক দেখা দিতে পারে। সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি পশু পালকের জানা থাকলে সুবিধা হয়। সেইজন্য গরু ও মোষদের রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে যতটা সম্ভব বিশদভাবে কয়েকটি প্রধান রোগের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। সর্বপ্রথমে যে সব রোগের জন্য দুগ্ধ উৎপাদনের ঘাটতি হয় সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ।

ক) ম্যাসটাইটিস (Mastitis)

এটি দুগ্ধ গ্রন্থির রোগ। এই রোগ হলে গরু বা মোষের থান বা পালান বা দুগ্ধ গ্রন্থি ফুলে যায়। বাঁটের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। দুধ বের হয় না ও পুঁজ বের হতে থাকে। গবাদি পশুর এটি একটি মারাত্মক রোগ। সাধারণতঃ দুধের বাঁটে কোনও ভাবে আঘাত লেগে ক্ষত হলে বা শীতকালে বাঁট কেটে গেলে সেখান দিয়ে জীবানু ভেতরে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি হয়। গাভী যখন দুধ দিতে শুরু করে তখন এই রোগ হলে নিশ্চিতভাবে এই রোগকে ম্যাসটাইটিস বলা যায়।

লক্ষন ঃ

পালান ফুলে যায়। ভীষন ব্যাথা থাকে। দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। যে দুধের বাঁটটি

আক্রান্ত হয় সেখান থেকে মোটা সুতোর আকারে দুধ বের হয়। দুধের রঙ লালচে হতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না করলে বাঁট বা পালান অকেজো হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

১) ক্লোরোমাইসেটিন ইনজেকসন *(Chloromycetin Inj.)* — গরুর ক্ষেত্রে ১০ মি.লি. দিনে ২ বার, মোষের ক্ষেত্রে ১৫ মি.লি. দিনে ২ বার বা

২) অ্যামপিলক্স *(Ampilox)* ১ গ্রাম — গরুর ক্ষেত্রে একটি শিশি (১ গ্রাম) দিনে ২ বার, মোষের ক্ষেত্রে একটি শিশি (২.৫ গ্রাম) দিনে ২ বার

৩) দিনে ২ বার দুধ বের করার পর দুধের পালানে প্রতি বাঁটে নজলের *(Nozzle)* সাহায্যে পেনডিসট্রিন *(Pendistrin)* মলম প্রয়োগ করতে হবে। ঔষধ প্রয়োগ করার পর পালান ১০ থেকে ১৫ মিনিট মালিশ করতে হবে। যাতে ঔষধ ভালভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই ঔষধের সঙ্গে যে কোন ভিটামিন যেমন ভাইবেলান *(Vibelan)* বা পিঙ্কোজেট *(Pinkojet)* ১০ মিলি করে রোজ একবার দিতে হবে।

খ) প্রসবের পর গর্ভফুল থেকে যাওয়া (Retained Placenta)

গাভী বা স্ত্রী মোষ বাছুর প্রসব করার পর গর্ভফুল *(Placenta)* স্বাভাবিক নিয়মে ছয় ঘন্টার মধ্যে জরায়ু থেকে খসে পড়ে যায়। কিন্তু এর বেশী দেরী হলে তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কারণ গর্ভফুল ভিতরে থাকলে দুধ উৎপাদন কমে যাবে। তাছাড়া গর্ভফুল পচে গেলে পশুর মৃত্যুও হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

এই জন্য জরায়ুকে সংকোচন করানো ভীষন দরকার, আর সেটা ঔষধের মাধ্যমে করানো যায়। কিছু ক্ষেত্রে আবার ঔষধের দ্বারা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে পশুচিকিৎসকের সাহায্যে জরায়ু ফুল বার করতে হয়। নিজেরা চেষ্টা না করে এমত অবস্থায় পশু চিকিৎসকের দ্বারা গর্ভফুল বের করাই উচিৎ।

১) পিটোসিন ৫ ইউনিট *(Pitocin Inj.)* মাত্রা — ৫০ থেকে ১০০ ইউনিট একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী বা মোষের জন্য। ফুল পড়ে গেল অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে - রোসিলক্স *(Rocillox)* বা অ্যাম্পিলক্স *(Ampillox)* এক গ্রাম দিনে ২ বার পাঁচ দিন।

২) জরায়ুর মধ্যে জীবানু নাশক ঔষধ দিতে হবে। ইউরিয়া বোলাস বা ইউরেন রোলাস চারটে একসঙ্গে।

খ) মিল্ক ফিভার (Milk Fever)

যে সব গাভী বা স্ত্রী মোষ প্রচুর পরিমানে দুধ দিয়ে থাকে তারাই দুধ জ্বরে আক্রান্ত হয়। এটা কোন জীবানু ঘটিত রোগ নয়। শরীরে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাঙ্গানীজ জাতীয় খনিজ পদার্থের অভাব ঘটলে এই রোগ দেখা যায়।

বিশেষ করে বাছুর প্রসব করার পর এই রোগে আক্রান্ত হয় বেশি। রোগের নামটি দুধজ্বর হলেও গাভী বা স্ত্রী মোষের দেহে সব সময় জ্বর থাকে না। তবে অন্যান্য উপসর্গ থাকে।

লক্ষণ ঃ

প্রসব করার দু-তিনদিন বাদে বা একসপ্তাহের মধ্যে দেখা যায়। শরীরে কোনও জ্বর থাকে না। তবে রোগের কঠিন *(Acute)* অবস্থায় দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। পশু হঠাৎ দুর্বল হয়ে যেতে পারে। উঠে দাঁড়াতে পারে না। খাদ্যে কোনও রকম আগ্রহ থাকে না। জাবর কাটা বন্ধ করে দেয়। মলের পরিমান কমে যায় ও প্রস্রাবও ঠিক মতন হয় না। গরু বা মোষ বিশেষ ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে। বাঁদিক চেপে মাথাটা ডানদিকে ঠেকিয়ে রাখে। অথবা মাথা বুকের দিকে ঘুরিয়ে রাখে। দেহ টলমল করে এবং তন্দ্রাভাব বা ঝিমুনিভাব থাকে।

চিকিৎসা ঃ

গাভী বা স্ত্রী মোষ-এর দুধজ্বরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যদি না নেওয়া হয় তবে পশু এই রোগে আক্রান্ত হলে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

১) ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকোনেট *(Calcium Boro-gluconate)* ইনজেকশন রোজ একবার করে চামড়ার নীচে ২০০ মিলি.-৩০০ মিলি. পরপর চারদিন দিতে হবে।

২) মাইফেক্স *(Mifex Inj.)* বাজারে পাওয়া যায়। এতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম কারবোহাইড্রেড থাকে। এটি দেহের শিরার *(Veins)* মধ্যে দেহের উত্তাপ অনুযায়ী গরম করে আস্তে আস্তে *(Slow Interveinous)* দিতে হবে। যাতে পশুর হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ না পড়ে।

প্রতিকারের ক্ষেত্রে প্রসব করার ১০ দিন আগে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি রোজ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। বাজারে মিল্ক মিন পাউডার *(Milk Min Powder)* এবং এ্যাগ্রিমিন পাউডার *(Agrimin Powder)* পাওয়া যায়। এর যে কোন একটা দিনে পাঁচ চামচ করে প্রসবের ৭ দিন আগে থেকে খাওয়াতে হবে।

ঘ) এঁসো রোগ (ঘুরুয়া রোগ) (Foot & Mouth Disease)

এটি একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। গোয়ালে বা ফার্মে একবার এই রোগের আক্রমণ ঘটলে সেই গোয়ালের সব পশুই এই রোগে আক্রান্ত হবেই। এই রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে এক ধরণের ভাইরাস। বর্ষার সময় এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়।

লক্ষণ ঃ

রোগের প্রথমদিকে গরু ও মোষের কাঁপুনিসহ জ্বর হয়। এরপর দুদিনের মধ্যে মুখের ভিতর, নাকের মধ্যে, পালানে এবং খুরের ঠিক উপরে চামড়ায় ছোট ছোট আকারে ফুসকুড়ি দেখা দেয়। খুরের ফাঁকেও এই ধরণের ফুসকুড়ি হয়ে থাকে। গরু বা মোষ খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেদেয়। হাঁটতে পারে না। এই রোগ হলে যদিও গরু বা মোষ, মারা যায় না তবে দুধ উৎপাদন ভীষণভাবে হ্রাস পায়।

চিকিৎসা ঃ

১) সালকোপ্রিম বোলাস *(Sulcoprim Bolus)* ঃ ১ টি করে বোলাস দিনে তিনবার করে খাওয়াতে হবে অথবা ভেসাডিন ইনজেকসান বা ব্যাকট্রিসল *(Bactrisol)* ইনজেকসন ১০ মিলি. দিনে ২ বার পিছনের পাছায় দিতে হবে।

২) ভিটামিন ইনজেকসান ভাইবেলান *(Vibelan)* বা পিঙ্কোজেট *(Pinkojet)* ১০ মিলি. দিনে ১ বার পাঁচ দিন।

৩) মুখে ঘা-এর জন্য পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ৬০ মিগ্রা জলেতে গুলে দ্রবণ তৈরী করে মুখে ভালভাবে লাগাতে হবে।

৪) পায়ে বা খুরে জেনসিয়ান ভায়োলট লোশন দিতে হবে।

প্রতিকার ঃ

রোগের আক্রমণ ঠেকাতে প্রতিষেধক টিকা সময়মত অবশ্যই দেওয়া উচিৎ। সময়মতো পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

ঙ) বাদলা রোগ (Black Quater)

এটি বাছুর-এর এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। গরুর বা মোষের বাছুর ছয়মাস থেকে ২ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। তবে বয়স্ক গরু বা মোষও আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ ঃ

আক্রান্ত গরু বা মোষ প্রথমেই খাওয়া বা জাবরকাটা বন্ধ করে দেয়। জ্বরও হয়। যে

সমস্ত অংশে বেশী মাংস থাকে সেখানে ফুলে উঠে এবং ফোলা জায়গায় বজবজ করে শব্দ হয়। পাছা, কাঁধ, পিঠ, কুঁচকি, গলার অংশ ফুলে যায়। মনে হয় ফোলা জায়গায় বাতাসে ভরা। ফোলা জায়গার চামড়া বেশ কালো দেখায়। কিছু ক্ষেত্রে ফোলা জায়গা টিপলে বসে যায়।

চিকিৎসা ঃ

১) টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকসন ১০ মিলি - ১৫ মিলি দিনে ২ বার

২) এভিল ইনজেকসন - ১০ মিলি দিনে ২ বার তিন থেকে চারদিন দিতে হবে।

৩) পিক্সোজেট ভিটামিন ইনজেকশন ১০ মিলি দিনে ১ বার পাঁচদিন দেওয়া উচিত।

প্রতিকার ঃ

কোন এলাকায় এই রোগ হলে গবাদি পশুদের মাঠে ছাড়া উচিৎ নয়। সরকারি পশুচিকিৎসা কেন্দ্রে এই রোগের টিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তাই অতি অবশ্যই পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

চ) গলা ফোলা রোগ (Haemargric Septicemia)

এই রোগটি ভীষন রকমের সংক্রামক রোগ। এক ধরণের জীবানুর আক্রমণে এই রোগ হয়। গোয়ালে একটি গরু বা মোষ, গলা ফোলা রোগে আক্রান্ত হলে বাকি সব পশুর মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। প্রাকবর্ষা এবং ভরা বর্ষার সময়ে এই রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

লক্ষণ ঃ

আক্রান্ত পশুর দেহের তাপমাত্রা হতে পারে। ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে এবং তারজন্য নিউমোনিয়া হয়। প্রবল শ্বাসকষ্ঠ হয়ে থাকে। পশু শ্বাসকষ্টের জন্য মুখ ফাঁক করে শ্বাস নিতে থাকে। জিভ বার করে দেয়। নাকের গর্ত থেকে সর্দি বের হতে থাকে। কখনও কাশতে থাকে। গলা ও চোয়ালের নীচের গ্রন্থিগুলো ফুলে উঠে। গলকম্বল ফুলে থলথলে দেখায়। বার বার পাতলা রক্ত যুক্ত মল বের হয়। জীবানু রক্তপ্রবাহের সঙ্গে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত বিষাক্ত হবার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হয়। ফলে নাক, মুখ ও মল মুত্র দ্বার থেকে রক্ত বের হতে থাকে। তবে সব দ্বার থেকে যে রক্ত বের হবে তা নয়। মল, মূত্র দিয়ে রক্ত বের হতে দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ

১) টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকসান ১০ মিলি. -১৫ মিলি. দিনে ২ বার, বা

২) ব্যাকট্রিসল ইনজেকসন ১০ মিলি.- দিনে ২ বার

৩) ক্রোমোস্টাট ইনজেকসন ১০ মিলি. দিনে ১-২ বার

৪) রিঙ্গার ল্যাকটেট ইনজেকসন - শিরায় দিতে হবে

তবে যত শীঘ্র সম্ভব পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

ছ) রিন্ডারপেষ্ট (Rinderpest) গুটি রোগ

এটি এক বিশেষ ধরণের মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগ কোন পশু একবার আক্রান্ত হলে তাকে বাঁচানো খুব শক্ত ব্যাপার। তাই এই রোগকে গোমারী বা গোমড়ক বলে। যে সব পশু এই রোগে আক্রান্ত হবার পর বেঁচে যায় তাদের সুস্থ হতে আরও কয়েকমাস সময় লেগে যায়।

একধরণের ভাইরাস দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি হয়। পশুর মল, দুধ এবং মুখের ভিতর ঘা বা ক্ষত থেকে ভাইরাস সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করে।

লক্ষণ ঃ

প্রথমেই জ্বর হয় দেহের তাপমাত্রা ১০৫-১০৬° পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। পশু মধ্যে মধ্যে কাঁপতে থাকে। মুখে, ঠোঁটে ছোট ছোট আকারে ফুসকুড়ি হয়। তারপর সেগুলো থেকে ঘা *(Sore)* হয়। পশু কিছু খেতে পারে না। পাতলা মল ত্যাগ করে। পশু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্গন্ধ যুক্ত মল ত্যাগ করে। পশু উঠে দাঁড়াতে পারে না।

চিকিৎসা ঃ

১) অ্যান্টি রিন্ডার পেষ্ট সিরাম *(Antirinder Pest Serum)* ১০০ মিলি মাত্রা - ৫০ মিলি চামড়ার নিচে ইনজেকসন দিতে হবে।

২) সালফাডিমিডিন ইনজেকসন বা ব্যাকট্রিসল ইনজেকসন ১০ মিলি বা ১৫ মিলি দিনে ২ বার দিতে হবে।

৩) পেসুলিন *(Pesulin)* বোলাস ২ টি করে দিনে ২ বার

৪) ভাইবেলান *(Vibelan)* ইনজেকসন ১০ মিলি দিনে ১ বার

৫) মুখে ঘা হলে বোরোগ্লিসারিন লোসন লাগাতে হবে।

৬) পাতলা মল হলে - জলের সঙ্গে অল্প পরিমানে লবন মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ

লক্ষণ প্রকাশ মাত্রই যদি ঠিক সময়ে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় বা পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যায় তবেই পশুটির জীবন রক্ষা করা সম্ভব। তাই গরু বা মোষের বয়স যখন চারমাস পূর্ণ হয় সেই সময় পশুচিকিৎসা কেন্দ্রে ওদের রিন্ডার পেষ্ট টিকা দিয়ে দেওয়া উচিৎ। যদি বাছুরের বয়স চার মাসের কম হয় তবে ০.৫ মিলি অথবা চারমাস পূর্ণ হলে ১ মিলি মাত্রায় গলার চামড়ার নীচে টিকা দিতে হবে। তবে টিকা দিয়ে দিলেই যে সারা জীবনের মত পশু রিন্ডার পেষ্ট অসুখের থেকে মুক্ত তা নয়। তিনবৎসর পর্যন্ত এই টিকা কার্য্যকর থাকে। তাই ঠিক সময়ে আবার টিকা দিতে হয়।

জ) নিউমোনিয়া (ফুসফুসের রোগ)

এটি সাধারণতঃ ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা লেগে বা কয়েকটা সংক্রামক রোগের জীবানু থেকে হয়ে থাকে। এই নিউমোনিয়া গরু বা মোষের বাছুরের বেশী হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ

এই রোগ হলে প্রথমেই জ্বর হয়। মাঝে মধ্যে শুকনো কাশি হয়। খাবার ইচ্ছে থাকে না। জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। জিভটাও বাইরে অনেক বেরিয়ে আসে। মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। গরু বা মোষ স্থির ভাবে এক জায়গায় শুয়ে থাকতে পারে না। কয়েক মিনিট শুয়ে আবার উঠে পড়ে। কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা বের হয় এবং তাতে রক্তও থাকতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

১) অ্যামপিসিলিন ইনজেকসন *(Ampicillin)* বা রোসিলক্স ইনজেকশন *(Racillox Inj.)* - ১ গ্রাম ঃ ১ শিশি (১ গ্রাম) দিনে তিনবার চার থেকে পাঁচ দিন দিতে হবে।

২) ডেক্সোনা *(Dexona)* বা এভিল *(Avil)* ইনজেকসন ঃ মাত্রা ৫ মিলি দিনে ২ বার

৩) ভাইবেলান *(Vibelan)* ইনজেকসন ১০ মিলি দিনে ১ বার

প্রতিরোধ ঃ

এ সব রোগের কোন প্রতিষেধক নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রাখা। এবং সময়মতন পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

ঝ) উদরাময় (পেট খারাপ)

দুষিত পানীয় জল, পচা খাবার খেলে এবং সহজে হজম হয় না এমন কোন খাবার খেলে পাকস্থলী বা অন্ত্র এসব হজম করতে না পারলে উদরাময় হয়। তবে বীজানুঘটিত উদরাময় ভীষন সংক্রামক। পশুর মল থেকে জীবানুগুলো সুস্থ পশুর শরীরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। সময় মতো ব্যবস্থা না নিলে আক্রান্ত পশু দুদিনের মধ্যে মারাও যায়।

লক্ষণ ঃ

বারে বারে পাতলা মল ত্যাগ। মলে আম বা শ্লেষ্মা থাকতে পারে। মলের রঙ কালচে সবুজও হতে পারে। মলে রক্তও থাকতে পারে। শরীরে লবন এবং জল শূন্যতা দেখা দিতে পারে। গরু বা মোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

চিকিৎসা ঃ

১) ব্যাকট্রিসল ইনজেকসন *(Bactrisol Inj.)* ঃ ১০ মিলি দিনে ২ বার করে চারদিন দিতে হবে।

২) পেসুলিন বোলাস *(Pesulin Bolus)* ঃ ২ টি করে বোলাস দিনে ২ বার থেকে তিন বার ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াতে হবে।

৩) সেলাইন ইনজেকসন বা রিনটোস *(Rintose Inj.)* শিরায় রোজ ১ বোতল দিতে হবে।

তবে সঠিক সময়ে পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। রোগের চিকিৎসার থেকেও রোগ প্রতিরোধ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই সময়মতো পশুচিকিৎসকের বা পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করে প্রতিষেধক টিকা ঠিক সময়ে পশুদের দেওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

পরিচ্ছন্ন দুধ উৎপাদন

ডঃ তাপস কর

বেনমিল্ক ট্রেনিং সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

পরিছন্ন দুধ উৎপাদনের ধারনা ঃ

যদিও দুধ প্রকৃতির একক সর্বোত্তম আহার তবুও এটা অস্বীকার করা যায় না যে দুধই বিবিধ রাসায়নিক ও অনু জৈবনিক বিপদ সৃষ্টির অন্যতম উৎস। প্রভুত খাদ্যগুণসম্পন্ন হওয়ার ফলে নিরাপদ ও পরিছন্ন দুধ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক বেশী। "পরিছন্ন দুধ" বলতে কিন্তু এটা বোঝায় না যে, দৃশ্যমান ময়লা বিহীন কোনও দুধই "পরিছন্ন দুধ"। সুস্থ, স্বাস্থ্যবতী পশু থেকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদিত, পরিচালিত (handled) ও পরিবাহিত যে দুধের মধ্যে মানুষের ক্ষতিসাধনকারী জীবানু থাকে না এবং অন্যান্য জীবানুর পরিমান অল্পই থাকে, যে দুধ কাঁচা অবস্থাতেও দীর্ঘস্থায়ী, সেই দুধই "পরিছন্ন দুধ"। অন্যকথায় বলতে গেলে বলতে হয়, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় উৎপাদিত দুধ স্বল্পস্থায়ী হয়। কারণ তার মধ্যে প্রচুর জীবানু অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারী জীবানু থাকলে (যা প্রায়শই থাকে) সেই জীবানু তাদের বৃদ্ধির অনুকুল পরিবেশে (ক্রান্তীয় জলবায়ু হওয়ার ফলে) অধিক মাত্রায় এমন বৃদ্ধি পেতে পারে যে, সেই দুধ পান করার ফলে মানুষ রোগগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে। শুধু তাই নয় এই জীবানুরা দুধের মধ্যে এমন বিষ (toxin) তৈরী করতে পারে যা ফোটালেও নষ্ট হয় না। সুতরাং মানুষের নিরাপত্তার দিক দিয়ে দেখতে গেলে পরিছন্ন দুধ উৎপাদনের অপরিসীম বাস্তব গুরুত্ব আছে। এছাড়া এই জীবানু দুধের অম্লতা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি করে, দুধের স্থায়িত্ব নষ্ট করে, অপ্রর্থিত কটু গন্ধের সৃষ্টি করে, দুধের প্রোটীনকে ভেঙে দিয়ে তিক্ত স্বাদের সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে দুধ উৎপাদনের প্রচলিত রীতি ঃ

সাধারণতঃ দুটি মূলনীতির উপরে ভিত্তি করে কাঁচা দুধের নিরাপদ উৎপাদন সম্ভব।

১) দুধ উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে ও দুধের উৎপাদনের পরে দুধের পরিচালন ও পরিবহনের সময়ে দুধে জীবানুর সংক্রমন প্রতিরোধ করা।

২) কাঁচা দুধের জীবানুর বৃদ্ধি ও ক্রিয়াকর্ম প্রতিহত করা।

উন্নত দেশগুলিতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাঁচা দুধ উৎপাদন করা হয় এবং দুধ উৎপাদনের সাথে সাথে ৪ ডিগ্রি সেঃ এর নীচে ঠান্ডা করে পরিষ্কার জীবানু মুক্ত পাত্রে ঢাকা অবস্থাতে ডেয়ারী প্লান্টে নিয়ে যাওয়া হয়, ফলে উপরোক্ত দুটি নীতি যথাযথভাবে পালিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে ৯০% দুধই গ্রামে উৎপাদিত হয়, সেখানে বিভিন্ন উৎস থেকে দুধে জীবানু সংক্রামিত হয় এবং বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশে দুধ উৎপাদনের প্রচলিত রীতিসমূহ

পরিছন্ন দুধ উৎপাদনের পরিপন্থী। নীচে এগুলি আলোচনা করা হল।

(ক) দুগ্ধবতী গাভী সম্পর্কিত প্রচলিত রীতি ঃ কি করা হয়ে থাকে?

১) অসুস্থ গাভী — যে সব গাভীর ঠুনকো রোগ হয়েছে, বাঁটে বা পালানে ঘা হয়েছে, সেক্ষেত্রে দুধে প্রচুর পরিমানে জীবানু ও কোষের অনুপ্রবেশ ঘটে। এছাড়াও গরুর টি.বি., ব্রুসেলেসিস প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকলে এগুলি প্রত্যক্ষভাবে দুধে সংক্রমন ঘটায়। কোনরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই সমস্ত দুধের সাথে এই দুধ মেশানোর ফলে সব দুধই সংক্রমিত হয়। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসুস্থ পশুকে আলাদাভাবে রাখার বন্দোবস্ত না করার ফলে সুস্থ গাভীতে সংক্রমন ঘটে।

২) গাভীর অপরিষ্কার পালন ও অপরিষ্কার শরীর — অনেকক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত জলের অভাবে গরুকে ঠিকমত স্নান করানো যায় না। গোময়, গোমুত্র এবং অন্যান্য রেচন পদার্থ গাভীর গায়ে, পালানে, লেজের চুলে লেগে থাকে, যেগুলি অনেকক্ষেত্রেই দোহনের সময়ে দুধের মধ্যে আসে এবং পরিছন্ন দুধ উৎপাদনে বাধা দেয়। অনেক সময় অপরিষ্কার জল বা অপরিষ্কার ডোবা পুকুরে গরুকে স্নান করানো হয় বা অনেক সময়ে দুধ দোহনের ঠিক আগেই পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে গরুর গা ঘষা হয়। কিন্তু এগুলি সবই পরিছন্ন দুধ উৎপাদনের পরিপন্থী।

(খ) দোহনকারী সম্পর্কিত প্রচলিত রীতি ঃ কি করা হয়ে থাকে?

১) হাঁচি, কাশি, সর্দি ও অন্যান্য সংক্রামক রোগাক্রান্ত অসুস্থ দোহনকারী থেকে রোগ সংক্রামিত হয় দুধের মধ্যে।

২) দোহনকারীর অপরিষ্কার হাত, কাপড় ইত্যাদি থেকে জীবানুর সংক্রামণ ঘটে।

৩) দোহনকারীর বিভিন্ন অপরিছন্ন অভ্যাস, যেমন - নখ না কাটা, যেখানে সেখানে থুতু ফেলা, পানের পিক ফেলা, বিড়ি খেতে খেতে দুধ দোওয়া প্রভৃতি দুধের পরিছন্নতা ব্যাহত করে।

(গ) দুধ দোহনের প্রচলিত রীতি ঃ কি করা হয়ে থাকে?

১) অসম্পূর্ণ দোহন — অনেক সময়েই তাড়াতাড়ি করে দুধ দোহনের সময়ে পরিপূর্ণ দোহন না করেই কিছুটা দুধ থাকা অবস্থাতেই দোহন বন্ধ করা হয়। এর ফলে বাঁটে দুধ থেকে যায়, যার মধ্যে জীবানু বৃদ্ধি হয়। পরবর্তী সময়ে যখন দুধ দোওয়া হয় তখন জীবানুর মোট পরিমান বাড়ে এবং এই অসম্পূর্ণ দোহন ঠুনকো প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

২) ভুল দোহন পদ্ধতি — সাধারণতঃ বাছুরে দুধ খাওয়ার পরে দুধ হাত দিয়ে দোহনের সময় চাষীরা কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন না। পুরো হাত দিয়ে দুয়ে আঙুলের গাঁট দিয়ে চেপে দুধ দুইলে বাঁটে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে দুধে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

৩) দুধ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত অপরিষ্কার পাত্রসমূহ — দুধ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাটির বা কাঁসার বা স্টীলের পাত্র ব্যবহার করা যায়। অনেক সময়ে সেই একই পাত্র গরুকে খাওয়াবার কাজে বা গোমূত্র, আবর্জনা প্রভৃতি ফেলার কাজেও ব্যবহৃত হয়। এরূপ নোংরা, অপরিছন্ন পাত্রের মধ্যে ময়লা জমে থাকায় জীবানুর ঘাঁটি হিসাবে কাজ করে এবং এরূপ পাত্রে দুধ সংগ্রহ নিরাপদ নয়। যদি কোন ক্ষেত্রে মেশিন দিয়েও দুধ দোহন করা হয়, সে ক্ষেত্রেও মেশিনের ঠিকমত পরিষ্কার ও জীবানু মুক্তকরণ না হলে সাংঘাতিক সংক্রমণ ঘটতে পারে।

(ঘ) পরিবেশ সংক্রান্ত প্রচলিত রীতি ঃ কি করা হয়ে থাকে?

১) অস্বাস্থ্যকর বসবাসের স্থান ও অস্বাস্থ্যকর খাবারদাবার — অনেকক্ষেত্রেই গাভীকে নিজেদের থাকার জায়গার সাথে বা অপরিসর আলোবাতাস বিহীন পরিবেশে বা বাড়ীর উঠানে রাখা হয়। মেঝে মাটির, জল নিষ্কাষণের বন্দোবস্ত বিহীন, জল, কাদা, গোমূত্র, গোময়, গোখাদ্যের উচ্ছিষ্টে পরিপূর্ণ থাকে। গরুকে অপরিচ্ছন্নভাবে খাওয়ানোর ফলে মেঝেতে ঘাস, খড়, গোখাদ্য প্রভৃতি টুকরোতে পরিপূর্ণ থাকে। অপরিষ্কার ও ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত খাদ্য খাওয়ানোর ফলে তা থেকে যেমন সরাসরি দুধে জীবানুর অনুপ্রবেশ ঘটে আবার ছত্রাক থেকে সৃষ্ট বিষের (toxin) শরীরে দুধ উৎপাদনের সময়ে দুধে অনুপ্রবেশ ঘটে। অপরিচ্ছন্ন, অপরিসর, আলোবাতাস বিহীন গোয়ালঘরের পরিবেশে মশা, মাছি প্রভৃতির উপদ্রব প্রভুত পরিমানে থাকে এবং এরা বিভিন্ন রোগ জীবানুর বাহক হিসেবে কাজ করে এবং দুধকে সংক্রমিত করে। সুতরাং অপরিচ্ছন্ন বাসস্থান ও খাবারদাবার দুধে জীবানুর পরিমান বাড়িয়ে তোলে।

২) অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ — গাভীর বাসস্থানের আশেপাশের নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ যেমন গোবরের গর্ত, জমা জল, অস্বাস্থ্যকর খোলা নিকাশি ব্যবস্থা, বাড়ীতে বাচ্চাদের যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস, যারা গরু পালন করেন তাদের অপরিষ্কার অভ্যাস, যথা যত্রতত্র থুতু ফেলা, পানের পিক ফেলা, নখ না কাটা, মলত্যাগের পরে সাবান দিয়ে হাত না ধোওয়া প্রভৃতি উৎপাদিত দুধের গুণগত মানের অবনতি ঘটাতে পারে।

পরিচ্ছন্ন দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ঃ-

ক) **দুগ্ধবতী গাভী সম্পর্কিত ঃ—** পরিচ্ছন্ন দুধ উৎপাদনের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জোর দেওয়া উচিত।

১) প্রাণীর স্বাস্থ্য — প্রাণীদের নির্দিষ্ট দিন অন্তর পালানের সংক্রামন বা অন্যান্য রোগ সংক্রমন হয়েছে কিনা তা পশু চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো দরকার। যদি কোন রোগ সংক্রিমত হয়, তাহলে সাথে সাথে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত এবং পশুটিকে আলাদা রাখা উচিত। রোগ যাতে অন্য প্রাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে তার দিকে লক্ষ দেওয়া উচিত। রোগাক্রান্ত প্রাণীর দুধ অন্য দুধের সাথে কখনও মেশানো উচিত নয়। ড্রাই পিরিয়ডে যখন একদম দুধ বন্ধ হয়ে যাবে তখন চারটি বাঁটে - ম্যাসটালোন, পেনডিসট্রিন, অরিওমাইসিন, নীওফারন যে কোনও একটির চারটি টিউব দিয়ে বাঁটের ছিদ্রপথ দিয়ে সমস্ত ঔষধটি পালানে টিপে টিপে ঢুকিয়ে দিতে হবে ও পালকটিকে মালিশ করে দিতে হবে। এভাবে রাখলে "সামার ম্যাসটাইটিস" থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

২) শরীরের ও পালানের পরিচ্ছন্নতা — দোহনের আগে গরুর শরীর ভালো করে পরিষ্কার করা দরকার। গরুর নোংরা ত্বক পরিষ্কার করা, ল্যাজের চুল ও অন্যান্য জায়গার বাড়তি লোম ছেঁটে ফেলা উচিত। গরুর পালান ও বাঁট পরিষ্কার করার সময় লক্ষ্য রাখার দরকার যে বাঁটের ক্ষুদ্র রন্ধ্র (Orifice), পালানের খাঁজে যেন কোনরূপ ক্ষত না হয়। পালানে বেশী পরিমান নোংরা থাকলে তা ভালো করে পরিষ্কার করে তারপরে অল্প গরম জল (৫৫° সেঃ এর নীচে) ২১/২ আউন্স ক্লোরিন/গ্যালন বা ২০০-৪০০ পি.পি.এম. কোয়ার্টারনারী অ্যামোনিয়াম কম্পাউণ্ড দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা উচিত। সাবান প্রথমে ধোয়ার সময় ব্যবহার করা যায়। সাধারণ সাবানের পরিষ্কার করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু জীবানুর বিরূদ্ধে কাজ করার বিশেষ ক্ষমতা নেই। এরপর Teat - Dip Solution ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহার করা কাপড় রোজ অবশ্যই গরম জলে ফুটিয়ে রাখা উচিত।

খ) **দোহনকারীর স্বাস্থ্য সচেতনতা ঃ—**

১) হাঁচি, কাশি প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগমুক্ত হবে।

২) দোহনের আগে সাবান দিয়ে হাত ভালো করে পরিষ্কার করা দরকার।

৩) নখ ঠিকমত কাঁটা দরকার।

৪) কাপড় ও চুল পরিষ্কার থাকবে।

গ) **দোহনপাত্র সম্পর্কিত সচেতনতা ঃ—**

১) পরিষ্কার, সমান, মসৃন উপরিভাগ যুক্ত খাঁজবিহীন পাত্র ব্যবহার করা উচিত দোহনের জন্য।

২) দোহনের পাত্র প্রথমে টিপল জাতীয় পরিষ্কারক দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ক্লোরিন জলে (২০০-৪০০ পি.পি.এম.) দিয়ে ধুয়ে তিন মিনিট রাখতে হবে জীবানু মুক্ত করার জন্য। এই কাজে আয়োডোফোরও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩) অল্প খোলা মুখ যুক্ত পাত্র দোহনের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

ঘ) **দোহনের সময়কার সতর্কতা ঃ—**

১) পরিপূর্ণ দোহন - কোন দুধই যেন পালানের মধ্যে না থাকে। শেষ ফোঁটা পর্যন্ত দুধ দুয়ে নিতে হবে।

২) প্রথমে দোওয়ার সময় সব বাঁট থেকেই কয়েক ধারা দুধ বাধ দিয়ে দেওয়া উচিত, কারন এর মধ্যেই সব থেকে বেশী জীবানু থাকে।

৩) ভিজে দোহন করা উচিত নয়। কারন এক্ষেত্রে বাঁট ও দোহনকারীর হাত ধুয়ে ফোঁটা ফোঁটা নোংরা জল দুধের মধ্যে পড়তে পারে। এর থেকে শুকনো দোহন ও তেল বা নিউট্রাল ফ্যাট জাতীয় দ্রব্য দিয়ে দোহন করলে জীবানুর সংক্রমন কম হতে পারে। যদিও শুকনো দোহনে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে সেজন্য আদর্শ দোহন পরিপ্রেক্ষিতে নিউট্রাল ফ্যাট জাতীয় দ্রব্য দিয়েই দোহনই সর্বোত্তম।

৪) পুরো হাত (full hand) দিয়ে দুধ দোওয়া উচিত, কারন আঙুলের গাঁট দিয়ে দুইলে (knuckling method) বাঁটে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

ঙ) **পরিবেশের সতর্কতা ঃ—**

১) মানুষের বাড়ী, নিষ্কাষণের ব্যবস্থা, গরুর বর্জ্য পদার্থের গর্ত, স্থির জলের গর্ত - এগুলি গরু যেখানে বাস করে সেখান থেকে দূরে থাকা উচিত।

২) খোলা হাওয়া-বাতাস চলাচলকারী গোয়ালঘর।

৩) পাকা মেঝে সপ্তাহে ১ বার অন্ততঃ ২% ফিনাইলের জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং খাবার জায়গা রোজ পরিষ্কার করতে হবে। দিনে ১ বার অন্ততঃ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত (১ লিঃ জলে ১ গ্রাম) জল দিয়ে খাবার ও জলের পাত্র ধুয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

৪) চেষ্টা করা উচিত যাতে বাইরের হাওয়ার স্রোত, ধূলো সরাসরি গোয়ালের মধ্যে বা দোহনের স্থানে প্রবেশ করতে না পারে।

৫) প্রভুত পরিমানে সূর্যের আলো যেতে থাকে।

৬) এঁটেল পোকা (tick) মুক্ত বিছানার বন্দোবস্ত করা।

৭) মশা, মাছি প্রভৃতি মুক্ত পরিবেশ।

৮) দেওয়াল, খুঁটি নর্দমা, আশেপাশের পরিবেশ ভালো করে পরিষ্কার করা ও জীবানু মুক্ত করা।

৯) গোবর, মলমূত্র ধোওয়া জল প্রভৃতি ঠিক ঠিক বন্দোবস্ত করা যাতে করে এগুলি থেকে পুনঃসংক্রমন না ঘটে।

কাঁচা দুধের সংরক্ষণ ও পরিবহন ঃ

দুধ দোহনের পরেই দুধ ঢাকা দিয়ে পরিবহন করতে হবে এবং দুধ সাথে সাথে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বাল্ক কুলারের সাহায্য নেওয়া উচিত। কয়েকটি সোসাইটি একসাথে মিলে বাল্ক কুলারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দুধ সাথে সাথে ঠান্ডা করলে জীবানু বৃদ্ধি কমে। দুধের যে নিজস্ব জীবানু প্রতিরোধকারী ক্ষমতা আছে তা বৃদ্ধি পায়। তবে অবশ্যই সংক্রমিত বরফ দুধের মধ্যে ফেলে ঠান্ডা করবেন না। কারন তা উল্টো ফল দেয়। যেমন যে পাত্রে দুধ ঢালতে হবে তা যেন পরিচ্ছন্ন এবং জীবানু মুক্ত থাকে এবং ঢাকনা বন্ধ থাকে। অনেক সময়ে দুধের মধ্যে খড়, খেজুরের পাতা প্রভৃতি দিয়ে দুধ পরিবহন করা হয়। এই অভ্যাস সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য কারন তাতে সাংঘাতিক পরিমান জীবানুর সংক্রমন ঘটে।

অস্বাভাবিক দুধ ঃ

ক) ম্যাসটাইটিস বা ঠুনকো রোগাক্রান্ত গাভীর দুধ

খ) অ্যান্টিবায়োটিক অবশেষ যুক্ত দুধ ঃ— প্রকৃত অবস্থাতে দুধ অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত থাকে। কিন্তু গরুর বিভিন্ন রোগের সময়ে, যেমন - টি.বি. ব্রুসেলোসিস, ম্যাসটাইটিস - কোনরূপ বাছবিচার না করেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ফলে সেই অ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ দুধের মধ্যে প্রবেশ করে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ৭২-৯৬ ঘন্টার মধ্যে কোন দুধ খাওয়া উচিত নয়।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (W.T.O.) প্রবর্তিত কোডেকস অনুসারে এটি প্রযুক্তিগত বাণিজ্য বাধার (Technical Barriers on Trade -T.B.T.) এর আওতায় পড়ে। দুধে অ্যান্টিবায়োটিক অবশেষ থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

১) অ্যান্টিবায়োটিক অবশেষ থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। চামড়ার রোগের সৃষ্টি হতে পারে, বিশেষকরে পেনিসিলিনে যাদের অ্যালার্জি আছে।

২) অ্যান্টিবায়োটিক অবশেষ যুক্ত দুধ খাওয়ার ফলে আরও নানারকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

৩) এই ধরনের দুধ খাওয়ার ফলে অ্যান্টিবায়োটিকে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে এবং ভবিষ্যতে চিকিৎসার সময়ে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক কাজে না লাগতে পারে।

গ) **কীটনাশক অবশেষ (pestiside residue) যুক্ত দুধ ঃ—** বাছবিচার না করে জমিতে (ঘাস জমিতে বা ফসলের জমিতে) কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে সেই ঘাস, খড়, শষ্যদানা, প্রভৃতি খাওয়ার সময়ে কীটনাশক দ্রব্য গরুর শরীরে প্রবেশ করে এবং দুধে কীটনাশক অবশেষ থাকে। কীটনাশকের মধ্যে অরগানোক্লোরোফসফেট কীটনাশকগুলি (যথা - (DDT, BHC, ক্লোরোডেন, হেপ্টাক্লোর, অলড্রিন, এনডোসালফান প্রভৃতি) ফ্যাটে দ্রবীভূত থাকার ফলে তাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির পরিমান বেশী। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রযুক্তিগত বাণিজ্য বাধা অনুসারে দুধে এই ধরনের কীটনাশক থাকা উচিত নয়।

কি ক্ষতি করে কীটনাশক যুক্ত দুধ ঃ—

১) প্রাণী ও মানুষের শরীরের কোষের ধ্বংস করে।

২) মৌমাছি প্রভৃতি উপকারী পতঙ্গের ধ্বংস করে।

৩) স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে।

৪) অন্ধত্ব।

৫) টিমার তৈরী করে।

৬) লিভারের গন্ডোগোল করে।

কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ঃ—

১) ফসলে কীটনাশক ব্যবহার করার পরেই গরুর খাবার হিসাবে ব্যবহার না করা।

২) Organo Chloro Pestiside ব্যবহার না করে জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত।

৩) ঠিক ঠিক পরিমান কীটনাশক ব্যবহার করা।

৪) উদ্বৃত্ত পরিমান কীটনাশক গোচারণ ভূমিতে ঢেলে না ফেলা।

৫) ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফসল লাগানো (Crop Rotation) পরিছন্ন চায, জলের উপযুক্ত ও কীটপ্রতিরোধকারী বীজ ব্যবহার।

ঘ) **মাইকোটক্সিন (বা ছত্রাক বিষ) অবশেষ যুক্ত দুধ ঃ—**

বিভিন্ন ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত গোখাদ্য, খড় ইত্যাদি Aflatoxin B_1, B_2 & G_1, G_2 থাকে। এর ১% গরু খেলেই দুধে বিষ M_1, M_2 (B_1, B_2 থেকে উদ্ভুত) পাওয়া যায়। দুধে যদি ০.০০০৫ পি.পি.এম. এর বেশী এই বিষ পাওয়া যায় তবে United States Food and Drug Administration (FDA) নিয়ম অনুসারে এই দুধ ''ক্ষতিসাধন কারী জিনিস যুক্ত ভেজাল দুধ'' (Adulterated with harmful substances) বলে গণ্য হয়।

ঙ) **অন্যান্য অস্বাভাবিক সংক্রামণ ঃ—**

১) ধাতু-সীসা, লোহা, তামা প্রভৃতি। দুধে সীসার পরিমাণ ০.০২ ppm এর বেশী হলে P.I. haet অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়।

২) তেজস্ক্রীয় পদার্থ যাথা 40_K ও 47_{Rb} এর দুধে উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়।

৩) বিভিন্ন শিল্পের দ্বারা নিস্ক্রমিত বর্জ্য পদার্থ।

৪) প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিষের সংক্রমন যথা - ট্রিমেটর (জিমসন জাতীয় আগাছায় পাওয়া যায়), গসিপল (তুলাবীজ পাওয়া যায়)

৫) বিভিন্ন রাসায়নিকের সংক্রমন যথা - আয়োডোফোর, ডিটারজেন্ট, নাইট্রেট, নাইট্রাইট ইত্যাদি।

দুধের ভেজাল পরীক্ষা

ডঃ সুনীল পাল
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচ্ছন্ন গোদুগ্ধ পেতে হলে দুধের মান সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা দরকার। দুধ স্বাস্থ্য সম্মতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার অনেক উপায় আছে। স্বাস্থ্যহানীকর যে সমস্ত উপায়ে দুধ সংরক্ষণ করা হয় অথবা দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলা যায় সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সম্যকজ্ঞান থাকার প্রয়োজন। খুব সহজ সরল উপায় সে সব ভেজাল পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১) **সোডা ঃ—** ৫ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। ৫ মিলি ইথাইল অ্যালকোহল (৭৫% *V/V*) যোগ করা হল। ৪ ফোঁটা ১% রোজালিক অ্যাসিড (অ্যালকোহলিক দ্রবন) যোগ করা হল। গোলাপী লাল রং হলে সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট বা বাইকার্বনেট) আছে। বাদামী রঙ হলে সোডা নেই।

২) **হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ঃ—** ৫ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। ৫ ফোঁটা ২% প্যারাফিনাইলিন ডাইঅ্যমিন হাইড্রোক্লোরাইড দ্রবন যোগ করা হল। নীল রঙ হলে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড আছে।

৩) **ফরমালিন ঃ—** ৫ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। এবার ০.৫ মিলি ১% ফেরিক ক্লোরাইড যুক্ত ৫ মিলি ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করা হল যত্নসহকারে পরীক্ষানলের গা বরাবর ধীরে ধীরে যাতে করে এই অ্যাসিড দুধের সাথে না মিশে গিয়ে প্রকট বলয় *(ring)* তৈরী করে। যদি এই বলয়ের রং বেগুনী হয় তবে ফরমালিন আছে।

৪) **স্টার্চ ঃ—** ৩ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। ফোটানো হল। ঠাণ্ডা করা হল। এক ফোঁটা ১% আয়োডিন দ্রবন যোগ করা হল। নীল রঙ হলে স্টার্চ আছে।

৫) **চিনি ঃ—** ৫ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। ১ মিলি ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা হল। ০.১ গ্রাম রিসোরসিনল দানা যোগ করা হল। ফুটন্ত জলের মধ্যে ৫ মিনিট রাখা হল। ঠাণ্ডা করা হল। লাল রঙ হলে চিনি আছে।

৬) **গ্লুকোজ ঃ—** ১০ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। ডায়াসটিক্স স্ট্রিপ ডোবানো হল। ডায়াসটিক্স স্ট্রিপের রঙ নীল হলে গ্লুকোজ আছে।

৭) **লবন ঃ—** পরীক্ষা নলে ০.১ মিলি ৫% পটাসিয়াম ক্রোমেট ও ২ মিলি ০.১ *(N)* সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ নেওয়া হল। ২ মিলি দুধ যোগ করা হল যদি রঙ হলুদ হয় তবে লবন আছে। চকোলেট রঙ থাকলে লবন নেই।

৮) **পুকুরের জল ঃ—** পরীক্ষা নলটি প্রথমে স্যাম্পেল দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলা হল। এবার নলের গা দিয়ে ১-২ মিলি ২% ডাই ফিনাইল অ্যামিন যোগ করা হল। যদি নীল রঙ হয় তবে পুকুরের জল আছে।

৯) **স্কিম মিল্ক পাউডার ঃ—** স্যাম্পেল দুধে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করা হল। যদি কমলা রঙ দেখা যায় তবে স্কিম মিল্ক পাউডার যোগ করা হয়েছে।

১০) **ইউরিয়া ঃ—** ১০ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। ১৫০ মিগ্রা সদ্য তৈরী সয়া পাউডার যোগ করা হল ও একটা কাঁচের দন্ড দিয়ে ভালো করে মেশানো হল। ৫ মিনিট রাখা হল। যদি *pH* ৮.০ বা ৮.০ বেশী হয় তবে ইউরিয়া আছে।

১১) **ডিটারজেন্ট ঃ—** ৫ মিলি দুধ পরীক্ষা নলে নেওয়া হল। ০.১ মিলি ব্রোমোক্রিসল পারপল্ (০.৫%) যোগ করা হল। বেগুনী রঙ হলে ডিটারজেন্ট আছে।

১২) **ছানার জল ঃ—** ১০ মিলি দুধ একটি কনিক্যাল ফ্ল্যাক্সে নেওয়া হল। ১ মিলি ফেনপথ্যালিন *indicator* যোগ করা হল। ০-৪ মিলি সম্পৃক্ত পটাসিয়াম অক্সালেটের দ্রবন যোগ করা হল। ২-৪ মিনিট রেখে দেওয়া হল। এই সময় দুধে *S.N.F. %* বার করা হল। এবার দুধটিকে *(N/10)* সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়ে প্রশমিত করা হল। হাল্কা গোলাপী রঙ হল। ২ মিলি নিউট্রাল ফরমালিন যোগ করা হল। গোলাপী রঙ চলে গিয়ে আবার সাদা রঙ হল। আবার দুধটি *(N/10)* সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়ে প্রশমন করা হল। দ্বিতীয় প্রশমনের সময় রিডিং দেখা হল। মনে করি এই রিডিং = x মিলি। এক্ষেত্রে দুধের প্রোটিন $\% = P = (X \times 1.7)\%$
দুধের ল্যাকটোজ $\% = L = S.N.F.\% - P - 0.75$ এই L এর মান ৫ বা ৫ এর বেশী হলে ছানার জল আছে আর $L:P = 1:15$ এর বেশী হলে ছানার জল আছেই।

দুধের উপাদানের পরিমানের বিভিন্নতার কারণ সমূহ ঃ

(১) জাতি, (২) প্রজাতি, (৩) নিজ বৈশিষ্ট্য, (৪) ল্যাকটেশনের ভাগ *(Period of Lactation)*, (৫) ঋতুগত বৈশিষ্ট্য, (৬) পশুর বয়স ও বাছুরের সংখ্যা, (৭) দোহনের অন্তর্বতী সময়, (৮) দোহনের পরিপূর্ণতা, (৯) দোহনের স্তর *(Period of lactation)*, (১০) রোগাক্রান্ত

পশু, (১১) পালানের নিজস্বতা, (১২) গোখাদ্য, (১৩) অনিয়মিত দোহন, (১৪) ঔষধ ও হর্মোন প্রয়োগ, (১৫) উত্তেজনা, (১৬) বাচ্চা দেওয়ার সময়ে গরুর স্বাস্থ্য, (১৭) প্রজননকালে উপস্থিতি।

দুধের উপাদানের গড় মান ঃ

	ফ্যাট %	প্রোটীন %	ল্যাকটোজ %	খনিজ লবন %
গরুর দুধ	৪.৯	৩.৪	৪.৬	০.৭৪
মহিষের দুধ	৭.৩	৩.৮	৪.৯	০.৭৮

গোদুগ্ধ মহিষদুগ্ধ ছাড়াও আমাদের দেশের মানুষ ছাগল, ভেড়া-উটের দুধ খেয়ে থাকেন। খুব ঠাণ্ডা জায়গার ইয়াকের *(Yek)* দুধের ও প্রচুর উৎপাদন এখন হচ্ছে। মিথুন এবং নীলগাইয়ের দুধও অনেক জায়গার মানুষ খেয়ে থাকেন। দুধের উপাদান বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রায় একই রকম, সামান্য হেরফের মাত্র। যে কোন স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীর দুধই স্বাস্থ্যসম্মত এবং পান করলে একইরকম উপকার পাওয়া যাবে সে যদি কুকুর বা বাঘের দুধও হয় কিছু আসে যায় না। যে কোন প্রাণীর দুধের সঙ্গে অন্যপ্রাণীর দুধ মিশিয়েও ভেজাল দেওয়া হয়। তবে সেগুলি স্বাস্থ্যহানীকর নয় তাই সে বিষয় আলোচনা না করে বক্তব্য সংক্ষেপ করা হল।

মানবদেহে গৃহপালিত জীবজন্তুবাহিত রোগের সংক্রামণ ও তার প্রতিকার (জুনোসেস)

ডঃ মলয় কুমার চ্যাটার্জ্জী
পশু চিকিৎসক

আমাদের দেশে আমরা সাধারণতঃ বিভিন্ন রকমের গৃহপালিত জীবজন্তু পালন করে থাকি। এর মধ্যে কেউ বা পোষে নিছক ভালবাসার খাতিরে আবার কেউবা পোষে রোজগারের পাথেয় হিসাবে। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা ভাল যে জীবজন্তু থেকে নানান রকমের রোগ বা অসুখ আমাদের হতে পারে এবং আমাদের অজান্তেই এই সব রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখন এইসব রোগগুলি কি? তার প্রতিকারই বা কি, সে সবই এই প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয়।

যে সব জীবানু জীবজন্তু থেকে আমাদের রোগ বিস্তার করে সেগুলি হল — প্রোটোজোয়াল, ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল, ছত্রাক,মাইট্স্ এবং ফ্লি — জনিত রোগ।

প্রোটোজোয়াল রোগ	কিভাবে রোগ ছড়াতে পারে
১. আমাশয় (অ্যামিবিয়েসিস্)	দূষিত জল, খাবার, মাছি, মশা ইত্যাদি থেকে।
২. আমাশয় (জিয়ারডিয়েসিস্)	দূষিত জল, খাবার, মাছি, মশা ইত্যাদি থেকে।
৩. বালানডিসেসিস্	দূষিত জল, খাবার ও মল থেকে।

কৃমি জাতীয় রোগ

১. হুক কৃমি (অ্যাঙ্কাইলোস্টোমিয়েসিস্)	লার্ভা থেকে চামড়া ভেদ করে লার্ভা শরীরে প্রবেশ করলে।
২. গিনিকৃমি	পানীয় জল বা পুকুরের জলে থাকে
৩. ফিতাকৃমি	ফিতাকৃমির অংশ খাবারের সঙ্গে বা জলের সঙ্গে খেয়ে ফেললে।
৪. গোলকৃমি (অ্যামকারিস)	খাবারের সঙ্গে, জলের সঙ্গে বা চামড়া ভেদ করেও কৃমি শরীরে প্রবেশ করে।

ভাইরাস জনিত রোগ

১. জলাতঙ্ক (রেবিস)	কুকুর বা বিড়ালের কামড়ে দূষিত লালা শরীরের কাটা চামড়ায় লাগলে।
২. মেনিনজাইটিস	খাবারের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে।

ব্যকটিরিয়াজনিত	কিভাবে রোগ ছড়াতে পারে
১. অনিয়মিত জ্বর	বীজানুর সংস্পর্শে বা বাতাস বাহিত বীজানুর থেকে।
২. হলুদ রোগ বা পীত রোগ	ইঁদুরের কামড় থেকে, দূষিত জল থেকে।
৩. টিবি (টিউবারকুলেসিস্)	টিবির বীজানু বাতাস এর সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে বা বীজানু খেয়ে ফেললে।
৪. গলার রোগ (সোর থ্রোট)	বীজানুর সংস্পর্শে এলে বা বীজাণু খেয়ে ফেললে।

ছত্রাক জনিত রোগ

১. রিং ওয়াম	সংস্পর্শ থেকে।
২. স্পোরোটাইকোসিস	শরীরের কাটা ঘা থেকে।
৩. নোকারডিওসিস	সংস্পর্শ থেকে।
৪. ব্লাসটোমাইকোসিস	আঘাত, ঘা থেকে, কাটা, ছেঁড়া বা বীজাণু খেয়ে ফেললে।

মাইট বাহিত রোগ (পোকামাকড়)

১. চামড়ার রোগ (ফলিকুলার মেনজ্)	সংস্পর্শ থেকে।
২. স্কেবিস (চুলকানি রোগ)	সংস্পর্শ থেকে।

ফ্লি বা উকুন বাহিত রোগ

১. উকুন বাহিত এলার্জী	উকুনের কামড় থেকে।

প্রতিকার ঃ

উপরের বর্ণিত রোগগুলি থেকে রক্ষা পেতে গেলে কিছু উপায় অবলম্বন করতে হবে।

১) জীবজন্তুর গায়ে হাত দেবার পর আমাদের হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে বা কোনও অ্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

২) জীবজন্তুদের ভালোবাসা ভাল তবে তা যেন অতিমাত্রায় না হয়। কখনও মুখ দিয়ে আদর করা উচিত নয় কারণ তাদের দেহ থেকে কৃমি বা অন্যান্য রোগ আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

৩) কখনও কোনও কুকুর বা অন্য কোন গৃহপালিত জন্তুকে অমাদের মুখ চাটতে দেওয়া উচিত নয়।

৪) জীবজন্তুদের খাবার বাসনপত্র ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়া বা পরিষ্কার করা উচিত।

৫) প্রত্যেক জীবজন্তুকে আলাদা পাত্রে খাবার দেওয়া উচিত।

৬) আমাদের বাচ্চাদের বা শিশুদের জীবজন্তুর বাসনপত্র নিয়ে খেলা করতে দেওয়া উচিত নয়।

৭) কখনও জীবজন্তুদের বিছানায় নিয়ে শোওয়া উচিত নয়।

৮) অসুস্থ জীবজন্তুদের থেকে বাচ্চাদের দূরে থাকা উচিত।

৯) প্রত্যেক জীবজন্তুর থাকার বাসস্থান পরিষ্কার করা উচিত।

১০) কাঁচা মাংস বা মাছ কুকুর বা অন্য কোন গৃহপালিত মাংসাশী জীবজন্তুকে খেতে দেওয়া উচিৎ নয়।

১১) অন্তঃস্বত্বা মহিলাদের বাগানে বা খোলামাঠে খালিপায়ে হাঁটতে দেওয়া উচিত নয়। জায়গা থেকে নানান রোগ এবং বীজানু ও কৃমি আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে এবং মা ও শিশুকে ঐ সব রোগ আক্রান্ত করতে পারে।

১২) বাগান বা পার্ক থেকে ঘুরে আসার পর হাত ও পা ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

১৩) রাস্তার চটি বা জুতা বাড়ির বাইরে ছেড়ে রাখা উচিত, তা না হলে কিন্তু ছোঁয়াচে রোগ আমাদের আক্রান্ত করতে পারে।

১৪) অসুস্থ কুকুর বা জীবজন্তুদের সেবা ও শুশ্রুযা করার সময় আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

১৫) ঠিক সময়ে ডাক্তারের বা পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গৃহপালিত জীবজন্তুদের টীকা দেওয়া উচিত।

১৬) বাচ্চা কুকুর বা গৃহপালিত জীবজন্তুদের সময় মতন কৃমির ওষুধ দেওয়া উচিত কারণ জীবজন্তুদের কৃমির প্রকোপ খুব বেশী হয় এবং তারজন্য তাদের শরীরের রোগ ও প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

এখন কিছু গৃহপালিত যেমন কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদির কৃমির ওষুধ দেবার/খাওয়ার সময় ও টীকা (প্রতিষেধক) দেওয়ার নিয়মাবলী দেওয়া হল ঃ—

কুকুর ও বিড়ালের ক্ষেত্রে ঃ **ঔষধের নাম**

২ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস — ৭দিন অন্তর — নিমোসিড সাসপেনসন (*Suspension*) বা লিকুইড

৩ মাস থেকে ৬ মাস — ১৫দিন অন্তর — ঐ

৬ মাসের পর — ২১ দিন থেকে ৩০ দিন অন্তর — প্রাজিপ্লাস (*Praziplus)* ট্যাবলেট বা জোডেকস (*Zodex*)

১ বৎসর বা তার উর্দ্ধে — প্রতি ৩ মাস অন্তর একবার — ঐ

গরু বা ছাগলের ক্ষেত্রে ঃ

২ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস — ১৫ দিন অন্তর — অ্যালবোমার লিকুইড

৩ মাস থেকে ৬ মাস — মাসে একবার / ৩০ দিন অন্তর — ঐ

৬ মাস থেকে ১ বৎসর — ২ মাস অন্তর — অ্যালবোমার লিকুইড

১ বছর বা উর্দ্ধে — ৩ মাস অন্তর — ঐ অ্যালবোমার ট্যাবলেট

হাঁস ও মুরগীর ক্ষেত্রে ঃ

বাচ্চা মুরগী বা হাঁসের ক্ষেত্রে — পাইপারাজিন সিরাপ বা অ্যালবোমার লিকুইড জলে গুলে

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে — অ্যালবোমার লিকুইড জলে গুলে

টীকা প্রদানের নিয়ম

কুকুরের ক্ষেত্রে ঃ

দেড় মাস বয়স থেকে টিকা দেওয়া শুরু হয়।

প্রথম ১.৫ মাস বয়সে — পাপিডিপি

২ - ২.৫ মাস থেকে তিনমাস হলে — ডিসটেম্পার ও পারভোভাইরাস টিকা, করোনা টিকা

চারমাস এর পর — জলাতঙ্ক বা রেবিস টীকা।

তারপর বছরে একবার এই তিনরকম টীকা চালু রাখতে হবে।

গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে ঃ

প্রতি ছয় মাস অন্তর — ফুট ও মাউথ টিকা।

বৎসরে একবার — রিণ্ডার পেস্ট টিকা *(Rinder pest)*

হাঁস ও মুরগীর ক্ষেত্রে ঃ

রাণীক্ষেত টিকা, ফাউল পক্স টিকা, ফাউল কলেরা টিকা ইত্যাদি।

মারেক্স টিকা — একদিনের বাচ্ছার হলে। *(Marex)*

এই প্রতিবেদনে সংক্ষেপে এই টীকাগুলির নাম উল্লেখ করা হল। এছাড়া আরও অনেক রোগের টীকা দেবার ব্যবস্থা আছে। আশাকরি ভবিষ্যতে যখন রোটারী ইন্টারন্যাশানাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯০ থেকে বিভিন্ন ক্যাম্প তৈরী করা হবে তখন এইসব বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং আমাদের রোটারী কমিউনিটি কোর এর সদস্যারা তাতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

Diseases carried by Domesticated Animal to
Human life and their remedies

Dr. Malay Chatterjee
Veterenary Practitioner

